তিন তালাক
ও
নিকাহ হালালা

তিন তালাক
ও
নিকাহ হালালা

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

মুন্নীপ্রকাশন
www.anyodhara24.com

প্রকাশকাল ■ একুশে বইমেলা ২০১৮

প্রকাশক ■ ফারজানা আক্তার মুন্নী (এমবিএস)
প্রধান নির্বাহী ■ মোবারক হোসেন
মুন্নীপ্রকাশন
অফিস ■ ২৮/এফ, টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ■ ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১১-৮৩৪৯৪৪, ০১৯১৩-২৮৮৩৪৮
একমাত্র পরিবেশক ■ অন্যধারা
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ■ ফারহান শাহরিয়ার
কম্পোজ ■ মুন্নী কম্পিউটার্স ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ ■ আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স, ৩৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য ■ দুই'শ বিশ টাকা মাত্র

Published by: Farzana Akter Munni (MBS)
Chief Executive: Mobarak Hossain
MUNNiProkashon
Office: 28/F, Toynbee Circular Road, Motijheel C/A Dhaka-1000
Show Room: 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100
Ph: 01711 83 49 44, 01913-288 348
E-mail: munnipk90@gmail.com
Price: 220 Taka, Us $: 10 Dollar
ISNB: 978-984-8208-00-7

U.K Distributor ■ Sangeeta Limited
22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor ■ Muktadhara
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y.11372
Canada Distributor ■ Anyamela
300 Danforth Ave., Toronto (1st Floor) suite-202
Kolkata Distributor ■ Naya Udyog
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India
Online Distributor ■ www.rokomari.com

উৎসর্গ

মায়ের দীর্ঘায়ু ও আমাদের প্রথম সন্তান
‘হাসনান ওয়াফী আয়াত’- এর
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়।

মূখবন্ধঃ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

فعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُه

‘শয়তান গুরু ইবলিস নিত্য ব্যস্ত কি করে পৃথিবীটা অশান্তি অপ্রীতিতে ছেয়ে দেয়া যায়। পৃথিবীর কোন মানুষকেই সে ভাল কাজে দেখতে চায় না। কিছু অসৎ অভিসন্ধি চরিতার্থের কাজে সে এতবেশি যত্নশীল ও কল্পক হয়ে উঠে, কাজের অর্গলতা এড়াতে সে প্রথমে নিভৃত নিস্তব্দ কোন সমুদ্রের মাঝে গিয়ে তার আস্তানা পত্তন করে, তারপর একাগ্র হয়। সে চায় মানুষ নানা অধর্ম, অন্যায়, অনাচার, অনৌচিত্যে ডুবে থাকুক। মানুষকে কতভাবে কতবেশি বিরোধ-বিবাদ, হানাহানি-মারামারিতে প্রলিপ্ত করা যায় তার খাটুনির যেন অন্ত নেই। আর এসব কাজে সাহচর্য দেওয়ার জন্যও তার দপ্তরে নিযুক্ত রয়েছে বহু শয়তান অনুচর। একেক জনের একেক দায়িত্ব। পৃথিবীতে যে যতবেশি ফিতনা-গোলযোগ লাগিয়ে দিতে পারবে সে ততবেশি গুরুর নৈকট্য পাবে। গুরুর একটু সন্তুষ্টি লাভের জন্য কতকিছুই না করে দেখায় তারা। কাজের শেষে একজন এসে বলে, ‘আমি আজ এই করেছি গুরু’। গুরু বলে, ‘তুই ছাই করেছিস’। আরেকজন এসে বলে, ‘আমি এই করেছি’। না, ‘তুই কিছুই করিসনি’। গুরু নারাজ। কিন্তু যখন কোন শিষ্য এসে বলে, ‘আমি আজ তেমন কিছু করিনি, তবে একলোক আমার কুমন্ত্রণায় পা দিয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে’। এবার শয়তান গুরু ইবলিসের প্রমোদলীলা দেখে কে? শিষ্যকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘সাবাস! কাজের কাজটি তুই-ই করেছিস’। আয় বুকে আয়।’ সহিহ মুসলিমে (হাঃ ৭২৮৪) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের মর্মবাণী এই।

শয়তান চায় মানুষ উচ্চহারে তালাক দিক, আর মহান আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানুষ একেবারে নিরুপায় না হলে তালাকের চিন্তা থেকেও দূরে থাকুক। শয়তান তার কাজ অবিশ্রান্তে চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষও আল্লাহ বিমুখ হয়ে প্রতিনিয়ত শয়তানের ফাঁদে পা রাখছে আর ভুল করছে। এই ভুলের দরুনই কখনও কখনও মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয়ে কুরআন সুন্নাহর তোয়াক্কা না করেই নিজ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে বসে। পরে রাগ প্রশমিত হলে নিষ্পাপ সন্তান সন্ততির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুনরায় পরস্পরকে ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় সমাজের একদল স্বার্থান্বেষী, গোঁড়া ও অপরিণামদর্শী অসূর তাদের সংসার যাত্রায়

প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় আর 'শরীয়ত গেল, শরীয়ত গেল' বলে চিল্লা ফাল্লা আরম্ভ করে দেয়। বস্তুত এরাই হলো ইবলিসের খাস অনুচর যারা পৃথিবীতে ইবলিসের পক্ষ নিয়ে ইবলিসকেই জয়ী হতে সাহায্য করে। তিক্ত হলেও সত্য যে, সভ্যতার এ যুগে এসেও আমাদের মুসলিম সমাজ আজও বহু কুসংস্কারে নিমজ্জিত। এই সমাজে আত্মহত্যা অমার্জনীয় পাপ জেনেও কেউ বিষপান করে বাঁচতে চাইলে তাকে বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসতে পারি, মহানুভব সাজতে পারি, কিন্তু ভুল করেও যদি কেউ একটিবার তিন তালাক বলে ফেলে তো সব শেষ, তাকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই। তখন কতিপয় কুশিক্ষিত মোড়ল-মৌলভীদের চোখে এই তিন তালাক আত্মহত্যার চেয়েও অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। তারপর স্ত্রীর পরিশুদ্ধা হওয়ার নামে অন্যের বিছানায় গা বিলানো থেকে শুরু করে কত নোংরামীই না দেখতে হয় ধর্মের নামে। সমাজের এই সমস্ত অন্ধ, গোঁড়া, অশুভ, অসুস্থ অপচ্ছায়াগুলোকে কুরআন সুন্নাহর বাস্তব বাণী আরেকবার মনে করিয়ে দিতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মুসলিম সমাজে বিশেষ করে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও কুশিক্ষার কারনে তালাকের বিষয়ে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি হয়ে আসছে। সম্প্রতি এ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও ঝড় ওঠেছিল। আদালত পর্যন্ত গড়ায় তালাকের এই বাড়াবাড়ি। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর গত ২২শে আগষ্ট '১৭ সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট অবশেষে এই 'তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা' বেআইনী বলে রায় দেন। এই রায়কে ঘিরেও নানা মহলে নানা রকম আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। অনেক মুসলমানকেই কুরআন সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়েছে, হচ্ছে। সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুদের কয়েকটি চক্র মুসলিম নারীদের নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার নাম করে বহু লোভনীয় প্রস্তাবও দিয়ে আসছে। এই তো কিছুদিন আগেও ভারতের 'হিন্দু মহাসভা' সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ পূজা শকুন পাণ্ডে তার এক বক্তব্যে মুসলিম মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আপনারা তিন তালাক ও নিকাহ হালালা হতে মুক্তি পেতে হিন্দু হয়ে যান। আপনাদের আইন যদি ন্যায় বিচার না দিতে পারে তাহলে আমরা দেব।' কোন কোন মুসলিম দম্পতিও তাদের সংসার বাঁচাতে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার হুমকি দিচ্ছে। মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে হিন্দুদের নাক গলানো যতটা না দুঃখের, তারচেয়েও দুঃখজনক হলো খোদ আমরা মুসলমানরাই এসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত বিধি-বিধানকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছি আর বিভিন্ন পীর-ফকিরের গাল-গপ্পকে জীবন বিধান হিসেবে ধারণ করে বসে আছি।

এই গ্রন্থণায় পবিত্র কুরআন সুন্নাহ অনুমোদিত তালাকের প্রকৃত বিধান কি, তালাক দূর্ঘটনা নাকি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, স্বামীর হাতে তালাকের যথেচ্ছা ব্যবহারের অধিকার থাকা কতটুকু মানব মনস্তাত্ত্বিক, শান্তিপূর্ণ ও সমাজ বান্ধব, একসাথে তিন তালাক দিয়ে

বসলে তিন তালাকই কার্যকর হবে নাকি এক তালাক, স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের বিধান কি, হিল্লা বিয়ের বিষয়ে ইসলাম কি বলে, হিল্লার পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হয় এবং প্রতিকারের উপায় কি, সবশেষে ইসলাম স্ত্রী প্রহারের অনুমোদন দেয় কিনা এ সমস্ত বিধি-বিধান সাতটি অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আমার একান্ত বিশ্বাস, যে সমস্ত দলিল প্রমাণাদি এতে উপস্থাপন করেছি, তা সঠিকভাবে আয়ত্ব ও প্রয়োগ করতে পারলে নারীজাতের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে যে সমস্ত অধর্ম সমাজে চালু আছে তা অবশ্যই বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং নারীর সঠিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থণা আশু ভূমিকা রাখবে।

পাঠকের প্রতি বিণীত অনুরোধ, গ্রন্থণায় উপস্থাপিত তথ্য উপাত্তগুলো দলনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বিবেচনা করুন। বিভ্রম হলেই যাচাই করুন। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি, কোন গতানুগতিক বক্তব্য বা মনগড়া কোন মন্তব্যের অভিনিবেশ যাতে না ঘটে যায়। পাতায় পাতায় দলিল প্রমাণাদির উদ্ধৃতি যুক্ত করেছি। সেইসাথে মাযহাব চারিটির মুলনীতি যোগ করেছি এবং ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর মুলনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছি। প্রতিপক্ষের আপত্তিসমূহেরও সমুচিৎ জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি। এতদসত্ত্বেও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজেই, যে কোন প্রকার ভুল ত্রুটি কোন সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ভাববেন তা সম্পূর্ণ অজান্তে হয়েছে। এইজন্য অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং যথাশীঘ্র ভুলগুলো সম্বন্ধে অবহিত করে বাধিত করবেন। আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ বইটিকে আরও সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

যেদিন শুনবো, বইটি পড়ে একজন যুবক অন্তত কোথাও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, কোন নারীকে ধর্মদস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তবেই বইটি সার্থক হবে। বইটি প্রকাশে আগ্রহ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্যার মোবারক হোসেন ও মুন্নী প্রকাশন এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

সূচীপত্র

তালাক কি?

অভিধানে 'তালাক' শব্দের অর্থ বন্ধনমুক্ত হওয়া, মুক্ত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া, ত্যাগ করা ইত্যাদি। পরিভাষায় বিবাহের বাঁধন তুলিয়া ও খুলিয়া দেওয়া, বিবাহের শক্ত বাঁধন খুলিয়া দেওয়া, বৈধ উপায়ে স্বামী স্ত্রীর সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা (Legitimate way to be free from the bonds of husband and wife) ইত্যাদি। এক কথায় আইনসিদ্ধ উপায়ে স্বামী স্ত্রীর বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াকে তালাক বলে।[১]

তালাক কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন ইমাম কুরতুবী রহঃ স্বীয় তাফসীরে মুহাম্মদ ইবনে মুগীছের বরাত দিয়ে লিখেন, তালাক প্রধানত দু'প্রকার। 'তালাক-ই-সুন্নাহ' ও 'তালাক-ই-বিদআহ'। তালাক-ই-সুন্নাহ হলো যা কুরআন সুন্নাহ সম্মত ও পদ্ধতিগত হওয়ার শর্তে কার্যকর হয়, আর তালাক-ই-বিদআহ হলো এর বিপরীত যা নারীর ঋতুকালে বা প্রসব পরবর্তী ঋতু অবস্থায় অথবা দৈহিক সংসর্গের পর কিংবা যুগপৎভাবে প্রদান করা হয়।[২] তালাক-ই-সুন্নাহ আবার দু'প্রকার। 'তালাক আল হাসান' ও 'তালাক আল আহসান'। তালাক আল হাসান হলো, পরপর তিন তুহরে তিন তালাক প্রদানের মাধ্যমে আপনা দাম্পত্যজীবন খতম করা, আর তালাক আল আহসান হলো, এক তালাক বা দুই তালাক রজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া। অর্থাৎ শেষ তালাকটি হাতে রেখে স্ত্রীকে বিদায় করা। এতে সুবিধা হলো, যদি কখনও স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিতে আবার দাম্পত্যজীবনে ফিরে আসতে চায়, তাহলে কোন প্রকার জট-ঝামেলা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারে। এটিই তালাক প্রদানের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

বস্তুতঃ তালাক ব্যবস্থা বৈধ হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্য নিন্দনীয় কাজ। যেমন বলা হয়েছে,

[১] ফিক্বহুস সুন্নাহ- ৬২৬ পৃঃ।

[২] আল জামে' লিআহকামিল কুরআন- ৩/১৩২, ফতহুল কদীর- ৭/৪৫০।

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

'আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ হল তালাক।'[৩]

এজন্য একান্ত অপরিহার্য না হলে ইসলামে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন আস সুয়ুতী রহঃ স্বীয় জামে' গ্রন্থে তাবরানীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات

'তোমরা বিয়ে করো কিন্তু (একান্ত অপরিহার্য না হলে) তালাক দিয়ো না, কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বাদ অন্বেষণকারী ও স্বাদ অন্বেষণকারিনীদের পছন্দ করেন না।'[৪]

প্রাক ইসলামী যুগে তালাকের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যাসীমা ছিল না। স্বামীরা তাদের যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীদের তালাক দিত আর ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আবার তাদের ফিরিয়ে নিত। স্ত্রীদের টু' শব্দ করারও অধিকার ছিল না। স্বামী কর্তৃক তালাকের এই সমস্ত অপব্যবহারের কারনে স্ত্রীদের পোহাতে হতো নানা ভোগান্তি। নারীদের না ছিল সম্মান, না ছিল মুক্তি। এভাবেই নারী নির্যাতনের মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল এই তালাক ব্যবস্থা। নারীরা তাদের প্রতি এই সমস্ত অসম্মান ও অবিচারের অভিযোগ নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে উপস্থিত হলে ওহী দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, তালাক দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় এরূপ তালাক হলো দু'বার।[৫] কেবল এই দুই বারেই সুযোগ রয়েছে বুঝে শুনে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করার, ভাববার আর সমঝোতায় যাওয়ার। এর জন্য স্বামী তার স্ত্রীর তিন ঋতু বা তিন মাসিক কাল পর্যন্ত সময় পাবে। যদি গভীর চিন্তা ভাবনার পর স্বামী স্থির মাথায় প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তৃতীয় তুহরে এসে তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে দেয় তাহলে ফিরিয়ে নেওয়ার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না। তবে অন্যত্র স্ত্রীর স্বাভাবিকভাবে[৬] বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর কোন কারনে সে তালাকপ্রাপ্তা হলে বা স্বামী মারা গেলে তখন পূর্বস্বামী চাইলে নতুন করে বিয়ে করে নিতে পারবে।

ইসলামে বৈবাহিক বন্ধন একটি অত্যন্ত পবিত্র বন্ধন। যা শক্তিশালী কোন কারন ছাড়া ছিন্ন হবার নয়। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসেও ইসলাম স্বামী স্ত্রী উভয়ের মাঝে সুষ্ঠু

[৩] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০১৮, আবু দাউদ- হাঃ ২১৮০, জামেউল আহাদিছ- হাঃ ১৭০।

[৪] জামেউল আহাদিছ- পৃঃ ১১/২৫৯।

[৫] মাফাতিহুল গায়েব (আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহঃ)- পৃঃ ৬/৮২।

[৬] স্বাভাবিক বিয়ে বলতে এখানে শরয়ী বিয়ে উদ্দেশ্য। শরয়ী বিয়ে হলো, পারস্পরিক আগ্রহ ও পছন্দের ভিত্তিতে, স্থায়ীভাবে সহাবস্থানের মানসে ও বংশধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের যাবতীয় পাপাচার থেকে পুতঃপবিত্র রাখাই হবে যে বিয়ের মুল লক্ষ্য, তাই শরয়ী বিয়ে। সুতরাং ঠিকা, হিল্লা বা ভাড়া আক্বদ প্রভৃতির মাধ্যমে যে অস্থায়ী বিয়ে মঞ্চায়িত হয় তা মুলত নাটক হয়, কোনভাবেই এটিকে শরয়ী বিয়ে বলা যাবে না।

ফায়সালায় বিশ্বাসী। সুষ্ঠু ফায়সালার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে শুধুমাত্র তখনই ইসলাম সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে তালাকের বৈধতা দেয়। অন্যথা নয়। দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বনিবনার অমিল বা বুঝাপড়ার দ্বন্দ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ যদি সে অমিল বা দ্বন্দ এমন তীব্রতর আকার ধারন করে বসে যে, দাম্পত্য জীবন আর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়, একসঙ্গে এক ছাদের নীচে বসবাস চালিয়ে গেলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আরও সংকট নেমে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে ইসলাম কখনও চায় না কোন মানব-মানবীর জীবন বিষাদের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাক। এরূপ পরিস্থিতিতে নিরুপায় দম্পতি চাইলে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে মুক্তি পেতে পারে। ইসলামে সেই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াই তালাক নামে পরিচিত। পরিতাপের বিষয় হল, আজকের সমাজে তালাককে উল্লেখিত অর্থে পাওয়াটাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। বর্তমান সমাজে তালাককে একটি নিছক দূর্ঘটনা হিসেবেই দেখা হয়। তালাক বলেছে তো সর্বনাশ। মুলত তালাক কোন দূর্ঘটনা নয়, তালাক একটি কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার নাম। আচমকা তালাকের কথা শরীয়তের কোথাও বলা নেই। শরীয়ত প্রক্রিয়ামুলক তালাকের শিক্ষা দিয়েছে। মোটকথা, পরিস্থিতি যাই হোক এই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনেই ধাপে ধাপে তালাক দিতে হবে।

ইচ্ছে হলেই তালাক দেয়া যায় না ঃ

আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে, স্বামী যখন ইচ্ছা যেকোন অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। যে কারনেই হোক দিতে পারে। কোনরূপ কারন ছাড়াও পারে। স্ত্রীর দোষ থাকুক বা না থাকুক। স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছা কোন কিছুই এতে বিবেচ্য নয়। তালাকের একচ্ছত্র অধিকার কেবল স্বামীর হাতেই ন্যস্ত। মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ তেও স্বামীকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার দেয়া হয়েছে বিবেচনাযোগ্য কোন কারন দর্শানোর শর্ত ছাড়াই। সমাজপতিদের দাবি, এ রীতি নাকি শরিয়া-প্রদত্ত। আসলে এটি আদৌ শরিয়ত সমর্থিত বা দলিল নির্ভর রীতি নয়। বরং বলা যায়, এটি একটি মুসলমানদের জন্য চরম আত্মঘাতি এবং পশ্চাৎমুখী সিদ্ধান্ত। আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম এমন কোন অমানবিক আইন দিতে পারে না, যে আইনে নারীকে ছোট করা হয়। ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে। বানিয়েছে মা আর তার পায়ের নীচে রেখেছে জান্নাত। এই সিদ্ধান্তের কারনে ইসলাম যে নারী অধিকারের কথা বলে তা প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এটি ইসলামী আইনে যোগ হলো কিভাবে? আসলে বিনা কারনে তালাক দিলে তা কার্যকরী তালাক গণ্য করার যে রেওয়াজ আমাদের মুসলিম সমাজে চালু আছে তা ইহুদীদেরই একটি অসভ্য সংস্কৃতি যা ইসলামে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ

করেছে। ইহুদী মতবাদে কোনরূপ কারন ছাড়াই স্বামীকে তালাকের বৈধতা দিয়েছে।[৭] কাজেই বলা যায়, বিবেচনাযোগ্য কোন কারন ব্যাতিরেকে স্বামী কর্তৃক ইচ্ছেমতো তালাকের যে অপব্যবহার সমাজে দেখা যায় তা কুরআন বিরুদ্ধ এবং নিঃসন্দেহে ইহুদী মতাবলম্বনের নামান্তর। বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করা সঙ্গত মনে করছি।

তালাকের বিষয়ে ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম এ তিনটি ধর্মে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। খৃষ্টান ধর্মে তালাককে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাইবেলের নতুন নিয়ম (New testament) এ যীশুর বাণী বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'তিনি বলেছেন, আমি বলছি, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিবে সে যেন তার স্ত্রীর জন্য ব্যভিচারের দরজা উন্মুক্ত করে দিল। আর যে তালাকপ্রাপ্তাকে বিয়ে করল সেও যেন ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ল।'[৮] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আর স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য লোককে বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।'[৯] অন্যত্র, 'যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অপর একজনকে বিয়ে করে সে ব্যভিচার করে। স্বামী ছেড়ে দিয়েছে সেই রকম স্ত্রীকে যে বিয়ে করে সেও ব্যভিচার করে।'[১০] বাইবেলে আরও বলা হয়েছে, 'স্বামী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই স্ত্রী তার কাছে বাঁধা থাকে।'[১১] এ আইন খৃষ্টান ধর্মমতে ধার্মিকতার দাবি হলেও বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব নয়। বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতার কারনে যদি স্বামী স্ত্রীর জীবনযাপন অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হয়, তাহলে নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান তাদের কোন উপকারে আসে না। মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই তো বিধান। নিরুপায় দম্পতিকে জোর করে একত্রে রাখার কোন মানে হয় না। অবশ্য বর্তমান খৃষ্টান সমাজ তাদের এই আইনকে পশ্চাদতলে দিতে বাধ্য হয়েছে।

পক্ষান্তরে, ইহুদী ধর্মে বিনা কারনের তালাককেও বৈধতা দিয়েছে। ইহুদী ধর্মে পুরুষকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, নিছক পছন্দ অপছন্দের কারনেও স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। পুরাতন নিয়ম (Old testament) এ বলা হয়েছে, 'কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করার পর কোন ত্রুটির কারনে তাকে পছন্দ হলো না, তারপর স্বামী তালাকনামা লিখে স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল, স্ত্রী স্বামীগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র আরেকজনকে বিয়ে করল। সেও পছন্দসই না হওয়ার কারনে তালাকনামা লিখে স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিল। এমতাবস্থায় প্রথম স্বামীর জন্য এ স্ত্রী পুণরায় বৈধ হবে না। কেননা, স্রষ্টার দৃষ্টিতে সে এখন নাপাক। এরকম বিয়ে মাবুদ

---

[৭] ডিউটারনমী, ২৪/১-৪।
[৮] ম্যাথিও- ৫/৩২, ১৯/৯।
[৯] মার্ক- ১০/১১-১২।
[১০] লূক- ১৬/১৮।
[১১] করিন্থীয়- ৭/৩৯।

ঘৃনা করেন।'[১২] ইহুদীদের 'হালীল' গোত্রীয় পণ্ডিতদের মতে, যে কোন কারনে এবং যখন খুশি স্ত্রীকে তালাক দেয়া যাবে, এমনকি নিছক খাদ্য নষ্ট করে ফেললেও। ইহুদী পন্ডিত 'আকীবা' বলেন, স্বামীর অধিকার আছে সে বর্তমান স্ত্রীর চেয়ে অধিক সুন্দরী স্ত্রী পেলেও আগের স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে।[১৩] অপর এক ইহুদী পন্ডিত 'মায়ার' বলেন, যদি স্ত্রী রাস্তায় খাওয়া দাওয়া করে, তাহলে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া আবশ্যক।[১৪] ইহুদী ধর্মে পুরুষকে নিছক অপছন্দের কারনে তালাক দেয়ার শুধু বৈধতাই দেয় না, বরং তাকে নির্দেশও দেয়। বলা হয়েছে, 'খারাপ স্ত্রী তার স্বামীর জন্য অপমান বয়ে আনে এবং সে অপরের ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র হয়। এ স্ত্রী স্বামীকে সৌভাগ্যবান বানাতে পারে না। নারীরা পাপাচারের কেন্দ্রবিন্দু, তাদের পাপাচারের কারনেই আমাদের সবাইকে মরতে হবে। খারাপ স্ত্রীকে যা খুশি তা বলতে দিও না। যদি সে তা মেনে না নেয় তাহলে তালাক দিয়ে তার থেকে মুক্ত হও।'[১৫] এভাবেই ইহুদী মতবাদে কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত কারন দর্শানোর শর্ত ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার স্বামীর হাতে দেয়া হয়েছে। ভাববার বিষয় হলো, দেখেশুনে বিয়ে করার পর অপছন্দ হলে দোষ কার? কোন স্বামী নোংরা চরিত্রের না হলে দেখেশুনে বিয়ে করার পর স্ত্রীকে অপছন্দ করতে পারে না।

আর হিন্দু ধর্মে তো তালাক চিন্তাই করা যায় না। (অবশ্য বর্তমান হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বিচ্ছেদ আইন করতে বাধ্য হয়েছে।) হিন্দু ধর্মমতে স্বামী যতই অসৎ, লম্পট, বদমায়েশ, নিষ্ঠুর, অপুরুষ হোক, স্বামীর জীবদ্দশায় অবলা স্ত্রীর মুক্তি তো নাই-ই, স্বামীর মৃত্যুর পরের দৃশ্য আরও ভয়াবহ। ঊনবিংশ শতাব্দির আগ পর্যন্ত কোন হিন্দু স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীকেও তার সাথে সহদহনে চিতায় উঠতে হতো। যা সতীদাহ প্রথা নামে সুপরিচিত। সতিদাহর কথা চিন্তা করলেও গা শিউরে উঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সদ্য বিধবা নারীকে উত্তেজক পানীয় পান করিয়ে কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে, অর্ধচেতন অবস্থায় সতীত্ব রক্ষার নাম করে স্বামীর সাথে চিতায় পুড়ানো হতো। হিন্দু গবেষক সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায়- 'সদ্য বিধবা নারী নববধুর মতো সাজে। তার শ্রেষ্ঠ পোষাকটি পরে। সিঁদুর, কাজল, ফুলমালা, চন্দন, আলতায় সুসজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে সে চিতায় উঠে তার স্বামীর পা দুটি বুকে আঁকড়ে ধরে কিংবা মৃতদেহকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করে। এইভাবে যতক্ষণ না আগুন জ্বলে উঠে ততক্ষণ সে বিভ্রান্তির সঙ্গে অপেক্ষা করে। যাতে শেষ মুহূর্তেও সে বিচলিত না হয় এবং নীতিগত বা দৃশ্যগতভাবে কোন ছন্দপতন না ঘটে, সেজন্য

[১২] ডিওটারনমী- ২৪/১-৪।
[১৩] তালমুদঃ গিট্টিন- ৯০/A-B, Epstein, P-১৯৬।
[১৪] তালমুদঃ গিট্টিন- ৮৯/অ।
[১৫] এক্সিলেসিয়াসটিকাস- ২৫/২৫।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে উত্তেজক পানীয় পান করায়। এমন কি, পরে যখন আগুনের লেলিহান শিখা অসহনীয় হয়ে উঠে, পানীয়র নেশা কেটে যায়, ফলে যদি সেই বিধবা বিচলিত হয়ে 'সতী'র মহিমা ক্ষুন্ন হবার আশংকা দেখা দেয় তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তাকে বাঁশের লাঠি দিয়ে চেপে ধরে। যাতে সে চিতা থেকে নেমে না আসতে পারে। অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য প্রতিবেশী, পুরোহিত, সমাজকর্তা সকলেই অতিমাত্রায় সহযোগিতা করে গান কীর্তণ করে, ঢাক বাজিয়ে। এতো উচ্চ উলুধ্বনিতে মেতে উঠে যে 'সতী' যা কিছু বলতে চাইবে সবই যেন উচ্চনাদে ঢেকে যায়।'[১৬] রাজা রামমোহন রায় আদালতে বলেছিলেন, এরা শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, স্বার্থলোভী। বিয়ের মাধ্যমে নারীকে পিতার সম্পত্তি থেকে চিরতরে বঞ্চিত করেও এরা ক্ষান্ত হয় না, স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী যাতে স্বামীর সম্পত্তিতেও কোন ভাগ বসাতে না পারে, সেজন্য নিকটাত্মীয়রাই সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফন্দি করে এই নিষ্ঠুর আয়োজনকে ধর্মে পরিণত করেছে। বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ কেমন সতীত্ব রক্ষা! একটি নিপরাধ জলজ্যান্ত মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, পাশে মা, বাবা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন সকলেই দাঁড়িয়ে 'বল হরি বল' কীর্তন গেয়ে নিজেদের স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও নারীদের প্রভুদাসী বানানোর নামে আমৃত্যু গনধর্ষণের কথা এতটাই লজ্জার যে বাধ্যতঃ পরিহার করলাম। এরাই নাকি মুসলিম নারীদের অধিকার ফিরিয়ে দিবে। ধিক!

অবশ্য বর্তমান হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার জন্য এই সতীদাহ প্রথার কথা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে না থাকার দাবি করে। এ দাবি উদ্ভট। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে নারীর সতীত্ব রক্ষার নামে কেবল বাংলায় (যা তখন বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) ২৩৬৬ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে সতী বানানো হয়েছিল, যার মধ্যে কলকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা ১৮৪৫। আর ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তের বছরে বাংলাতে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে 'সতী' বানিয়েছিলেন হিন্দু ঠাকুর-পুরোহিতগণ। গ্রন্থীয় রীতি না হলে এটি সম্ভব হতো না। এবার বাস্তবে দেখা যাক, এ রীতি গ্রন্থীয় কি না। বলা হয়েছে, 'যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়।'[১৭] আরও বলা হয়েছে, 'যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।'[১৮] আসলে পবিত্র করে না, চিন্তামুক্ত করে, কারন স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী একটি মহা চিন্তার কারন। আরও বলা হয়েছে, 'চিতায় বিধবা নারী তার স্বামীর মৃতদেহে আলিঙ্গন করবে অথবা তার মস্তকমুণ্ডন করবে।'[১৯] আরও

[১৬] প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ- পৃঃ ১৪৭।
[১৭] দক্ষ সংহিতা- শ্লোক নং ৪:১৮-১৯।
[১৮] ঐ- শ্লোক নং ৫:১৬০।
[১৯] ব্যাসস্মৃতি- ২:৫৫।

বলা হয়েছে, 'অহো নারীর প্রেম কি সুদৃঢ়, তারা স্বামীর দেহ ক্রোড়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে।'[২০] আরও বলা হয়েছে, 'মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে তেত্রিশ বছরই স্বর্গবাস করে।'[২১] অথর্ববেদে বলা হয়েছে, 'নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধু হতে।'[২২] তাছাড়া, ভগবান কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তার চার স্ত্রী রুক্ষিণী, রোহিণী, ভদ্রা এবং মদিরা তার চিতায় সহমৃতা হওয়ার ইতিকথা চলিত আছে। এমন কি বসুদেবের আট পত্নীও তার মৃত্যুর পরে সহমরণে গিয়েছিল। পঞ্চপাণ্ডবের পিতা, হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পরও তার দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রিও সহমরণে গিয়েছিল। হিন্দু ভাই বোনেরা অন্যের ধর্মে নারী অধিকার খোঁজার আগে নিজের ধর্ম নিয়ে একটু ভাবুন।

চূড়ান্ত কথা এই যে, খৃষ্টান ধর্মে তালাক একেবারে নিষিদ্ধ, ইহুদী ধর্মে কোন কারন ছাড়াই তালাক দেয়া যায়, হিন্দু ধর্মে তালাক তো নাই-ই, বরং স্বামীর মৃত্যুতেও নারীর কোন রেহাই নেই। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম এসেছে এই সমস্ত বিভিষীকার কবল থেকে নারীকে উদ্ধার করতে। সব ধর্মের সব ধরনের অসারতার অবসান ঘটিয়ে নারীর সহজ সাবলীল স্বাধীন জীবনযাপন নিশ্চিত করেছে একমাত্র মানবতার ধর্ম ইসলাম। জনৈক আমেরিকান জাজ একবার তার কোন এক বিচারে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'মুসলিম নারীরা সূর্যের মতই স্বাধীন। তারা যদি দশবারও বিয়ে করে তবুও তাদের স্বাধীনতা ও বংশ পরিচয়ে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না।' ইসলাম সাম্যের কথা বলে। মানবতার কথা বলে। মানবিকতার কথা বলে। চলুন বিবেককে প্রশ্ন করি, ইসলামী আইনে কি এমন অপূর্ণতা বা অভিনবত্বের অভাব রয়েছে যার দরুন বিজাতীয় আইনের অনুকরণ করে চলতে হবে? সুতরাং বলা যায়, সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়া তালাক উচ্চারণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অন্যায় কাজ। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে,

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

'তুমি যদি স্ত্রীর অবাধ্যতা কিংবা অশ্রাব্য দুর্ব্যবহার লক্ষ্য কর।'[২৩]

অর্থাৎ যদি তালাক দিতেই হয় তার জন্য উপযুক্ত উপসর্গ থাকা জরুরী। মুফাচ্ছিরীনগণ উপসর্গ বলতে বুঝিয়েছেন, স্ত্রীর চারিত্রিক অবক্ষয়, চরম নির্লজ্জতা, অশ্রাব্য দূর্ব্যবহার, পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়া, বেলাল্লাপনায় মত্ত থাকা, স্বামীর বৈধ নির্দেশে অবাধ্যতা, স্বামীর আমানত রক্ষায় উদাসীনতা, স্বামীর প্রতি আনুগত্যের অভাব কিংবা দ্বীন ধর্মের প্রতি অনীহার মাত্রা খুবই প্রবল হওয়া। মোটকথা, যেসব কাজ একটি সুখী-সমৃদ্ধ স্বাভাবিক

[২০] বৃহৎসংহিতা- ৭৪:২৩।

[২১] পরাশর সংহিতা- ৪:২৮।

[২২] অথর্ববেদ- ১৮:৩/৩।

[২৩] সুরা নিসা ঃ ৩৪।

দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তবে এক্ষেত্রেও পারষ্পরিক বুঝাপড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

'তবে তাদের দোষ হবে না যদি তারা উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে মীমাংসায় উপণীত হতে পারে। আর আপোস-মীমাংসাই কল্যাণকর।'[২৪]

বিচ্ছেদ মানেই বিষাদ। যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টের হওয়াটাই স্বাভাবিক। সহজ করে দেখার একদম সুযোগ নেই। অকারনে একটি সংসারের সংহার ঘটানো নিতান্ত পশুসুলভ ও অমানবিক কাজ। আমাদের বুঝতে হবে, একজন দুশ্চরিত্রা অসতী স্ত্রীর কারনে যেমন একজন স্বামীর জীবনে নেমে আসতে পারে দুঃখ-দুর্দশা ও অধঃপতনের ঝড়, তেমনি একজন গুণবতী সতী-সাধ্বী স্ত্রীর কারনেও একজন নিঃস্ব স্বামীর জীবনে আসতে পারে অনাবিল সুখ শান্তি ও উন্নতির জোয়ার। গতকালকের সর্বহারা স্বামী যখন আজকে অঢেল সম্পত্তির মালিক, তখন এমনও তো হতে পারে সেই কোটিপতি স্বামী কোন পরমা সুন্দরী ধনীর দুলালীর প্রেমে পড়ে তার পুরনো স্ত্রীকে আর তেমন সহ্য করছে না। যখন তখন তালাক দিয়ে বৃদ্ধ গরীব বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যার সুস্পষ্ট বৈধতা রয়েছে ইহুদী মতবাদে। নারী তো গাঙ্গের জলে ভেসে আসা খড়কুটা নয়। নারী কারও বোন, কারও মা, আবার কারও কন্যা। তাহলে একজন নারীকে সারাজীবন তালাকের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বাঁচতে হবে কেন? কেন একজন নারী তার সারাটা জীবন অনিশ্চিয়তার জাঁতাকলে পিষে মরবে? যে মেয়েকে একজন ভাল স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তার অসহায় পিতা বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ভিটেবাড়ি পর্যন্ত উজাড় করে দিতে দ্বিধা করে না, লাখ লাখ টাকা পণ দিতেও চিন্তা করে না, যেই নারীকে একজন ভাল স্বামীর বুকে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে বলে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সবকিছু ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসতে হয়, সেই নারী নর্দমার কাদা হলো কবে যে সারাজীবন একটি অন্ধকার অনিশ্চিত জীবনযাপনে সে বাধ্য থাকবে? সত্তর-আশি বছর সঙ্গ দিয়েও স্বামীর একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারনে মুহুর্তের মধ্যেই নারী রাস্তায়! এত ঠুনকো অধিকার দিয়ে আল্লাহ নারীদের সৃষ্টি করেন নি। আপনার আদরের মেয়েটিকে বা বোনটিকে স্বামীর হাতে তুলে দেয়ার আগে এই আইনগুলো জানিয়ে একবার জিজ্ঞেস করুন সে বিয়েতে বসবে কিনা, তারপর দেখুন নারীর ফুটফুটে চেহারাটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, স্বামী কর্তৃক কোন কারন ছাড়াই যখন খুশি তালাক দিতে পারার এই কুপ্রথাটি যতই ইসলামী প্রথা হিসেবে চালানো হোক, মুলত ইসলামে কোনকালেই এর অনুমোদন ছিল না।

[২৪] সুরা নিসা ঃ ১২৮।

তালাকে যাওয়ার পূর্বে স্বামীর জন্য দুটি আবশ্যিক পালনীয় ধাপ ঃ

তালাক যদি দিতেই হয়, তাহলে তালাকের সিদ্ধান্তে যাবার আগে ও পরে নিরুপায় স্বামীর জন্য পবিত্র কুরআনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, যা এক্ষেত্রে একেবারেই অপরিহার্য। এর বাইরে গিয়ে আল্লাহর সাথে নাফরমানি করে বিদআতি পন্থায় তালাক উচ্চারণ করা কোন অবস্থাতেই সিদ্ধ নয়, বরং পাপ। আজকের সমাজে তালাকের যে নিয়মের প্রচলন রয়েছে তাতে এই ধাপগুলো পুরোপুরি উপেক্ষিত। সুস্পষ্ট ওহীভিত্তিক বিধান থাকা সত্ত্বেও বিদআত চর্চা করা মানে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল নয় কি?

তালাকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কুরআনে বর্ণিত আবশ্যিক পালনীয় প্রাথমিক ধাপ দুটি হল ঃ

(এক) ঘরের বিবাদ ঘরেই মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা।

(দুই) ব্যর্থ হলে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ সালিশের দ্বারস্থ হওয়া।

আল্লাহ না করুন, উক্ত ধাপগুলো যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তখন পরবর্তী ধাপ হিসেবে আরও কয়েকটি গুরত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে স্বামীকে তালাক দেয়ার মত নিকৃষ্টতম হালাল কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চলুন, ধাপগুলো আলোচনা করা যাক।

ঘরের বিবাদ ঘরেই মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা ঃ

কিভাবে ঘরের বিবাদ ঘরে মিটিয়ে নিতে হবে সে উপায়ও পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। তা হল, বিবেচনাযোগ্য কারন পাওয়া গেলেও স্বামী তৎক্ষণাৎ তালাক দিবে না। যথাসাধ্য সবর চালিয়ে যাবে। অতঃপর **প্রথম পর্যায়** হিসেবে স্ত্রীকে ঠান্ডা মাথায় নম্রতার সহিত বুঝিয়ে শুনিয়ে মানসিকভাবে সংশোধনের চেষ্টা করবে। তা হতে পারে এরকম, দেখো! আমরা যদি আমাদের জেদের উপর অনড় থাকি তাহলে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে গড়াতে পারে একটু ভাবো। আমাদের হয়ত দুজনেরই নতুন করে জীবনসঙ্গী হবে, কিন্তু আমাদের সন্তানদের কি হবে? আমরা কি একে অপরকে একটু আধটু ছাড় দিয়ে সংসার যাত্রা সচল রাখতে পারি না? এভাবে মার্জিত ভাষায় সদুপদেশ দিবে। এতে যদি কাজ হয়ে যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ! বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে **দ্বিতীয় পর্যায়** হিসেবে স্ত্রীর কাছে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একই বিছানায় শুয়েও সংসর্গ পরিহার করে যাবে, যাতে স্ত্রীও এই অবহেলার দরুন স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করতে পারে আর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। এতেও কোন সুফল পাওয়া না

গেলে **তৃতীয় পর্যায়** হিসেবে স্বামী এবার পূর্বের তুলনায় একটু কঠোর অবস্থানে যাবে। তা হলো স্ত্রীর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত রেখে আপাতঃ দুরত্ব বজায় রাখবে, পরস্পর আলাদা বিছানায় অবস্থান করবে যাতে উভয়ে ঠান্ডা মাথায় স্থির করতে পারে তাদের কি করা উচিৎ। (এই অবস্থায় স্বামীর কোনভাবেই উচিৎ হবে না স্ত্রীকে মারধর করে বিষয়টি আরও জটিল করে ফেলা। কারন, এর পরবর্তী ধাপ হলো সালিশ। মারপিট করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সালিশ ডাকা তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। সমাজের প্রচলিত তালাক ব্যবস্থায় এই পর্যায়ে এসে স্বামীকে মারিমারি করতে উস্কে দেয়া হয়েছে কুরআনের দোহাই দিয়েই। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের প্রায় সব অনুবাদে সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে واضربوهن শব্দ দ্বারা অবাধ্য স্ত্রীকে মৃদু প্রহারের কথা বলা হয়েছে। আমরা বলছি, এ অনুবাদ যথার্থ নয়। গ্রন্থণার শেষাংশে এ প্রসঙ্গেও একটি দলিল নির্ভর আলোচনা যুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি।) আল্লাহর রহমতে যদি এখানেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায় তাহলে স্বামীর জন্য বৈধ হবে না আর বাড়াবাড়ি করা এবং ভিন্ন পথ অনুসন্ধান করা। উপরোক্ত নিয়মগুলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে,

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

'আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাদের থেকে (সাময়িক) পৃথক হও। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না।'[২৫]

এখানে পৃথক হওয়ার অর্থ হল, একই বিছানায় আলাদা শয়ন করেও কোন সুফল পাওয়া না গেলে পৃথক বিছানায় বা পৃথক কক্ষে অবস্থান করা। তবে স্ত্রীর পূর্ন নিরাপত্তার দায়ভার স্বামীর উপরে ন্যস্ত থাকবে। যার ইঙ্গিত রয়েছে পূর্ববর্তী في المضاجع বাক্যাংশে। এটি সালিশ পূর্ববর্তী সমঝোতার শেষ ধাপ।

নিখুঁত সালিশের দ্বারস্থ হওয়া ঃ

অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত বিবাদের কারনে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের তীব্রতা চরম পর্যায়ে চলে যায়। যা সাধারণত স্ত্রীর বদ স্বভাব বা তীর্যক মেজাজের কারনে অথবা স্বামীর পক্ষ হতে অহেতুক কড়াকড়ি ইত্যাদির কারনে হয়ে থাকে। যে কারনেই হোক, যখন ঘরের ব্যাপার আর ঘরে সীমিত থাকে না, তখন বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা, সাধারণত এসব ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের লোকেরা একে

[২৫] সুরা নিসা ঃ ৩৪।

অপরকে মন্দ বলে বেড়ায়, ফলে তাদের মাঝে বিভিন্ন ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এই ফেৎনা ফাসাদ থেকে বিরত রাখতে ইসলাম পারস্পরিক সংশোধনের সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে যে পদ্ধতির কথা বলে তা হল উভয় পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত একটি নিখুঁত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ সালিশী ব্যবস্থা। এটি তখনই যখন দুর্ভাগ্যবশত ঘরের বিবাদ ঘরেই মেটানো সম্ভব না হয়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ একটি নিরপেক্ষ, ন্যায়নির্ভর ও নিখুঁত সালিশি জলসার ব্যবস্থা করবে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হতে একজন করে অভিভাবক এ কাজের দায়িত্ব নিবেন। অতঃপর বিচারকগণ উভয়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমঝোতায় নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন এবং তালাক থেকে বিরত রাখার জন্য যথাসাধ্য বুঝাবেন, সেই সাথে উভয়কে চিন্তা-ভাবনা করারও পর্যাপ্ত সময় সুযোগ দিবেন। তারপর তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচারকগণ উচিৎ ফায়সালা ঘোষনা করবেন। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এসব তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।'[২৬]

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহঃ স্বীয় তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে 'তাফসীরে রুহুল মা'আনী'র বরাত দিয়ে উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করেন যে, আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما বাক্যটি দ্বারা দুটি বিষয় সুস্পষ্টঃ (এক) আপোষ-মীমাংসাকারী সালিশদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য গায়েবী সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ তা'আলা সম্প্রীতি ও মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরও একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন কারনে পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে সালিশদ্বয়ের যেকোন একজনের মনে নিঃস্বার্থতার অভাব ছিল কিংবা তাদের কেউ পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। (দুই) এই বাক্যের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দু'পক্ষের দু'জন সালিশকার পাঠানোর উদ্দেশ্য হল স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মীমাংসা করা। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকিল, প্রতিনিধি অথবা সালিশ নির্ধারণ করবে

[২৬] সুরা নিসা ঃ ৩৫।

এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এক্ষেত্রে এ সালিশদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তালাকের ব্যাপারে একমত হলে তালাকের ফায়সালাই হবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যেকোন সিদ্ধান্তে একমত হলে সেক্ষেত্রেও তাই হবে।[২৭] কাজেই, কুরআন অর্পিত এই দায়িত্ব পালনে সালিশগণের জন্য অত্যন্ত সততা, সতর্কতা ও ইসলামী আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা জরুরী। অতএব বুঝা গেল, ইসলাম নিরুপায় দম্পতিকে তালাকের অনুমতি দেয় ঠিক, তার আগে তালাকের পথ রুদ্ধ করতে যা যা করার দরকার সবই করে।

আজকাল দেখা যায়, একটি সম্পর্ক ভাঙনের পেছনে স্বয়ং অভিভাবকরাই বেশিরভাগ দায়ী থাকেন। আবার কোন কোন সালিশকার পক্ষপাতদুষ্ট ও ঘাতক দরদীর ভূমিকায় আভির্ভূত হন। এমতাবস্থায়, সংকট এড়াতে এই সালিশের দায়িত্ব পালন করবেন উভয় পক্ষের বিচারিক কার্যে অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও আল্লাহভীরু অভিভাবকগণ অথবা কোন শক্তিশালী নিরপেক্ষ সংস্থা কিংবা সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সংস্থার পক্ষে সরকার বা (ন্যায়পরায়ণ মুসলিম জাজ বিশিষ্টি) সরকারি আদালত। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন,

فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

'যদি উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ মতানৈক্যে লিপ্ত হয়, তাহলে রাষ্ট্রের শাসনকর্তাই হবেন সেই ব্যক্তির অভিভাবক যার (বিচারিক কার্যে দক্ষ) কোন অভিভাবক নেই।'[২৮]

এখন প্রশ্ন হতে পারে, রাষ্ট্রীয় আইন তথা যে আইনের ভিত্তিতে সরকারী আদালত সুরাহা বিধান করবেন, তাতে যদি কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন বা নীতিগত কোন বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে সমাধান কি? এ বিষয়েও সপ্তম অধ্যায়ে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছি।

এবার একান্ত নিরুপায় হলে তালাক ঃ

উপরোল্লেখিত কুরআনে বর্ণিত সবক'টি ধাপ এক এক করে অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অথচ কোনরূপ সমাধানে উত্তীর্ণ হওয়া গেল না, সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ আর কারোর উপর কাঠিন্য চাপিয়ে দিতে চান না। এবার পন্থা মোতাবেক কারো প্ররোচনায় প্রভাবিত না হয়ে সম্মানজনকভাবে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিবে। এতে করে একে অন্যের কাছ থেকে

[২৭] মা'রেফুল কুরআন, অনুঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান- পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫।
[২৮] আবু দাউদ- হাঃ ২০৮৫, তিরমিযি- হাঃ ৪০৭, ইবনে মাজাহ- হাঃ ৬০৫, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৪৩৫।

নিষ্কৃতি লাভ করতঃ উভয়ে স্বাধীন, সহজ ও সাবলীল জীবন-যাত্রা আরম্ভ করবে। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী,

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

'আর যদি তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন করে বিচ্ছেদের, তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।'[২৯]

وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سَعته

'যদি তারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ স্বীয় প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে সমৃদ্ধ করে দিবেন।'[৩০]

অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী যদি পৃথক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে উপণীত হয়, সেক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ প্রত্যেককে সহায়-সচ্চলতা দান করবেন। এই আয়াতে উভয়কে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, সংশোধন ও সমঝোতার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যদি বিচ্ছেদই অধিক কল্যাণকর হয়, তাহলেও কোনপ্রকার হতাশ ও বিহ্বল হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং মহান আল্লাহ প্রত্যেককে নিজ খজানা থেকে স্বাবলম্বী করে দেবেন।

কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত তালাক পদ্ধতি ঃ

কুরআন সুন্নাহ'য় তালাক সম্বলিত যাবতীয় বিধি-বিধান সবিস্তার ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই বিদআতি পন্থায় তালাক দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। নিম্নে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত তালাক প্রদানের বাস্তব পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হলো ঃ

১. স্ত্রী যে সময়ে ঋতুমুক্তা ও পরিচ্ছন্না হবে, সে সময়ে যৌন মিলনের পূর্বেই ন্যূনতম দুজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রেখে বিনা উত্তেজনায় স্থির মস্তিস্কে স্বামী তার স্ত্রীকে সম্মানের সহিত এক তালাক তথা 'প্রথম রেজয়ী তালাক' প্রদান করবে। এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত আছে,

عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين

'হযরত আব্দুল্লাহ (বিন মাসউদ) রাঃ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সহবাসমুক্ত পবিত্র অবস্থায় (তুহুরে) তালাক প্রদান হচ্ছে যথার্থ নিয়মের (সুন্নাত) তালাক।'[৩১]

[২৯] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৭।
[৩০] সুরা নিসা ঃ ১৩০।
[৩১] বুখারী- হাঃ ২০১০, ইবনে মাজাহ- হাঃ ৬৫১।

অন্যত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেন। তখন হযরত ওমর রাঃ উক্ত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি সাঃ ওমর রাঃ কে নির্দেশ দেন যে, আপনি আব্দুল্লাহকে বলুন সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং পরবর্তী তোহর পর্যন্ত আপন ঘরেই রেখে দেয়। অতঃপর স্ত্রী যখন পূণরায় ঋতুবতী হওয়ার পর পূণঃ ঋতুমুক্তা হবে, তখন ইচ্ছে করলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হল তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ইদ্দত যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'[৩২]

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের মৌলিক তিনটি সারনির্যাস হলো, (এক) তালাক সহবাসপূর্ব ও ঋতুমুক্তা অবস্থায় হওয়া বাঞ্চণীয়। (দুই) ঋতুবতী অবস্থায় প্রদত্ত তালাক সুন্নত তরিকার অন্তরায় হওয়ায় অসিদ্ধ এবং রজআত করা ওয়াজীব। (তিন) খোদ রাসুলুল্লাহ সাঃ-ই এই সুন্নাত তালাকের শিক্ষক এবং তিনি তাঁর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেন নি।

২. ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে তালাক দিবে এবং উভয়ে ইদ্দত গননা করবে। যেমন সুরা তালাকের প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُوا ٱلۡعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمۡ

'হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন। আর আপনার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে ভয় করুন।'[৩৩]

কালবীর ভাষ্যমতে এই আয়াতের শানে নুযুল হল, একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ হযরত হাফসা রাঃ কে কিছু গোপন কথা বলেন, পরে হযরত হাফসা রাঃ সে কথাগুলো হযরত আয়েশা রাঃ কে ভাগাভাগি করলেন। এ কারনে রাসুলুল্লাহ সাঃ হযরত হাফসা রাঃ এর উপর রাগান্বিত হন আর তালাক দেন। তারপর হাফসা রাঃ পিতার বাড়ি চলে যান। তখন এ

[৩২] বুখারী- হাঃ ৪৯৫৩, মুসলিম- হাঃ ৩৭২৫, আবু দাউদ- হাঃ ২১৮১, ২১৮৭, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৫২৯৯, মুয়াত্তা মালেক- হাঃ ২১৩৯, দারেমী- হাঃ ২২৬২।
[৩৩] সুরা ত্বালাক ঃ ১।

আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যাহাবী বলেন, শানে নুযুল হিসেবে এ সূত্রটিই সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য।[৩৪]

হযরত কাতাদাহ রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ আপন স্ত্রী হযরত হাফসা রাঃ কে তালাক দিলে তিনি তাঁর পিতার বাড়ি চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি (৬৫:১) নাযিল করেন এবং হাফসা রাঃ কে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি নির্দেশ আরোপ হয়। তারপর তিনি হাফসা রাঃ কে ফিরিয়ে আনেন। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ (আজমাঈন) হতে বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها

'রাসুলুল্লাহ সাঃ হযরত হাফসা রাঃ কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর রাজআত করেছিলেন।'[৩৫]

উপরোক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর এই যে, উদ্ধৃত আয়াতে মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাঃ এবং তাঁর সকল উম্মতগণকে সম্মোধন করেছেন। এ কারনেই আয়াতে 'তালাক' শব্দটির বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, হে নবী! আপনারা যখন আপনাদের স্ত্রীগণকে (নিরুপায় অবস্থায়) তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখেই তালাক দিবেন। অর্থাৎ এমন তুহরের মধ্যে তালাকটি হতে হবে যে তুহরে সহবাস হয়নি। আর তালাকের পর ইদ্দতসমূহ গণনা করাও আবশ্যিক, যাতে ইদ্দতের মধ্যেই তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হন। আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁকে যথাযথ ভয় করুন।[৩৬]

অতএব, আয়াতের শানে নুযুল ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে তিনটি বিষয় মূখ্য সাব্যস্ত হয়, (এক) তালাক দিতে হবে ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে যাতে ইদ্দত গণনা শুরু করা যায়। (দুই) রাগান্বিত অবস্থায় তালাক সিদ্ধ নয়, কারন এ সময় মানুষের চিন্তাশক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। এছাড়াও ক্রোধান্ধের তালাক পতিত হয় না মর্মে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সহিহ সুন্নাহ মজুদ আছে। সামনে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ। (তিন) ইদ্দত গণনা করা জরুরী যাতে ইদ্দতের মধ্যে হলে বিনা বিবাহে আর ইদ্দত পরবর্তী হলে পূণঃবিবাহের মাধ্যমে রাজআত করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি স্ত্রীকেও চিন্তা ভাবনার পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া যায়।

[৩৪] তাফসীরে মাযহারী।
[৩৫] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০১৬, আবু দাউদ- হাঃ ২২৮৫, দারেমী- হাঃ ২২৬৪।
[৩৬] তাফসীরে যালালাইন (বাংলায় অনূদিত)- খন্ডঃ ৬, পৃঃ ৫৭৯।

৩. তালাকদত্তা স্ত্রী তালাক শুনার পর থেকে ইদ্দত পালন আরম্ভ করবে। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'তালাকদত্তা নারীরা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেদের সংবরণ করে রাখবে।'[৩৭]

এখানে 'কুরু' বলতে নারীর ঋতুকাল নাকি ঋতুমুক্তি ব্যাপারটি অস্পষ্ট থাকায় বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে সুরাহা হলো, দুটোই সঠিক। যেমন ইমাম ইবনে জারীর রহঃ এর বরাত দিয়ে ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেন, 'আভিধানিক অর্থে 'কুরু' প্রত্যেক ঐ জিনিসের যাওয়া আসার সময়কে বুঝায়, যার যাওয়া আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, এ শব্দটির দু'টো অর্থ হবে। ঋতুও হবে এবং পবিত্রতাও হবে। আবু ওমর বিন আলা রহঃ বলেন, আরবে ঋতু ও পবিত্রতা দুটোকেই 'কুরু' বলে। আবু উমার বিন আব্দুল বার রহঃ বলেন, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের কারোর মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধই নেই।'[৩৮]

(নারী কতদিন ইদ্দত পালন করবে, কোথায় করবে, এ সময় তার জন্য কোন কোন কাজ করণীয় এবং বর্জণীয় তা নারীর অবস্থাভেদের ভিত্তিতে নির্দেশিত হয়েছে। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে সেসব বিধি-বিধান আলাদাভাবে উপস্থাপন করেছি।)

৪. তালাক প্রদানের প্রাক্কালে মজলিসে নির্ভরযোগ্য দুজন স্বাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। স্বাক্ষী রাখার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

'অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে।'[৩৯]

অনুরূপ রাজআত[৪০] করার সময়ও স্বাক্ষী রাখা জরুরী। যেমন হাদীসে এসেছে,

[৩৭] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৮।
[৩৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর- পৃঃ ৬৩১।
[৩৯] সুরা ত্বালাক ঃ ২।
[৪০] রাজআত হলঃ প্রথম বা দ্বিতীয় তালাকের পর ইদ্দতের ভিতরে বিনা বিবাহে অথবা ইদ্দত পরবর্তী বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া।

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ

'ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ থেকে বর্ণিত, তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তার সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে কোন সাক্ষী রাখে নি। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাত নিয়মের বহিঃর্ভূত তালাক দিয়েছ এবং সুন্নাত নিয়মের তোয়াক্কা না করেই ফিরিয়ে নিয়েছ। তুমি তাকে তালাক ও রাজআত করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রেখ।'[৪১]

স্যাক্ষী রাখার ব্যাপারেও ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহঃ ও ইমাম আহমদ রহঃ এর মতে, রাজআত করার সময় সাক্ষী রাখা ওয়াজিব এবং বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রাক্কালে সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব। আর হানাফীগণের মতে সাক্ষ্য বানানো ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের কোন কোন কিতাবে সাক্ষী রাখা অ-জরুরীও বলা হয়েছে। কারন, হানাফীগণ মনে করেন তালাক নিছক ক্রয়-বিক্রয়ের মত একটি বিষয়। ওয়াজীব, মুস্তাহাব যাই হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে এটি কুরআনী বিধান। কাজেই এ বিধানকে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

৫. যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর পুণর্মিলন ও সন্ধির সুযোগ থেকে যায় এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছাও তাই, সেজন্য স্বামী তার স্ত্রীকে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করবে না, যদি না সে সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আবার স্ত্রীকে সংকটে ফেলার উদ্দেশ্যে ঘরে আটকে রাখাও গুরুতর অন্যায়। স্ত্রীকে আপন ঘর থেকে বহিষ্কৃত না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে (স্ত্রীদের) তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়। যদি তারা সুস্পষ্ট কোন অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর নতুন কোন (মিল-মিশের) উপায় সৃষ্টি করে দেবেন।'[৪২]

তালাকের প্রক্রিয়াটি এভাবে দীর্ঘায়িত করা আর স্ত্রীকে নিজ গৃহ থেকে বহিষ্কার করতে বারণ করার মহৎ উদ্দেশ্যটি এই যে, যাতে স্বামী স্ত্রীর সহাবস্থানের ফলে কিংবা কোন

[৪১] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০২৫, আবু দাউদ- হাঃ ২১৮৬, ইরওয়া- হাঃ ২০৭৮।

[৪২] সুরা ত্বালাক ঃ ১।

না কোন ঢংভঙ্গি বা পারস্পরিক ভাল কোন আচরণের দরুন একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায় আর পরস্পরের মাঝে সমঝোতা তৈরী হয়ে যায়। আল্লাহু আকবার! মহান আল্লাহর কি অনুপম প্রজ্ঞা! তাফসীরে যালালাইনে 'তাফসীরে কাবীর' এর বরাত দিয়ে টীকা সংযোজিত হয়েছে, 'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে স্বামীর অন্তরে লজ্জা বা অনুতাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে পূণরায় ফিরে পাওয়ার জন্য স্বামীর মনে প্রেম তৈরি হতে পারে। এতে প্রমাণ হয় যে, তালাক প্রদানের যথার্থ নিয়ম হল পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়া, একসাথে তিন তালাক না দেওয়া। আবু ইসহাক রহঃ বলেন, একই সময়ে প্রদত্ত তিন তালাক যদি আইনসিদ্ধ হয় তাহলে আয়াতের শেষাংশে 'সে জানে না, হয়তো মহান আল্লাহ এই তালাকের পর নতুন কোন (মিল-মিশের) ব্যবস্থা করে দেবেন' এ উক্তির কোন মানে হতে পারে না। অর্থাৎ পূণর্বার রাজআত করার সুযোগ না থাকার কারনে মিল-মিশের কোন ব্যবস্থা আর অবশিষ্ট থাকে না।'[৪৩] সুতরাং এ থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া হারাম এবং কুরআনের বিধি বহিঃর্ভূত আচরণ। কাজেই তালাক পৃথক পৃথকভাবে ধাপে ধাপে পন্থা মোতাবেক হওয়া আবশ্যক।

আয়াতের মৌলিক তিনটি শিক্ষা এই যে, (এক) তালাক দিয়ে স্ত্রীকে স্বামীগৃহ থেকে বহিষ্কৃত করা যাবে না। স্ত্রীরও একেবারে নিরুপায় না হলে স্বামীগৃহ ত্যাগ করার অধিকার নেই। (দুই) স্ত্রী জঘন্য অশ্লীলভাষী হলে, স্বামী পক্ষের লোকজনের সাথে তুমুল ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কিংবা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে স্বামীগৃহ থেকে বহিষ্কৃত করা যাবে, কিন্তু ইদ্দতের হুকুম নিঃশেষ হয়ে যাবে না। (তিন) তালাক বিলম্বিত ও পৃথক পৃথক তুহরে হওয়া বাঞ্চণীয়।

৬. এভাবে প্রথম তালাকের মুদ্দত নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বে যদি স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মাঝে সমঝোতা হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ, দ্বিতীয় তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং এই এক তালাকই বলবৎ থাকবে। আর যদি সমঝোতায় উত্তীর্ণ হওয়া না যায়, তাহলে প্রথম তালাকের মত করে পরবর্তী তুহরে 'দ্বিতীয় তালাক' প্রদান করবে। এটি সর্বশেষ রজয়ী তথা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক। পবিত্র কুরআনের বাণী,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

[৪৩] যালালাইন- খন্ডঃ ৬, পৃঃ ৫৮৩।

‘তালাকে রাজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য তালাক) এর সীমা দু’বার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সদয়ভাবে বিদায় করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।’[৪৪]

মহানবী সাঃ এর আবির্ভাবের পূর্বে এরূপ একটি বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল যে, স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। ফলে স্ত্রীগণ এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিল। তখন ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক মাত্র দু’বার দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাকের পর আর প্রত্যাহার করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। মুসনাদে ইবনে আবি হাতীম গ্রন্থে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে রাখবও না, ছেড়েও দেব না। স্ত্রী বলল, তা কিরূপে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় হলেই পূণরায় ফিরিয়ে নেব। আবার তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই পূণরায় ফিরিয়ে নেব। এরূপ করতেই থাকব। তারপর ঐ স্ত্রীলোকটি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করলে অত্র আয়াতটি নাজিল হয়।[৪৫]

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহঃ স্বীয় তাফসীরে মা’আরেফুল কুরআনে ‘তাফসীরে রুহুল মাআনী’র বরাত দিয়ে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন, ‘উদ্ধৃত আয়াতে ‘মার্‌রতান’ শব্দ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, একসঙ্গে দুই তালাক উচ্চারণ করা উচিৎ নয়। বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। ‘আত্ তালাকু তালাকান’ এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু ‘মার্‌রতান’ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথকভাবে হওয়াই উচিৎ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি একবারে দু’টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু’বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কুরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া।’[৪৬]

[৪৪] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।
[৪৫] ইবনে কাসীর- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৩৪-৬৩৫।
[৪৬] তাফসীরে মা’রেফুল কুরআন, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহঃ- ১ম খন্ড, পৃঃ ৫২৮।

‘তাফসীরে আহসানুল বায়ান’ এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ‘আয়াতে মহান আল্লাহ ‘তালাকাতান’ (দু’তালাক) বলেন নি, বরং বলেছেন, ‘আত্ তালাকু মার্‌রতান’ (তালাক দু’বার)। এ থেকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একই সময়ে দুই বা তিন তালাক দেওয়া এবং তা কার্যকরী করা মহান আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। মহান আল্লাহর হিকমতের দাবি হলো এই, একবার তালাক দেওয়ার পর (তাতে ‘তালাক’ শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার প্রয়োগ করুক) এবং অনুরূপ দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর (তাতেও ‘তালাক’ শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার প্রয়োগ করুক) স্বামীকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ত্বরান্বিত ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূণর্বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া। আর এই হিকমত এবং হিকমতের যৌক্তিকতা এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেওয়া তিন তালাককে তিন তালাক কার্যকরী সাব্যস্ত করে চিন্তা-বিবেচনার সুযোগ ও ভুল সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিলে সেই হিকমত আর অবশিষ্ট থাকে না।’[৪৭]

এখানেও দেখা যাচ্ছে, তালাক পৃথক পৃথক হওয়া আবশ্যিক। একসাথে দুই তালাক বা দুইয়ের অধিক তালাক দেওয়া বস্তুত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনেরই নামান্তর। যা মারাত্মক অন্যায়।

৭. আর ইতিমধ্যে স্বামী যদি স্ত্রীকে ছাড়তে না চায় অর্থাৎ রেখে দিতে চায়, তাহলে তাকে দুজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে পূণরায় স্বাচ্ছন্দে ফিরিয়ে নিতে পারবে। নিচের আয়াতগুলো লক্ষ্য করা যাক,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়, তারপর হয় নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সদয়ভাবে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে।’[৪৮]

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

[৪৭] তাফসীরে আহসানুল বায়ান, কৃত- মাওলানা সালাহ উদ্দীন ইউসূফ- পৃঃ ৬৪।
[৪৮] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩১।

'অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন।'[৪৯]

আয়াতদ্বয়ের শিক্ষা এই যে, একবার বা দুবার পর্যন্ত দেওয়া রেজয়ী তালাক যার ইদ্দতের সময় পূর্ণ হয়ে আসছে, এখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় নি, এ সময় স্বামীর দুটো অধিকার রয়েছে। (এক) দুজন নির্ভরযোগ্য লোকের উপস্থিতিতে হয় স্ত্রীকে সম্মানের সহিত নিজের বৈবাহিক সম্পর্কে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে। (দুই) নয়ত ভদ্রতা ও হৃদ্যতার সাথে সসম্মানে বিদায় জানাবে আর উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে। কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে আটকে রাখা যাবে না। মোটকথা, উভয় পন্থার যেটিই গ্রহন করা হোক, তাতে শরীয়ত ও নৈতিকতার বিষয়টিই হবে মুল লক্ষ্যণীয়।

আর বিশেষ করে দুটো কারনে সাক্ষী রাখা জরুরী। (এক) স্ত্রী পক্ষ থেকে যদি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে তা উক্ত সাক্ষী দ্বারা নিস্পত্তি করা হবে। (দুই) যদি কোন ব্যক্তি ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শয়তানী উদ্দেশ্যে এ দাবি করে বসে যে, আমি ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তালাক প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম, সেক্ষেত্রেও সাক্ষী জরুরী হবে। এসব দুষ্কর্ম প্রতিরোধকল্পেই কুরআন এ নিয়ম প্রবর্তন করেছে যে, তালাক প্রদানের জন্য যেমন সাক্ষী রাখা জরুরী তেমন প্রত্যাহারের জন্যও জরুরী।[৫০] কাজেই এটিকে নিছক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে তুলনা করে উড়িয়ে দেওয়া বা হালকা করে দেখা পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

৮. প্রথম তালাক অথবা দ্বিতীয় তালাক দেয়ার পর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলেও স্বামী ইচ্ছে করলে তালাকদত্তা স্ত্রীকে পূণরায় বিয়ে করতে পারবে। এতে স্ত্রীর অভিভাবকেরা কোন প্রকার বাধা বা গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم
بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ন করে ফেলে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীর সাথে (পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে

---

[৪৯] সুরা ত্বালাক ঃ ১।
[৫০] মা'রেফুল কুরআন- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৫৩৮, যালালাইন- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৫০২।

নিয়মানুযায়ী) বিয়ে করাতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।'[৫১]

আয়াতটি হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার রাঃ ও তাঁর ভগ্নী সম্মন্ধে অবতীর্ণ হয়। সহিহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর রয়েছে যে, হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার রাঃ বলেন, আমার নিকট আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব আসলে আমি তাকে বিয়ে দিয়ে দেই। তার স্বামী কিছুদিন পর তাকে তালাক দিয়ে দেয়। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূণরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে হযরত মা'কাল রাঃ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সঙ্গে আর আমার বোনের বিয়ে দেবো না' এ শপথ সত্ত্বেও আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে ডেকে পাঠিয়ে পূণরায় তার সাথে তাঁর বোনের বিয়ে দেন। তারপর নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। তাঁর ভগ্নীর নাম ছিল জামিলা বিনতে ইয়াসার রাঃ এবং স্বামীর নাম ছিল আবুল বাদাহ রাঃ। কেউ কেউ তাঁর নাম ফাতিমা বিনতে ইয়াসারও বলেছেন।[৫২] হাদীসটি নিম্নরূপ,

حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم عن يونس عن الحسن 'فلا تعضلوهن' – قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه–[৫৩]

সুতরাং, উদ্ধৃত আয়াত ও হাদিসের মৌলিক নিহিতার্থ হলো, কোন স্ত্রীলোককে তার স্বামী রজয়ী তালাক দেয়ার পর যদি ইদ্দতকালের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা উভয়ে আবার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বৈবাহিক সম্পর্কে আসতে চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের মোটেও অধিকার নেই তাদের এই পদক্ষেপে প্রতিবন্ধক হওয়ার।

এই হল প্রথম দুই তালাক তথা তালাকে রজয়ীর শরয়ী রীতি। এই শরয়ী রীতির একটি বড় সুবিধা এই যে, ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পূর্বে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে যেমন নতুন করে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই তেমনি প্রথম দুই তালাকের পর ইদ্দতের মুদ্দত নিঃশেষিত হওয়ার পরও উক্ত পুরুষ তার তালাকদত্তা

---

[৫১] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩২।
[৫২] তাফসীরে ইবনে কাসীর- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৪৯।
[৫৩] বুখারী- হাঃ ৪৮৩৭।

নারীকে পুণর্বিবাহ করে স্বাচ্ছন্দে ফিরিয়ে নিতে পারে। অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ক্রমেই যদি সমঝোতা ও পুণর্মিলন সম্ভবপর হয়ে না উঠে, সেক্ষেত্রে উক্ত নারীর পক্ষে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পথেও কোন বাধা থাকে না। এই শরয়ী রীতির মধ্যে যেরূপ অনুশোচনা ও লজ্জার অবকাশ নাই, তেমনি হিল্লা, ঠিকা বা ভাড়া আকদ প্রভৃতির হাঙ্গামা ও লাঞ্চনা ভোগেরও আবশ্যকতা দেখা দেয় না। ইসলাম কতই না সুন্দর!

৯. এভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় রজয়ী তালাক নির্ধারিত পন্থায় অতিক্রম করে শেষ তালাকটি (তৃতীয় তালাক) তথা তালাকে মুগাল্লাযা, যদিও না দেওয়াটাই উচিৎ, তথাপি দিয়ে ফেললে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না, যতক্ষণ না সে অন্যত্র স্বাভাবিকভাবে[৫৪] বিয়ে করে নেয়। অতঃপর উক্ত স্বামী মারা গেলে অথবা নিয়ম অনুযায়ী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দিয়ে দিলে কিংবা 'খুলা' প্রভৃতির মাধ্যমে স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিলে তখন পুনর্বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে কোন বাধা নেই। পবিত্র কুরআনের বাণী,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا

إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (পন্থা মোতাবেক দুইবার রজয়ী তালাক দেওয়ার পর তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী (পন্থা মোতাবেক) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।'[৫৫]

(একটি সতর্কবার্তাঃ তালাক ব্যবস্থার এই জায়গাটি খুবই ঝুঁকির। এই আয়াতের মুল মর্মার্থ উপলব্ধি করতে গিয়ে বহু বোধসম্পন্ন আলেম ওলামারাও হোঁচট খেয়ে বসেন। সেই হোঁচট ধীরে ধীরে তিল থেকে তালে পরিণত হয়। তারপর পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় নানা বিশৃঙ্খলা, অশান্তি আর গোলযোগ। পাতানো বিয়ে থেকে শুরু করে আরও কত নোংরামীই না দেখতে হয় ধর্মের নামে। খবরদার! ইসলামে হিল্লা বা পাতানো বিয়ের কোন স্থান নেই। এসব নোংরা কাজে

---

[৫৪] স্বাভাবিক বিয়ে হলো যে বিয়ে স্থায়ী ও আগ্রহের, পারস্পরিক ভালবাসাপূর্ণ, সন্তান লাভের আশায় ও নিজেদের যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে হয়।

[৫৫] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩০। এ বিষয়ে আরও দেখুন, বুখারী- হাঃ ৫২৬০, আবু দাউদ- হাঃ ২৩০৯, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৯৩২, তিরমিযী- হাঃ ১১১৮।

যারাই অংশগ্রহন করে সবাইকে রাসুলুল্লাহ সাঃ অভিশম্পাত করেছেন এবং যাকে দিয়ে হিল্লা করানো হয় তাকে হাদীসে 'ভাড়াটে ষাঁড়' বলে ধিক্কার দিয়েছেন। হযরত ওমর রাঃ হিল্লা আয়োজকদের ব্যাভিচারের শাস্তিস্বরূপ প্রস্তরাঘাত করার ঘোষনা দিয়েছিলেন। 'নিকাহ হালালা' সংক্রান্ত অধ্যায়ে এই আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর, আয়াতের ভুলব্যাখ্যা ও তার জবাব বিশদভাবে আলোচনা করেছি।)

ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াটাও অপছন্দনীয় কাজ। যা গ্রন্থণার প্রারম্ভে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু একান্ত অপারগ অবস্থায় যদি তালাকের পথে অগ্রসর হতেই হয় অর্থাৎ একেবারে নিরুপায় হলে, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। এক তালাক দিয়ে স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি এ সময়ের ভিতর সংশোধন হয়ে যায় তাহলে রাজআত করে নিবে। অন্যথা ওভাবেই ছেড়ে দিবে অথবা দ্বিতীয় তালাক দিয়ে পূণর্বার সংশোধনের সুযোগ দিবে এবং ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি এতেও স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন না আসে অর্থাৎ নিজেকে শুধরে না নেয়, তাহলে ইদ্দত সমাপ্ত করে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। এটিই হলো তালাকের সর্বোত্তম পদ্ধতি যেটাকে 'তালাকে আহসান' বলা হয়। এ পদ্ধতির উপকারিতা হলো, ইদ্দত শেষ হওয়ার পরও যদি কখনো তারা পূণরায় সংসার জীবনে ফিরে আসতে চায়, তখনও এ সুযোগ অবশিষ্ট থাকে যে উভয়পক্ষের সম্মতিতে পূণর্বিবাহের মাধ্যমে তারা আবার সাংসারিক জীবন শুরু করতে পারে। কিন্তু সর্বশেষ সীমারেখাটাও অতিক্রম করে ফেললে রাজআতের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রত্যাহারের আর কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, এ অবস্থায় এটা ধরে নেওয়া হয় যে, সবদিক বুঝেশুনেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই সে তালাকের সবকটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। সবগুলো সুযোগ ভোগ করেও যারা মীমাংসায় উপণীত হতে পারে নি, তাদের শাস্তি আল্লাহ এভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, তারা আর একসাথে হতে পারবে না। কারন তখন এটাই ধরে নেয়া হয় যে, তারা আল্লাহর বিধান নিয়ে বারবার ঠাট্টা করেছে, আল্লাহর ইচ্ছাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। তবে স্ত্রী যদি কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে পরস্পরকে ভালবেসে স্থায়ীভাবে সংসার করার মানসে অন্য স্বামী গ্রহন করে নেয় এবং সেই স্বামীর মৃত্যুর কারনে হোক কিংবা স্বাভাবিক অন্য কোন কারনে যদি স্ত্রী স্বামী পরিত্যক্তা হয় তাহলে পূর্ব স্বামী তাকে গ্রহন করতে পারে।[৫৬]

---

[৫৬] মা'রেফুল কুরআন- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৫২৯, যালালাইন (টীকা), খন্ডঃ ১, পৃঃ ৫০১।

এখানে কুরআনে করীমের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে আরেকটা বিষয় পরিস্কার বুঝা যায় যে, কুরআনে কিন্তু তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয় নি, উহ্য রাখা হয়েছে। তৃতীয় তালাক উহ্য রাখার পেছনে পবিত্র কুরআনের সুমহান প্রজ্ঞাটি হলো, ইসলাম চায় না মানুষ তৃতীয় তালাকটিও উচ্চারণ করে পূণর্মিলনের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিক। এজন্য তৃতীয় তালাককে إِن শব্দের মধ্যে উহ্য রাখা হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালিক রাঃ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم إني أسمع الله تعالى يقول : الطلاق مرتان فأين الثالثة قال

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة

'জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করল, কুরআনে দু'বার তালাক দেওয়ার কথা পাচ্ছি, কিন্তু তৃতীয় তালাক কোথায়? রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (হয় হৃদ্যতার সাথে রেখে দিবে অথবা সদ্ভাবে বিদায় করবে), এটিই হল তৃতীয় তালাক।'[৫৭]

হাদিসটি অপর এক সনদে মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ ও মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকেও বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মৌলিক তিনটি তাৎপর্য হল, (এক) প্রথম তালাক, বড়জোর দ্বিতীয় তালাক দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ। তৃতীয় তালাক না দেওয়াটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। (দুই) আইনসিদ্ধ উপায়ে তৃতীয় তালাক প্রদানের পর প্রত্যাহারের আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না। যদি স্ত্রীর অন্যত্র স্থায়ীভাবে বিয়ে হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে শরীয়ত সম্মত উপায়ে স্ত্রী স্বামী পরিত্যক্তা হয় তবেই প্রথম স্বামী তাকে গ্রহন করতে পারে। (তিন) এতে ঠিকা, হিল্লা, ভাড়া আকদ প্রভৃতির ন্যায় কোনরূপ ধোঁকাবৃত্তির আশ্রয় নেয়া হারাম। এসবের মাধ্যমে কেউই কারোর জন্য হালাল হয় না, বরং এতে অংশগ্রহনকারী সবাই ব্যভিচারী এবং ব্যভিচার কার্যে সহযোগী হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

১০. প্রতি তুহরে এক তালাক এক তালাক করে পরপর তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়াই হলো রাসুলুল্লাহ সাঃ এর শেখানো নিয়ম (সুন্নত)। যেমন,

عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها

[৫৭] ইবনে কাসীর- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৩৫, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭৬৮, দারাকুতনী- হাঃ ৪/২।

'হযরত আব্দুল্লাহ রাঃ বর্ণনা করেন, তিনি সুন্নাত তালাক সম্পর্কে বলেনঃ স্বামী স্ত্রীকে তার (সহবাসমুক্ত) প্রতি তুহরে এক তালাক দিবে এবং সে তৃতীয় তুহরে পৌঁছলে তাকে শেষ তালাক দিবে।'[৫৮]

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر

'হযরত ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, সুন্নাত হচ্ছে তুমি তুহরের অপেক্ষা করো, তারপর প্রতি তুহরে তালাক দাও।'[৫৯]

হাদিসটি আল্লামা দারাকুতনী এবং তাবারানীও স্ব স্ব সনদে নকল করেছেন। ইমাম তাবরানীর বর্ণনায় এও এসেছে যে,

إذا أراد أن يطلقها للسنة ثلاثا طلقها في طهر واحدة ثم عليها حيضة بعد آخر تطليقة

'যখন কোন ব্যক্তি সুন্নাহ অনুমোদিত তিন তালাক দিতে চায়, তাহলে প্রতি তুহরে এক তালাক দিবে। অতঃপর যখন এক হায়েয অতিক্রান্ত হবে, দ্বিতীয় তালাক দিবে।'[৬০]

উল্লেখিত হাদিসসমূহে একটা বিষয় পরিস্কার যে, নিরুপায় স্বামীর জন্য তালাক প্রদানের এই পদ্ধতি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক সাব্যস্ত সুন্নাত। কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সুন্নাত মজুদ থাকাতে 'তালাকে বিদআত' নামক তালাকের নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবনের লেশমাত্র সুযোগও আর অবশিষ্ট রইল না। কোন কোন হযরাত 'এটি তো সুন্নাত পদ্ধতি' বলে অতি তাচ্ছিল্যের সাথে বুঝাতে চান এ পদ্ধতির তেমন গুরুত্ব নেই। খোদ রাসুলুল্লাহ সাঃ যেই পদ্ধতির শিক্ষক, সেই পদ্ধতির সংশোধনী কিংবা বিপরীত পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রাসুলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক সাব্যস্ত সুন্নাতকে কমজোর গুরুত্বহীন জ্ঞান করা কিংবা অমূলক সাব্যস্ত করার এই হীন অপচেষ্টা আর সুন্নাত চর্চার প্রতি সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহিত করা নিতান্ত গোমরাহী ছাড়া আর কি হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।'[৬১]

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

[৫৮] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০২১।
[৫৯] মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাক্বী- হাঃ ৪৬৬৭, মুয়াত্তা- হাঃ ৫৫২।
[৬০] মু'জামুল কাবীর- হাঃ ৯৬৩২।
[৬১] সুরা হুজুরাত ঃ ১।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, একটু আগে বলা হয়েছে তৃতীয় তালাক না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এখানে সেই তালাককেও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত বলা হচ্ছে। এই বৈপরিত্যের নিরসন কিরূপে হবে? আসলে কোন প্রকারের তালাকই পছন্দনীয় নয়। শুধু তৃতীয় তালাক কেন, সব ধরনের তালাক না দেওয়াটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। শরীয়ত এই বিধান প্রবর্তন করেছে শুধু সেইসব নিরুপায় স্বামীদের জন্য, যাদের জন্য তালাক দেওয়াটাই অপরিহার্য হয়ে গেছে। আর যখন অপরিহার্য হয়, তখন ঠান্ডা মাথায় ধির-স্থিরভাবে নির্ধারিত নিয়মের ভিতর দিয়ে তালাকের পথে অগ্রসর হয়ে পরস্পর থেকে মুক্তিলাভের জন্যই শরীয়তের এই নির্দেশনা। ফলকথা হলো, এ স্থানে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, তালাক দিয়ে জীবনে একবার হলেও এই সুন্নাত পালন করা সওয়াবের কাজ। এটা শুধু তখনই সুন্নাত যখন তালাক দেওয়া একান্ত অপরিহার্য হয়। যেমন যাকাত তখনই ফরয যখন নেসাব পরিপূর্ণ হয়, অথবা প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বিয়ে করা সওয়াবের কাজ কিন্তু না-বালেগের জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে জগদ্বিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা আলুসী আল বাগদাদী রহঃ স্বীয় তাফসীরে উপরোক্ত হাদিস বর্ণনা করার পর লিখেন, 'সুন্নাত শব্দ দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এই আমল দ্বারা সওয়াব পাওয়া যাবে। কারন, এ কাজটি মুবাহ মাত্র, কোন মুস্তাহাব বা মুস্তাহসান কাজ নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, দ্বীনের মধ্যে এ পদ্ধতি তার জন্য যার জন্য তালাক অপরিহার্য হয়েছে।'[৬২]

এই হল কুরআন সুন্নাহ অনুমোদিত তালাকের পদ্ধতি। এর বাইরে গিয়ে তালাকের যথেচ্ছা ব্যবহার সুস্পষ্ট বিদআত ও গা-জোরি আচরণ। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমারেখা তথা তালাক সম্বলিত নীতি নির্দেশনা এত বিশদভাবে বর্ণিত হওয়ার পরও, সেই সাথে বিদআত সর্বদা প্রত্যাখ্যাত জেনেও 'তালাকে বিদআত' নামক তালাকের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের কি অর্থ থাকতে পারে? পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বাণী,

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

'এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে।'[৬৩]

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তারাই জালিম।'[৬৪]

[৬২] রুহুল মা'আনী- খন্ডঃ ২, পৃঃ ১৩৬।
[৬৩] সুরা ত্বালাক ঃ ১।
[৬৪] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

'আর আল্লাহর প্রত্যাদেশকে তামাশার বস্তু বানিয়ো না।'[৬৫]

বড়ই পরিতাপের বিষয়, সমাজে আজকাল শুধু বিদ'আতের জয়-জয়কার চলছে। আজ যদি সমাজে কুরআনী পন্থায় তালাক দেওয়ার রেওয়াজ চালু থাকত, তাহলে মুসলিম সমাজে এই তালাক ব্যবস্থা একটি গর্বের ব্যাপার হতো। যুবক-যুবতী নির্ভয়ে বিয়েতে উৎসাহী হতো। পথে-ঘাটে সচরাচর হওয়া পশুর মতো লিভ-টুগেদার, যুবক-যুবতীর বেশ্যালয়ে যাওয়া আসা সহ প্রায় সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ শূণ্যে নেমে আসত। আর হিল্লার নামে রাতের আঁধারে চুপিসারে বিছানা বদলের মত অসভ্যতামীও দেখতে হতো না। মুসলমানদের চিরন্তন ইতিহাস, যখনই কোন জাতি কুরআন সুন্নাহ প্রবর্তিত রীতি-নীতি থেকে সরে এসেছে আর নিজ প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছে, তখনই সে জাতি নানা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির দাবানলে পুড়ে মরেছে। আল্লাহ আমাদের কুরআন সুন্নাহ'র প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন।

[৬৫] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩১।

ইদ্দত (waiting-period) ঃ

ইদ্দত হল সদ্য তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীর মৃত্যুর কারনে বিধবা কিংবা অন্য কোন কারনে বৈবাহিক বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া নারীর যে সময়টাতে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সিদ্ধ নয়। (The waiting-period is that the divorced or relicted woman can not get married to another one on periods of the time.)

স্ত্রীর ইদ্দতকাল তথা অপেক্ষার মুদ্দত (Period) ঃ

● তালাকপ্রাপ্তা অথচ সহবাস হয়নি এমন স্ত্রীর জন্য ইদ্দত নেই। বরং তাদের উত্তম কিছু উপহার দিয়ে কুরআনের নির্দেশ মতে সদ্ভাবে বিদায় করে দিবে। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নাই। অতঃপর তোমরা তাদেরকে (উপহার স্বরূপ উত্তম) কিছু দেবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দেবে।'[৬৬]

● তালাকপ্রাপ্তা নয়, স্বামীর মৃত্যুর কারনে বিধবা হয়েছে, এক্ষেত্রে সহবাস (Intercourse) হোক বা না হোক, গর্ভবতী না হলে এমন স্ত্রীর ইদ্দতকাল হল চার মাস দশ দিন। যেমন কুরআনের বাণী,

[৬৬] সুরা আহযাব ঃ ৪৯।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে।'[৬৭]

● যেসব সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাসিক ঋতুচক্র (Menstrual cycle) স্বাভাবিক, সেসব স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ মতে তাদের অপেক্ষার মুদ্দত হচ্ছে তিন 'কুরু' (মাসিক ঋতুকাল বা ঋতুমুক্তি)। যেমন বলা হয়েছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'তালাকদত্তা নারীরা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেদের সংবরণ করে রাখবে।'[৬৮]

● সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাসিক ঋতুচক্র (Menstrual cycle) স্বাভাবিক, কিন্তু ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর সচরাচর যে সময়টাতে মাসিক (Mens) হতো, সে সময়টাতে মাসিক হয় নি, কি কারনে হয় নি তাও স্ত্রীর জানা নেই, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর অপেক্ষার মুদ্দত এক বছর। প্রথম নয় মাস অপেক্ষা করবে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। অন্তঃসত্ত্বা হলে গর্ভপাতের সাথে সাথে স্ত্রীর ইদ্দতকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে আর অন্তঃসত্ত্বা না হলে পরবর্তী তিন মাস হবে স্ত্রীর ইদ্দতকাল। হযরত ওমর রাঃ মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে এরূপই ফায়সালা করেন। যেমন,

أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها فهذه عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة وهذا قضاء عمر

'হায়েয না হওয়ার কারন জানা না গেলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দত হল এক বছর। নয় মাস গর্ভ নির্ধারণের এবং বাকি তিন মাস ইদ্দতের। এ বিষয়ে হযরত ওমর রাঃ এর ফায়সালা এরূপই ছিল।'[৬৯]

[৬৭] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩৪।
[৬৮] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৮।
[৬৯] কিতাবুন নিকাহ- পৃঃ ১৮, 'ফিক্বহুস সুন্নাহ'(আরবী), কৃত- সায়্যিদ সাবিক্ব- পৃঃ ৬৭৪, মুখতাসার আল ফিক্বহুল ইসলামী, কৃত- মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আত তুয়াইজিরী- পৃঃ ৫৩৬।

● যেসব সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাসিক ঋতুচক্র (Menstruate) নেই, অর্থাৎ কিশোরী যার মাসিক এখনো শুরু হয়নি অথবা মাসিক শুরু হয়নি বটে, কিন্তু বয়স গণনার দিক থেকে সাবালিকা কিংবা বার্ধক্যজনিত কারনে ঋতুরুদ্ধা এমন স্ত্রীর ইদ্দতকাল হল তিন চন্দ্রমাস। যেমন মহান আল্লাহর বাণী,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে।'[৭০]

● আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে তালাকপ্রাপ্তা হোক কিংবা স্বামীর মৃত্যুর কারনে বিধবা হোক অথবা অন্য কোন কারনে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা হোক, সর্বাবস্থায় গর্ভঃস্থ সন্তান প্রসবের সাথে সাথে স্ত্রীর ইদ্দত সম্পন্ন হয়ে যায়। যেমন পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বাণী,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

'আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।'[৭১]

سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

'সুলাইমান ইবনু ইয়াসার রাঃ থেকে বর্ণিত যে, আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান রাঃ ও ইবনে আব্বাস রাঃ আবু হুরায়রা রাঃ এর নিকট সমবেত হলেন। তারা এমন একজন মহিলার কথা আলোচনা করছিলেন যিনি তার স্বামীর ইন্তেকালের কয়েক দিন পরেই সন্তান প্রসব করেছেন। তখন ইবনু আব্বাস রাঃ বললেন, তার ইদ্দত হবে দুটির মধ্যে দীর্ঘতরটি। আবু সালামা রাঃ বললেন, তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন বিষয়টি নিয়ে

[৭০] সুরা ত্বালাক ঃ ৪।

[৭১] সুরা ত্বালাক ঃ ৪।

তাঁরা উভয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবু হুরায়রা রাঃ বললেন, আমি আমার ভাতিজা আবু সালামার পক্ষে। এরপর তাঁরা সবাই ইবনু আব্বাসের মুক্তদাস কুরায়বকে উম্মু সালামা রাঃ এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। সে তাঁদের কাছে এসে বললো যে, উম্মু সালামা রাঃ বলেছেন, সুবায়'আ আসলামিয়া তার স্বামীর ইন্তেকালের কয়েক রাত পরই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সে বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।'[৭২]

● নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী যদি মনে করে এতদিনে তার স্বামী মারা গেছে সেক্ষেত্রে স্বামী নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পূর্ণ চার বছর অপেক্ষা করার পর মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দতের ন্যায় চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। এটিও হযরত ওমর রাঃ এর সিদ্ধান্ত যেটি গ্রহন করেছেন ইমাম আহমদ রহঃ ও ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহঃ এর মত উঁচুমানের বিদ্বানগণ। হানাফী মাযহাবে এ ব্যাপারে ফতওয়া বিদ্যমান থাকলেও হানাফী মতাবলম্বীগণ ইমাম আহমদ রহঃ এর রায়কেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায রহঃ এর অভিমত হল, নারীর খোরপোষ বা নিরাপত্তার অনিশ্চিয়তা দেখা দিলে মানবিক বিবেচনায় বিজ্ঞ কাযী এর কাছাকাছি কম সময়ও নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

تتربص امرأة المفقود بأربع سنين ثم تعتد للوفاة وهذا قضاء عمر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

'নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী পূর্ণ চার বছর অপেক্ষা করবে, তারপর মৃত স্বামীর স্ত্রীর ন্যায় ইদ্দত পালন করবে। এটি হযরত ওমর রাঃ এর ফায়সালা এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াও এ মত অনুসরণ করেছেন।'[৭৩]

قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا

'আবিদ ইবনে উমায়র বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রাঃ এর যুগে এক লোক নিখোঁজ হলে তার স্ত্রী এ বিষয়ে ওমর রাঃ কে অবহিত করে। ওমর রাঃ তাকে চার বছর অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে বলেন।'[৭৪]

[৭২] মুসলিম- হাঃ ৩৫৮৯।

[৭৩] কিতাবুন নিকাহ- পৃঃ ১৮।

● তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি ঋতুনিরাশ হয় আর মাস দ্বারা ইদ্দত পালন শুরু করে কিন্তু ইদ্দতকাল শেষ হবার পূর্বেই স্রাব দেখতে পায় তাহলে মাস হিসেবে পালিত ইদ্দত বাতিল হবে এবং নতুন করে হায়য দ্বারা ইদ্দত পালন শুরু করবে।[৭৫] এ বিষয়ে হেদায়া গ্রন্থাকারের বক্তব্য হলো,

وَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ انْتَقَضَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ

স্ত্রী যেখানে ইদ্দত পালন করবে ঃ

● সুস্পষ্ট ব্যাভিচারে লিপ্ত না হলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কেবল স্বামীগৃহেই ইদ্দত পালন করবে। যেমন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

'হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন। আর আপন পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করুন। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করবেন না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে।'[৭৬]

● তবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি এমন জঘন্য কটুভাষী বা বদঅভ্যস্থ হয় যার দরুন সে স্বামীগৃহে থাকলে পরিস্থিতি আরও সংকটময় হয়ে ওঠতে পারে কিংবা গৃহে স্বামীর অনুপস্থিতির দরুন স্ত্রী নিরাপত্তার অভাববোধ করতে পারে, সেক্ষেত্রে একান্ত

[৭৪] ইরওয়াউল গালিল- ৬/১৫০, মুগনি- ৯/১৩১, মানারুল সাবিল- ২/৮৮।

[৭৫] ফিক্‌হুস সুন্নাহ- পৃঃ ৬৭৭।

[৭৬] সুরা ত্বালাক ঃ ১।

জরুরীবশতঃ স্ত্রী অন্য নিরাপদ স্থানে ইদ্দত পালন করতে পারে। তবে সেস্থানেও পর্দার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول

'আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমাহ বিনতে ক্বায়স রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সমীপে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার আশংকা হয় যে, কেউ হয়তো আমার ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে আমার ক্ষতি করবে। রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুমতি দেন।'[৭৭]

রাসুলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক উক্ত তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ফাতেমা বিনতে ক্বায়সকে অন্যত্র ইদ্দত পালনের অনুমতি প্রদানের আরেকটি কারন হল, উক্ত মহিলা একেতো ছিল মুখোরা এবং যথেষ্ট বদ-মেজাজীও। আর যার ঘরে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (উম্মে মাকতুম রাঃ) তিনিও ছিলেন অন্ধ, সুতরাং পর্দা পালনের ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। পাশাপাশি উক্ত মহিলার বাসস্থলটিও ছিল ভীতিপ্রদ স্থানে। এছাড়াও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি এই যে, উক্ত মহিলা অত্যন্ত কর্কশভাষী ও বদ মেজাজী ছিল। তার আচরণে স্বামী পক্ষের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মানবতার দূত রাসুল সাঃ অনাকাঙ্খিত সংকট এড়াতেই উক্ত মহিলার জন্য এ বিধান জারী করেছিলেন। অবশ্য আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, উক্ত মহিলা বদ মেজাজের কারনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।[৭৮] কাজেই, একান্ত অরিহার্য না হলে স্বামীগৃহ ত্যাগ করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়।

● স্বামী মারা গেলে স্ত্রী যে গৃহে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পাবে সে গৃহ যদি তার জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক হয় তাহলে স্ত্রী সেখানে ইদ্দত পালন করবে। যদি স্ত্রী তার স্বামীগৃহে থাকাকালে স্বামীর মৃত্যু হয় এবং সেখানে তার দেখাশুনা করার মত তেমন কেউ না থাকে অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহে বসবাস করা স্ত্রীর জন্য অন্য কোন কারনে অসুবিধাজনক বা ক্ষতিকর মনে হলে সেক্ষেত্রে শ্বশুর বাড়িতে অথবা মায়ের বাড়িতে কিংবা ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করার অনুমতি আছে। যেমন,

[৭৭] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৩৩, মুসলিম- হাঃ ১৪৮০, আবু দাউদ- হাঃ ১৯৮১।

[৭৮] দেখুনঃ আবু দাউদ- হাঃ ২২৮৬, ২২৮৮, ২২৯০, মুসলিম- হাঃ ৩৭৭৫, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৭৩৪৪, ২৭৩৪৭, মু'জামুল কাবীর- হাঃ ২০৯২৯, ২০৯৩১, ২০৯৩২, জামিউল আহাদীস- হাঃ ২০৯, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৪২৮৯।

عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فالحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت ؟ قالت فقصصت عليه . فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فأتبعه وقضى به

‘যায়নাব বিনতে কা’ব ইবনে উজরা হতে বর্ণিত, তাকে মালিক ইবনু সিনান রাঃ এর মেয়ে এবং আবু সাঈদ আল খুদরী রাঃ এর বোন ফুরাইয়াহ রাঃ জানিয়েছেন, আমার স্বামী তার (পলাতক) গোলামের খোঁজে রওয়ানা হয়ে কদূম নামক স্থানে তাদের ধরে ফেলেন। তারা সেখানে আমার স্বামীকে হত্যা করে। যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, তখন আমি আমার পরিবার পরিজন থেকে অনেক দূরে আনসারদের বসতিতে অবস্থান করছিলাম। আমি রাসুল সাঃ এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এলো তখন আমি আমার পরিজন ও ভাইদের বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করছিলাম। তিনি আমার ভরণ-পোষণের জন্য কোন মাল রেখে যাননি এবং তার এমন কোন মালও নেই আমি যার ওয়ারিস হতে পারি, এমনকি তার মালিকানাভূক্ত কোন ঘরও নেই। আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পরিবার ও ভাইদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি। আর এটা আমার জন্য অধিক নিরাপদ এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধাজনকও। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, তুমি চাইলে তা করতে পারো। উক্ত মহিলা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মুখে আমার জন্য আল্লাহর এই ফায়সালা শুনে খুশি মনে ফিরে যেতে লাগলাম। আমি মসজিদে অথবা তাঁর কোন এক হুজরার নিকটে পৌঁছতেই তিনি আমাকে পূণরায় ডেকে বলেন, তুমি জানি কী বলেছিলে? মহিলা পূণরায় তার বিবরণ রাসুলুল্লাহ সাঃ কে শুনালেন। রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, তুমি ঐ ঘরেই অবস্থান করো, যেখানে তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছো, (আর অপেক্ষা কর) যতক্ষণ না তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়। ফুরাইয়াহ বলেন, এরপর আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করলাম। ফুরাইয়াহ আরও বলেন, যখন

উসমান বিনে আফ্ফান রাঃ এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করে লিখেন, তখন আমি এরূপই জবাব দিলাম। তারপর তিনি তা অনুসরণ করেন এবং সে মতেই ফায়সালা দেন।’[৭৯]

● ইদ্দত পালনকারিনী স্ত্রীর (একেবারে নিরুপায় না হলে) ঘরের বাইরে যাওয়া বৈধ নয়।[৮০] তবে রজয়ী তালাকের ইদ্দত পালনকারিনীকে এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। কারন এখনো তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়নি। আর বিধবা স্ত্রী যাদের স্বামী মারা গেছে তাদের বের হওয়ার বিষয়ে হালকা শিথিলতা রয়েছে। কারন তার জন্য স্বামীর দেখভাল বা খোরপোষ নেই। দিনের বেলায় খুব বেশি জরুরী হলে যেমন অফিস- আদালত, কোর্ট-কাচারী, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজে স্ত্রীর বের হওয়া যেতে পারে। আর রাতের বেলায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন তুফান, প্লাবণ, ভুমিকম্প কিংবা ঘরে আগুন লাগার মত দূর্ঘটনা অথবা অন্য কোন কারনে জানমাল ইজ্জতের ক্ষয়ক্ষতির তীব্র আশংকা না হলে স্ত্রী কোন অবস্থাতেই গৃহত্যাগ করবে না।

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ

‘অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই।’[৮১]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِى مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِى خَيْرًا

‘জাবির রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক প্রদান করা হয়। এরপর তিনি বাগানে খেজুর কর্তনের জন্য গমন করলে জনৈক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি তাকে (ইদ্দতের সময়ে) ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেন। তারপর আমার খালা নবী করীম সাঃ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বলেন, তুমি বের হও এবং খেজুর কর্তন করো। আর তা হতে কিছু সাদকা করবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করবে।’[৮২]

---

[৭৯] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৩১, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৭৩৬৩, তিরমিযী- হাঃ ১২০৪, নাসায়ী- হাঃ ৩৫২৮, আবু দাউদ- হাঃ ২৩০০, মুয়াত্তা মালেক- হাঃ ১২৫৪, দারেমী- হাঃ ২২৮৭, ইরওয়াহ- হাঃ ২১৩১।

[৮০] সুরা তালাক ঃ ১ নং আয়াতের নির্দেশনা মতে।

[৮১] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৪০।

[৮২] আবু দাউদ- হাঃ ২২৯৯, জামেউল আহাদিস- হাঃ ২/৬১।

● এ সময় স্ত্রী হজ্ব বা ওমরাহ জাতীয় কোন প্রকার তীর্থসফরে যাবে না। তবে যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে তার ক্ষেত্রে আয়িশা রাঃ এর ফতোয়া হল সে তীর্থসফরে বের হতে পারবে। কারন তাঁর বোন উম্মে কুলসুম তার স্বামী তলহা বিন আব্দুল্লাহ রাঃ নিহত হলে মক্কায় উমরা করার অনুমতি পেয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস, জাবের বিন যায়দ, হাসান, আতা রহঃ (আজমাঈন) প্রমুখগণের রায়ও এটাই। তবে হযরত ওমর রাঃ নিষেধ করেছেন।[৮৩]

● অবশ্য এ সময়টাতে স্ত্রীর সাজগোজ, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, সুরমা, সুগন্ধি, অলঙ্কার, মেহেদী, ঘন কারুকার্যমণ্ডিত রঙিন কাপড় ইত্যাদি চাকচিক্য বেশ ভূষার ব্যবহার বর্জন করা জরুরী। তবে শরীরের দূর্গন্ধ এড়াতে হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ

'নবী পত্নী উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাঃ ইরশাদ করেছেন, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে যেন ইদ্দতকালীন সময়ে রঙিন এবং কারুকার্যমণ্ডিত কাপড় ও অলংকার পরিধান না করে। আর সে যেন খিযাব ও সুরমা ব্যবহার না করে।'[৮৪]

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

'উম্মে আতিয়া রাঃ হতে বর্ণিত, নবী করীম সাঃ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। আর এ সময় সাদাসিধে কাপড় ছাড়া কোন চাকচিক্যময় রঙিন কাপড় পরিধান করবে না। সুরমা ব্যবহার করবে না এবং কোনরূপ সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে না। তবে হায়য হতে পবিত্র হওয়ার পর হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে।'[৮৫]

[৮৩] ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/৩৩৫।

[৮৪] আবু দাউদ- হাঃ ২৩০৬, বুখারী- হাঃ ৫৩২২, ৫৩২৩, ৫৩২৫, ৫৩২৬, মু'জামুল আওসাত- হাঃ ৭৭৩২, জামেউল আহাদিস- হাঃ ২৪৪৭৯, ৪৩৬২৬, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৪৩০৬, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৬৫৮১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- হাঃ ১২১১৪।

[৮৫] আবু দাউদ- হাঃ ২৩০৪, বুখারী- হাঃ ৫৩৪২, মুসলিম- হাঃ ৯৩৮, দারেমী- হাঃ ২২৮৬, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক- হাঃ ১২১২৯।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঃ

মুসলিম সমাজে এ ধারণাও প্রবল যে, নারী বিচ্ছেদ চাইতে পারে বটে, ঘটাতে পারে না। কোন কোন পণ্ডিতের দাবি, চাইতেও পারে না। এটিও ইহুদীদের কাছ থেকে চুরি করা আরেকটি বর্বর আইন, কু-প্রথা। ইহুদী আইনে নারীদের কোন অধিকারই নেই বিচ্ছেদ ঘটানোর। তবে আদালতে শক্তিশালী কোন কারন দেখাতে পারলেই শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে ইহুদী নারীরা বিচ্ছেদের বিবেচনায় আসতে পারে। কারন হিসেবে যেমন স্বামীর শারীরিক অক্ষমতা, জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়া বা পরিবারের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত না করতে পারা। এ সময় আদালত তার আবেদন গ্রহন করবে, কিন্তু আবেদন আমলে নেয়ার ক্ষেত্রেও নারী কোন প্রকার প্রভাব খাটাতে পারবে না। জাজের দৃষ্টিতে বিচ্ছেদ একান্তই জরুরী মনে হলে তিনি স্বামীকে কিছু শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন যাতে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। শাস্তি হিসেবে যেমন অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড বা গীর্জায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এমতাবস্থায়ও স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানালে স্ত্রী সারাজীবন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। স্ত্রীর পরিচয় হবে- না বিবাহিতা, না তালাকপ্রাপ্তা। এ সময় সন্তান হলে তাও বৈধ গণ্য হবে। স্ত্রী পড়ে থাকবে বিবাহবিহীন অবস্থায়, কারন সে এখনও পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহে বসলে সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে এবং সন্তান হলে তাদের পরবর্তী দশম প্রজন্ম পর্যন্ত সমস্ত সন্তান অবৈধ ঘোষিত হবে। কিন্তু এ অবস্থায় স্বামী অন্য কাউকে বিবাহ করে ঘর সংসার করতে পারবে। এরূপ স্ত্রীকে বলা হবে 'মুকাইয়্যাদাহ' তথা আবদ্ধ (Bounded)। 'বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে দশ থেকে পনের হাজারের মত ইহুদী মহিলা রয়েছে, যারা এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় জীবনাতিপাত করছে। ইসরাইলে আছে এরকম ষোল হাজারেরও অধিক ঝুলন্ত মহিলা। স্বামীরা তালাক দেয়ার নাম করে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে এদের কাছ থেকে।'[৮৬]

[৮৬] The Toronto Star, Apr. 8, 1995.

খৃষ্টান ধর্মেও এর পক্ষে সাফাই রয়েছে। বলা হয়েছে, ‘স্বামী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই স্ত্রী তার কাছে আবদ্ধ থাকে।’[৮৭]

অথচ ইসলাম বলে, নারী আবদ্ধ থাকবে না। নারীরা স্বাধীন। নারীরও রয়েছে অধিকার। একজন পুরুষের যেমন বিশেষ কারন বশতঃ নির্দিষ্ট উপায়ে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার আছে, অনুরূপ একজন নারীরও অধিকার রয়েছে যথা উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর। পবিত্র কুরআনের বাণী,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

‘আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। অবশ্য (দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে) পুরুষের অবস্থান তাদের এক স্তর উপরে।’[৮৮]

(পবিত্র কুরআনে পুরুষকে নারীর চেয়ে এক মাত্রা উপরে অবস্থান দেয়ার ব্যাপারেও সমাজে একদল কুশিক্ষিত কূপমণ্ডুক পরজীবী অপচ্ছায়ার হৈ চৈ লক্ষ্য করা যায়, যারা কুরআনের এই আয়াতটিতেও দারুন বৈষম্যতার গন্ধ খুঁজে আর ইসলামের নামে নানা অপবাদ বলে বেড়ায়। তাদের দাবি হলো, শুধুমাত্র ভরণ-পোষণের কারনে স্বামীকে স্ত্রীর চেয়ে এক মাত্রা উপরে অবস্থান দেয়া সুবিচার নয়, কারন বহু পরিবার আছে যেখানে স্ত্রী তার স্বামীর তুলনায় বেশি উপার্জন করে আর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভারও বহন করে। তাই ইসলাম শুধু পুরুষকে প্রাধান্য দিয়ে নারীর অধিকার কিছুটা হলেও খর্ব করেছে। অথচ ওসব বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের এটা নিয়েও বিদ্রোহ করা উচিৎ ছিল যে, ইসলামে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কেবল পুরুষের উপর ন্যাস্ত করেছে কেন, নারীর উপর কেন নয়? এই প্রশ্ন করা হলে তাদের আর অণুবীক্ষণেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে পুরুষকে নারীর চেয়ে একধাপ উপরে অবস্থান দেওয়ার অর্থ হল পরিবার পরিজনের যাবতীয় দেখভাল, ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তাদান সবকিছুর দায়-দায়িত্ব পুরুষই বহন করবে। সংসারে স্ত্রী-সন্তানের পাশাপাশি পিতা-মাতা ও অবিবাহিত বোনদের দেখাশুনা, ভরণ-পোষণ ও ভাল ঘরে বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি দায়িত্বও পুরুষই বহন করবে। নারী এসব দায় থেকে একেবারে মুক্ত। নারী এসব দায়িত্বভার বহন করার সামর্থ রাখলেও তা হবে তার ঐচ্ছিক ব্যাপার। ইসলাম কোন নারীকে এসব দায়িত্ব গ্রহনে বাধ্য করে না। আর কোন নারী তার মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতা, যোগ্যতার সদ্ব্যবহার ও নৈতিকতার জায়গা থেকে এসব দায়িত্বভার গ্রহন করলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে মহিয়সী, অনন্যা, পুরুস্কার পাবার যোগ্য। সেজন্য পুরুষ কোন কাজকর্ম না করলে সমাজে তাকে নিষ্কর্মা বেকার বলে তিরস্কৃত করা হয় যা নারীদের

[৮৭] করিন্থীয়- ৭/৩৯।
[৮৮] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৮।

বেলায় হয় না। সুতরাং পুরুষের অবস্থান নিয়ে নারীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারন নেই। এ অবস্থান দৃশ্যত শ্রেণী বিভাজনমূলক মনে হলেও মুলত এর দ্বারা পুরুষের পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। এটা কেবল শান্তনা স্বরূপ বলা হয়েছে, যার অন্তরালে রয়েছে নারীর দায়মুক্তি। বিবেককে প্রশ্ন করুন, নারীকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখে ইসলাম নারীর অধিকার খর্ব করেছে নাকি সুনিশ্চিত করেছে? পবিত্র কুরআনের কি অনুপম প্রজ্ঞা! পুরুষকে দিয়েছে শান্তনা আর সুকৌশলে নারীকে দিয়েছে অধিকার। নারীর অধিকার বিষয়ে কুরআন যে বিধান দিয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এমন বিধান দিতে পেরেছে বলে প্রমাণ নেই। উপরোক্ত (২:২২৮) আয়াতটি যার জলন্ত প্রমাণ। এরপরেও যাদের বোধ সংকীর্ণ অথবা বক্রতার কারনে কপটতা পরিহার করতে পারছেন না, তাদের বলবো পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতটি পড়ুন আর একদম বিলম্ব না করে আদর্শ পুরুষবাদী সেজে আন্দোলনে নেমে পড়ুন।

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

‘আর কোন পুত্র সন্তানই কন্যা সন্তানের মত নয়।’[৮৯]

আসল কথা হলো, কুরআন নারী পুরুষ উভয়কেই সমান চোখে দেখে। যেমন, পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বাণী,

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

‘যারা মন্দ কর্ম করে, তারা কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যারা, পুরুষ হোক অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।’[৯০]

হাদিসেও চমৎকার এসেছে,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

‘হাকীম ইবনু মু’আবিয়া আল কুশাইরী রহঃ হতে তার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা আমি বলি হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কারোর উপর কি স্ত্রীদের কোন অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, ‘তুমি যখন আহার করবে তাকেও (সমমানের) আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও (প্রয়োজন মত) পোশাক দিবে। তার

[৮৯] আলে ইমরান ঃ ৩৬
[৯০] সূরা মু’মিন ঃ ৪০।

মুখমন্ডলে মারবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে।' ঘর থেকে বের করে দিবে না।'[৯১]

এরপরেও কি ইসলামে নারী অধিকার নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে? বরং অন্যান্য ধর্মগুলো অতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, ইহুদী ধর্মশাস্ত্রে (তালমুদে) বলা হয়েছে, 'নারীর কোন সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার নেই। তার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদ স্বামীর বলে গণ্য হবে। স্বামীর মালিকানাধীন সম্পদ তো আছেই, সাথে স্ত্রীর সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে আসবে। স্ত্রী যা অর্জন করবে বা রাস্তায় কুড়িয়ে পাবে এবং বাড়ির সমস্ত কিছু এমন কি রুটির টুকরাও স্বামীর অধিকারে চলে যাবে এবং মহিলা কোন লোককে ডেকে আপ্যায়ন করলে তা স্বামীর মাল থেকে চুরি হিসেবে গণ্য হবে।'[৯২] খৃষ্টান ধর্মে বিবাহের পর স্ত্রীর উপর কাজকর্ম করা বাধ্যতামূলক, তবে যা রোজগার করবে সবই স্বামীর মালিকানায় চলে যাবে। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুতকৃত 'নারী অধিকার আইন' এ বলা হয়েছে, স্বামীর মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদের মালিক স্বামী নিজেই; আর স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পদের মালিকও তার স্বামী।[৯৩] পক্ষান্তরে কুরআন বলে 'পুরুষ যা অর্জন করে সেটা পুরুষের অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা নারীর অংশ।'[৯৪] আর হিন্দু ধর্মে তো নারী হলেই স্বামীর মৃত্যুতে পুড়ে মরা ছাড়া উপায় নেই। অথচ স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীকে দেয়া হয়েছে বেকসুর খালাস। সুতরাং জোর গলায় বলতে পারি, এ সমস্ত বিকৃত, বানোয়াট ও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের উপর রচিত ধর্মগুলো নিকটাতীত পর্যন্ত নারীকে যে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল, ইসলাম এসেছে নারীকে সে সকল অধিকার পরিপূর্ণ ফিরিয়ে দিতে।)

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রক্রিয়াটি পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল। সাধারণত জটিল হওয়াটাই সুবিচার। কেননা, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ যতটা যত্নশীল হতে পারে, ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, চিন্তা-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে পারে, নারী সেক্ষেত্রে সামান্য দূর্বল ও প্রচন্ড রকমের আবেগী। নারীরা তাড়াহুড়ায় বেশি মনযোগী হয়। তাছাড়া নারীরা কারনে অকারনে কোন মানুষকে যত সহজে আপন করে নেয় তারচেয়ে বেশি সহজে তুচ্ছ কারনেও শত্রু ভাবতে শুরু করে দেয়। তাই নারীর স্বার্থে, নারী যেন বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে বিরত থাকতে পারে, সেজন্য ইসলামে সরাসরি নারী প্রদত্ত তালাককে পুরুষের তালাকের ন্যায় কার্যকরী তালাক হিসেবে গণ্য করা হয়নি। নারী কেবল বিশেষ পদ্ধতিতে, ক্ষমতাবলে ও কারনে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। দৃশ্যতঃ মনে হতে পারে যে,

---

[৯১] আবু দাউদ- হাঃ ২১৪২, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৮৫০, মিশকাত- হাঃ ৩২২৯, ইরওয়াহ- হাঃ ২০৩।
[৯২] তালমুদ- san 71a. git 62a.
[৯৩] Women in Stuart England and America, Thompson- p 162.
[৯৪] সুরা নিসা ঃ ৩২।

এতে নারীর অধিকার সামান্য হলেও ক্ষুন্ন হয়েছে। মোটেও নয়। বরং কোন কোন অধিকার যেগুলো ইহুদী-খৃষ্টান মতবাদে একচ্ছত্র পুরুষকে দিয়ে রেখেছে সে অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে একচ্ছত্র। যেমন ইহুদী আইনে পুরুষ নিছক পছন্দ-অপছন্দের কারনে যখন খুশি তালাক দিতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামে একজন নারী নিছক পছন্দ-অপছন্দের কারনে বিচ্ছেদ চাইতে পারে। শুধু তাই নয়, একজন নারী নিছক জাতগত তারতম্যের কারনেও স্বেচ্ছাচারিনী হতে পারে। যা পুরুষের অধিকারে নেই। যেমন ইসলামে পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে তোমরা স্ত্রীদের যবরদস্তি উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহন করবে। আর তাদের উপরে জোরজুলুম করো না তোমরা যা দিয়েছ তার অংশ বিশেষ ফিরে পাবার জন্য, যদি না তারা সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। অবশ্য যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তাহলে তোমরা এমন একটা কিছু অপছন্দ করছো, আল্লাহ যার মধ্যে প্রচুর কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।'[৯৫]

আর নারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, অপছন্দ নারীর পক্ষ থেকে হলেও বিজয় নারীর। যেমন রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীসে এসেছে,

عن ابن عباس أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي
ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلعم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة
ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني
قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه

'ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত যে, বারীরার স্বামী ছিল একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস। তাকে মুগীছ নামে ডাকা হত। আমি তাকে এখনো দেখছি সে বারীরার পিছে পিছে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে, আর দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবী সাঃ বললেন, হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চার্যান্বিত হওনা? এরপর নবী সাঃ বললেন, বারীরা! তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে! বারীরা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি

---

[৯৫] সুরা নিসা ঃ ১৯।

বললেন, আমি কেবল সুপারিশ করছি। বারীরা জবাব দিল, তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।'[৯৬]

عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد

'ইবনু আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, সালুলের কন্যা জমিলা রাসুল সাঃ এর নিকট এসে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি সাবিতের দ্বীনদারী ও চরিত্রের ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটির অভিযোগ করছি না। কিন্তু আমি দ্বীন ইসলামে থেকে (স্বামীর অবাধ্য হওয়ার মত) কুফুরী আচরণ অপছন্দ করি। আমি যে তাকে মনের দিক থেকে মোটেও বরদাশত করতে পারছি না। নবী সাঃ বলেন, তুমি কি সাবিতের দেয়া বাগানটি ফেরত দিবে? জমিলা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাঃ সাবিতকে বাগানটি ফেরত নিয়ে জমিলাকে তালাক দিতে নির্দেশ দিলেন এবং অতিরিক্ত কিছু নিতে বারণ করলেন।'[৯৭]

দেখুন! মানবতার মহান দূত রাসুল সাঃ বারীরাকে সুপারিশ করেছেন মাত্র, কিন্তু মনঃপূত না হওয়া সত্ত্বেও বিরহে কাতর মুগীছের ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন নি। এরই নাম নারী অধিকার। সাবিত উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র জমিলার অপছন্দের কারনে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং জমীলার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেন। এরই নাম নারী অধিকার। অপছন্দের দরুন পুরুষ তালাক দিলে তাতে কুরআন লঙ্ঘন হয়, পক্ষান্তরে নারী শুধুমাত্র ইচ্ছার ভিত্তিতে বা নিছক অপছন্দের কারনে (খুলা প্রভৃতির মাধ্যমে) বিচ্ছেদ ঘটালেও সমস্যা নেই। সেটিই নারীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের জন্য বিবেচনাযোগ্য কারন। ইসলাম আর কতকরে বুঝাবে ইসলামে নারীরা অধিকার বঞ্চিত নয়?

ইসলামে পুরুষকে পারিবারিক ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালনের কারনে এবং প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য থাকার কারনে ক্ষেত্রবিশেষে নারীর চেয়ে এক মাত্রা উপরে অবস্থান দেয়া হয়েছে, তাই বলে এটা ভেবে নেয়া অন্যায় যে, নারীকে একেবারে পুরুষের পায়ের তলায় রাখা হয়েছে। আমাদের এই হীন চিন্তা পরিহার করা উচিৎ। সব স্বামীর সংসার স্বর্গ হয় না, তাহলে একজন নারী কেন দিনের পর দিন নির্দয় স্বামীর

[৯৬] বুখারী- হাঃ ৪৯৭৯, ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৭৫, দারাকুতনী- হাঃ ২/১৫৪, দারেমী- হাঃ ২২৯২, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৪২৭৩।

[৯৭] বুখারী- হাঃ ৪৯৭১, ৭২, ৭৩, ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৫৬, মু'জামুল কবীর- হাঃ ১১৯৯৭, দারাকুতনী- হাঃ ৩/২৫৪।

শত অমানুষিক নির্যাতন, অবহেলা, জ্বালা-যন্ত্রণা, লাঞ্চণা-বঞ্চণা, চড়াই-উতরাই সবকিছু মুখবুঝে সহ্য করে যাবে? কেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আজীবন আবদ্ধ হয়ে থাকবে? 'তোমার পছন্দ হোক বা না হোক আমার তো পছন্দ হয়েছে, তোমার ভাল লাগুক বা না লাগুক আমার তো ভাল লাগে, তুমি চাও বা না চাও আমি তো চাই, তাই তোমাকে আমার সাথে ঘর করতেই হবে' এমন প্রভাব খাটানোর অধিকার পুরুষের ক্ষেত্রে 'শতভাগ' হলে নারীর ক্ষেত্রে কেন 'শূণ্য' হবে? স্বামী অপুরুষ, মদ্যপ, মাতাল, পাষণ্ড, দুশ্চরিত্র, লম্পট যাই হোক, স্ত্রীকে সংসারে লেগে থাকতেই হবে, স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মুল্যই নেই, তাহলে একজন নারীকে সংসারী করার ক্ষেত্রে নারীর মুখে কবুল শুনার জন্য এত আয়োজন হয় কেন? কোন কারন ছাড়াই স্বামী যখন ইচ্ছা স্ত্রীকে 'তালাক, তালাক, তালাক' বলে বিদায় করে দিবে, স্ত্রীর মতামতের কোন মূল্যই নেই, অথচ স্ত্রী বিবেচনাযোগ্য কারনবশতঃ বিচ্ছেদের প্রস্তাব করলেও প্রস্তাব স্বামীর মনঃপুত হতে হবে, অন্যথা স্ত্রীর কিছুই করার নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অপুরুষ, অক্ষম, নিষ্ঠুর, দুশ্চরিত্র, লম্পট স্বামীর সাথে সংসারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। কেন? এই আইন আর যাই হোক ইসলামী আইন হতে পারে না। ভাগ্য ভাল যে, বিয়ের আগে কোন নারী এসব আইন সম্মন্ধে তেমন একটা অবগত থাকে না।

অতএব, স্বামীর হাতে কোনরূপ বিবেচনাযোগ্য কারন ছাড়াই তালাক দেওয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকা আর নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বদমায়েশ লম্পট প্রকৃতির স্বামীর ঘরে বেঁধে রাখার যে রীতি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তা অত্যন্ত অন্যায় ও মানবতার পরিপন্থী। এতে করে নারীর স্বাধীনতাকে গলায় পাড়া দিয়ে হত্যা করা হয়।

স্ত্রী মূলত কয়েক উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। তবে লক্ষণীয় যে, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য যেরূপ সালিশের দ্বারস্থ হওয়া জরুরী অনুরূপ স্ত্রীর জন্যও বিচ্ছেদের পূর্বশর্ত একটি স্বচ্ছ নিরপেক্ষ সালিশের শরণাপন্ন হওয়া। আমরা একটু আগে উল্লেখিত হাদীসগুলোতে দেখতে পাই, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাঃ এক্ষেত্রে বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন। স্বামী স্ত্রী যেই হোক, তড়িঘড়ি কারোরই আচমকা তালাক বা বিচ্ছেদের পথে এগুনো উচিৎ নয়। অকারনে বা সামান্য ভুলে একটি সংসার তছনছ হয়ে যাবে, সেই অনুমোদন ইসলাম দেয় না। কারন, একটি সংসারের সাথে বহু জীবন জড়িয়ে থাকে। এজন্য পুরুষের ন্যায় নারীকেও একান্ত অপরিহার্য না হলে অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে মারাত্মক কোন ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে বিরত থাকতে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদিসে অকারনে বিচ্ছেদ কামনাকারিনী নারীকে জাহান্নামী আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

‘সাওবান রাঃ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যদি কোন মহিলা স্বামীর পক্ষ থেকে কোন ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা ছাড়াই অহেতুক বিচ্ছেদ কামনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।’[৯৮]

বরং স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দূরাচরণ বা উপেক্ষা লক্ষ্য করা গেলে সেক্ষেত্রেও ইসলাম প্রথমে আপোস-মীমাংসার কথা বলে। যেমন,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ

الصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

‘যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। আপোষ-মীমাংসাাই উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।’[৯৯]

খুলা’ ঃ

নারী খুলা’র মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ, যদি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মনে যেকোন কারনে অনীহা বা বিরূপ মনোভাব কাজ করে, তখন স্ত্রী চাইলে প্রতিদানের (অর্থ বা সম্পত্তি) বিনিময়ে স্বামীকে বিচ্ছেদ কার্যে রাজী করাতে পারে। এই ধরনের বিচ্ছেদকে খুলা’ বলে। এতে যদি স্বামীর সম্মতি না থাকে সেক্ষেত্রে সাধারণ সালিশ ব্যর্থ হলে স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হবে এবং বিচারকগণ স্ত্রীর দাবি আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বাণী,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘আর তোমাদের জন্য বৈধ নয় নিজেদের দেয়া সম্পদ (মোহরানা) থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া। অতঃপর যদি তোমাদের (উভয়পক্ষের সালিসগণ) ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ

[৯৮] আবু দাউদ- হাঃ ২২২৮, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৬৩৭, ইবনে কাসীর- ১/৬৩৫।
[৯৯] সুরা নিসা ঃ ১২৮।

কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। আর যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে তারাই জালিম।’[১০০]

আবু দাউদ ও লুবাব এর বরাত দিয়ে তাফসীরে যালালাইনের হাশিয়ায় আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেন, প্রাক আরবে মানুষ তার স্ত্রীর মহর হিসেবে যা আদায় করত, পূণরায় তা ছলে বলে আত্মসাৎ করে নিত। আর তখনকার সমাজেও সেটা দূষণীয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। হযরত জুরাইয রহঃ ইবনু জারীরের বরাত দিয়ে বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবিত ইবনে ক্বায়স ও হাবীবা কিংবা জমিলা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবীবা বা জমীলা তার স্বামীর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে অভিযোগ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? হাবীবা বা জমীলা সম্মতি জানালেন। তখন নবী করীম সাঃ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনিয়ে বললেন, বাগানের বিনিময়ে তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। স্বামী (সাবিত) আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্য বৈধ হবে? নবীজী সাঃ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি তাই করলেন। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়।[১০১] ইবনু জারীর রহঃ বলেন, উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে অত্র আয়াতের (২:২২৯) দ্বিতীয়াংশ নাজিল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই হল খুলা’র প্রথম ঘটনা এবং এটাই খুলা’র মুল দলিল।[১০২]

খুলা’র সময় ঃ খুলা’তে তালাকের ন্যায় সহবাসপূর্ব ও স্ত্রীর পরিচ্ছন্না হওয়া শর্ত নয়। ঋতুকালে বা পবিত্রকালে, সহবাস পরবর্তী কিংবা সহবাসপূর্ব সর্বাবস্থায় খুলা’ বৈধ। কারন খুলা’র শর্ত হিসেবে এসব কিছুর নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা কুরআন সুন্নাহ’র কোথাও পাওয়া যায় না।[১০৩]

খুলা’ যখন হারাম ঃ বিবেচনাযোগ্য কোন কারন ছাড়া অযথা খুলা’ প্রার্থনা করা হারাম। যেমন রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বাণী,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

‘সাওবান রাঃ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেছেন, যদি কোন মহিলা স্বামীর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা ছাড়াই অহেতুক

[১০০] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।
[১০১] তাফসীরে যালালাইন- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৪৯৯।
[১০২] তাফসীরে ইবনে কাসীর- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৩৭।
[১০৩] ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/৩০০, ইসলামী ফিকাহ, কৃত- মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আত তুয়াইজিরী- ২/৫২১।

বিচ্ছেদ কামনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।'[১০৪]

খুলা' যখন জায়েজ ঃ ইসলামে নারীদের হাতে পুরুষের ন্যায় তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়নি ঠিক, কিন্তু এটুকু বাড়তি অধিকার দেয়া হয়েছে যে, নারী নিছক পছন্দ-অপছন্দের কারনেও খুলা' করে নিতে পারে। নারীর পক্ষ থেকে বিবেচনাযোগ্য কারন হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট। অর্থাৎ যখন স্ত্রীর মনে কোন কারনে স্বামীর প্রতি অনাস্থা-অনীহা কিংবা অপছন্দ হওয়ার দরুন বিরুপ মনোভাব কাজ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী অর্থ বা মালের বিনিময়ে খুলা' দাবি করতে পারে। তবে বিয়ে এবং খুলা'র কারন স্বাভাবিক হওয়া শর্ত। যার দ্ব্যর্থহীন দলিল,

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, সাবিত বিন ক্বায়সের স্ত্রী নবী করীম সাঃ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি সাবিত বিন ক্বায়সের ব্যাপারে চরিত্র ও দ্বীনদারীর বিষয়ে কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি না। কিন্তু আমি ইসলামে (স্বামীর অবাধ্য হওয়ার মত) কুফুরীকে ভয় করছি। রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে বললেন, তুমি কি তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দেবে? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, (সাবিত!) তুমি বাগানটি গ্রহন কর আর তাকে এক তালাক দিয়ে (খুলা' করে) দাও।'[১০৫]

ইসলাম নারীর সামান্য পছন্দ-অপছন্দকেও অনেক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং এটুকুই খুলা'র জন্য উপসর্গ হিসেবে যথেষ্ট সাব্যস্ত করে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উক্ত মহিলা (হাবীবা বা জমীলা) বলেছিলেন, তিনি (সাবিত) দেখতেও সুন্দর নন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, একদা আমি তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দেখতে পাই, আমার স্বামী কয়েকজন লোকের সাথে আসছেন। এদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা কালো, বেঁটে ও কুৎসিৎ। রাসুলুল্লাহ সাঃ খুলা'র জন্য এটুকুই যথেষ্ট মনে করলেন এবং বাগানের বিনিময়ে সাবিতকে খুলা' করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১০৬]

---

[১০৪] আবু দাউদ- হাঃ ২২২৮, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৬৩৭, ইবনে কাসীর- হাঃ ১/৬৩৫।
[১০৫] বুখারী- হাঃ ৪৯৭১, নাসাঈ- হাঃ ৩৪৬৩, মু'জামুল কাবীর- হাঃ ১১৯৯৭, বায়হাক্বী- হাঃ ১২৬১৫, দারাকুতনী- হাঃ ৩/২৫৪।
[১০৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৬৩৭।

এছাড়াও আরও কতিপয় কারন রয়েছে, ১. স্বামীর চারিত্রিক ত্রুটি (Characteristic problem) যেমন পরকীয়ায় আসক্তি অর্থাৎ খারাপ মহিলার (women of ill reputation) সঙ্গে স্বামীর মেলামেশা কিংবা নৈতিকতা বিবর্জিত জীবন যাপন প্রমাণিত হলে, ২. দ্বীনী ত্রুটি (Religious fault) যেমন, স্ত্রীকে কোন নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে বাধ্য করলে বা স্ত্রীর ধর্মীয় আবশ্যিক রীতি-নীতি পালনে বাধা দান করলে, ৩. স্বভাবগত ত্রুটি (Habitual error) যেমন, স্ত্রীর উপর শারিরিক বা মানসিক নির্যাতন অনবরত করতে থাকলে, ৪. স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে সেক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সবার সাথে সমান ব্যবহার না করলে, ৫. স্বামী পুরুষত্বহীন হলে অথবা এইচ.আই.ভি (পজেটিভ) ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কিংবা অন্য কোন মারাত্মক যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, ৬. স্বামী দুই বছর যাবৎ স্ত্রীর খোরপোষ দিতে ব্যর্থ হলে অথবা কোন যুক্তি সঙ্গত কারন ছাড়াই তিন বছর ধরে স্বামী তার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, ৭. স্ত্রীর সম্পত্তি হস্তান্তর করলে বা স্ত্রীকে তার সম্পত্তিতে আইন সম্মত অধিকার প্রয়োগে বাধা দিলে, ৮. স্বামী সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে, ৯. স্বামী দুই বছর ধরে পাগল থাকলে, ১০. স্বামী চার বছরের অধিক সময় নিরুদ্দেশ থাকলে, এসব ব্যাপারে বর্তমান পরিস্থিতি ও নৈতিকতার বিচারে আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, স্ত্রী যদি মনে করে বিচ্ছেদ তার জন্য মঙ্গলের হবে তাহলে খুলা' করিয়ে নিতে পারে। তবে এই প্রকারের খুলা'য় মালের বিনিময় শর্ত কিনা এ ব্যাপারে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেহেতু খুলা'র কারনে পূণঃগ্রহন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায় না, সেহেতু স্বামী পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে উভয়ের সম্মতিতে বিশেষ করে স্ত্রীর সম্মতি থাকলে তারা বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে পূণরায় ঘর-সংসার আরম্ভ করতে পারে। এ সময় মালের বিনিময় হয়ে থাকলে তা স্ত্রীকে পূনরায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

খুলা'তে মালের বিনিময় ঃ যদি অন্যায় ও ত্রুটি স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়, যেমন স্বামী নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও যেকোন কারনে স্বামীকে স্ত্রীর পছন্দ না হওয়া বা স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের সঞ্চার হওয়া, সেক্ষেত্রে মালের বিনিময় আবশ্যক। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। আর যদি বাড়াবাড়ি স্বামীর পক্ষ থেকে হয় সেক্ষেত্রে মালের বিনিময় আবশ্যক কিনা এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

একদল বিদ্বানের অভিমত এই যে, মালের বিনিময় আবশ্যক। উনারা দলিল হিসেবে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বোনের তার স্বামী কর্তৃক প্রহৃতা হওয়ার হাদিসের এই অংশটি উল্লেখ করে থাকেন, أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها অর্থাৎ, শামাস পুত্র সাবিত বিন ক্বায়স তার স্ত্রীকে প্রহার করলে তার স্ত্রীর (জমিলা) হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই হাদিসে বিনিময় গ্রহনের উল্লেখ রয়েছে।

যেমন, خذ الذي لها عليك অর্থাৎ, তার কাছে তোমার জন্য যা আছে তা গ্রহন করো। অন্য একদল বিদ্বানের অভিমত হল, মালের বিনিময় আবশ্যক নয়। উনারা দলিল হিসেবে এই হাদিসটি গ্রহন করে থাকেন, عن عائشة أن رسول الله قال : لا ضرر ولا ضرار অর্থাৎ 'হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, কারোর কোন ক্ষতি করা চলবে না, নিজেরও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া যাবে না।'[১০৭]

জমহুর উলামা শেষোক্ত মতটি গ্রহন করেছেন। অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি স্বামীর হলে মালের বিনিময় আবশ্যক নয়।

মালের পরিমাণ ঃ স্ত্রী তার মোহরানার সমপরিমাণ বা তার আংশিক কম-বেশি মালের প্রস্তাব করতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এবং স্বামী স্ত্রীর কেউই যেন তার নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। অনেকেই মোহরানা বা স্বামীর প্রদত্ত মালের চেয়ে বেশি নেওয়াকে অবৈধ বলেছেন। তাদের দলিল এই যে, হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ বেশি নিতে বারণ করেছেন। যেমন, يأخذ منها حديقته ولا يزداد অর্থাৎ, (তোমার মোহর স্বরূপ প্রদত্ত) বাগানটি গ্রহন করো এবং এর বেশি নিও না। বিদ্বানগণের অপর একটি দল মোহরানা কিংবা স্বামীর প্রদত্ত মালের চেয়ে অতিরিক্ত নেওয়াকেও বৈধ বলেছেন। তাদের পেশকৃত দলিল হল, সুরা বাক্বারার ২২৯ নং আয়াতের এই অংশটি, فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ অর্থাৎ, সে যা কিছু বিনিময় দেয়।[১০৮]

উল্লেখ্য যে, এসব কিছু প্রস্তাবকারীর ঐচ্ছিক ব্যাপার। অর্থাৎ স্ত্রী কম-বেশি প্রস্তাব করতে পারে, এমনকি স্বামীকে রাজী করানো না গেলে স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্ব-প্রণোদিতভাবে মোহরানা বা মোহরানার সমপরিমাণ অর্থও ফেরত দিতে পারে। তবে স্বামীর জন্য সরাসরি তার প্রদত্ত মোহরানা বা মোহরানার সমপরিমাণ কিংবা আরও বেশি দাবি করা বৈধ নয়। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

'আর তোমাদের জন্য বৈধ নয় নিজেদের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া।'[১০৯]

অর্থাৎ মোহরানা, গহনাপত্র ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি, যেগুলো স্বামী ইতিপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল, সেগুলোর কোন একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর নেই। এমনিতে কাউকে কোন কিছু দান বা উপহার হিসেবে দেওয়ার পর তা আবার দাবি করা ইসলামী

[১০৭] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২৩৩১, মু'জামুল আওসাত- হাঃ ২৬৮, দারাকুতনী- হাঃ ৪/২২৭, মুয়াত্তা- হাঃ ২৭৫৮। ইমাম তাবরানী হাদিসটি ইবনে আব্বাস রাঃ এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।
[১০৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৬৩৮।
[১০৯] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।

নৈতিকতার সম্পুর্ণ পরিপন্থী। হাদিসে এই ঘৃণ্য কাজকে এমন কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে।

খুলা'র ইদ্দত ঃ খুলা'র মাধ্যমে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল নিয়েও বিদ্বানগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহঃ (আজমাঈন) এর অভিমত হলো, যেহেতু খুলা' তালাক, সেহেতু খুলা'র ইদ্দত হলো তালাকের ইদ্দত। ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন, অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী রহঃ ও ইমাম আহমদ রহঃ এর এ বিষয়ে দ্বিবিধ উক্তি পাওয়া যায়। তবে চার খলিফার যুগের ফতোয়া হলো খুলা'র ইদ্দত এক ঋতুকাল। এ থেকে বুঝা যায়, খুলা' তালাক নয়, বরং ফিসখে নিকাহ বা বিবাহ মুক্তি। হযরত উসমান রাঃ এর ফতোয়াও এই ছিল যে, খুলা' তালাকপ্রাপ্তা নারী সহবাসকৃতা হলে এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে। তবে সহবাসহীনার খুলা'য় ইদ্দত নেই। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই'র ভগ্নী জমিলা বা হাবীবা তার স্বামীর বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিকট অভিযোগ করলে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন,

فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها

'অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার জন্য যা আছে তা গ্রহন করো আর তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত বললেন, তাই হবে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ উক্ত মহিলাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি এক হায়িয পর্যন্ত ইদ্দত পূর্ণ কর তারপর নিজ পরিবারে ফিরে যাও।'[১১০]

এখানে فتلحق بأهلها 'তারপর নিজ পরিবারে ফিরে যাও' বাক্যটি এ কথাটির নির্দেশ করে যে, খুলা'র ক্ষেত্রেও স্ত্রী স্বামীগৃহেই ইদ্দত পালন করবে। আল্লাহর ইচ্ছা হয়ত এটাই যে, নারী তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আবার দাম্পত্য যাত্রা সচল রাখুক।

খুলা' তালাক নাকি ফিসখে নিকাহ ঃ খুলা' তালাক নাকি ফিসখে নিকাহ (বিবাহ বিচ্ছেদ) এ নিয়েও রয়েছে বিস্তর মতবিরোধ। ইমাম আবু হানিফা রহঃ, মালেক রহঃ ও শাফেয়ীর রহঃ অভিমত হল খুলা' এক ধরনের তালাক। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আহমদ রহঃ ও শাফেয়ী রহঃ বলেছেন, খুলা' কোন তালাক নয়, বরং ফিসখে নিকাহ।[১১১] যারা খুলা'কে তালাক বলে থাকেন, তারা নিম্নোক্ত হাদিসে উদ্ধৃত يطلقها অর্থাৎ 'মহিলাটিকে তালাক দাও' বাক্যাংশটি নির্দেশ করে থাকেন। যেমন, আব্দুল্লাহ

[১১০] নাসাঈ- হাঃ ৫৬৯১, দারেমী- হাঃ ২২৭১।
[১১১] তাফসীরে মাযহারী- ১/৫৩৫।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ভগ্নী থেকেও উক্ত (খুলা' সম্পর্কিত) হাদিসটি বর্ণিত আছে। তাতে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها

'তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। পরে সে বাগানটি ফেরত দিল এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে এক তালাক দেওয়ার জন্য তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন।'[১১২]

আর যাদের দাবি খূলা' তালাক নয়, বরং বিচ্ছেদ তাদের দলিল হল নিম্নোদ্ধৃত হাদিসের وخل سبيلها অর্থাৎ 'মহিলাটিকে ছেড়ে দাও' বাক্যাংশটি। এখানে রাসুলুল্লাহ সাঃ সাবিত বিন ক্বায়সের উদ্দেশ্যে বলেন,

فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم

'অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার জন্য যা আছে গ্রহন করো এবং তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত বললেন, ঠিক আছে।'[১১৩]

তবে অধিক নির্ভরযোগ্য মত হল খুলা' তালাক নয় (তালাক হলেও তা পুরুষের তালাকের ন্যায় নয়), বরং ফিসখে নিকাহ বা বিবাহ মুক্তি। হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম যাওজী রহঃ বলেন, খুলা' যে পুরুষের তালাকের ন্যায় তালাক নয় তার প্রমাণ হলো পুরুষের তালাকের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ যে তিনটি বিধানের কথা বলেছেন, তার সবকটি বিধান খুলা'র ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। বিধান তিনটি হলঃ

- তালাকে রজয়ীর পর স্বামী ইচ্ছে করলে তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু খুলা'র ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তা পারবে না।
- তালাকের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে অর্থাৎ স্বামী পন্থা মোতাবেক তিন তালাক দিয়ে দিলে স্ত্রী অন্যত্র স্থায়ী বিবাহিতা হয়ে মিলিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে স্বামী পরিত্যক্তা হওয়া ছাড়া পূর্ব স্বামীর জন্য বৈধ নয়। কিন্তু খুলা'র ক্ষেত্রে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহিতা হওয়া ছাড়াই বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে।
- খুলা'র ইদ্দত হল এক ঋতু, পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে সহবাসকৃতা স্বাভাবিক নারীর ইদ্দত তিন কুরু'।[১১৪]

এছাড়াও,

[১১২] বুখারী- হাঃ ৪৯৭২, মুসনাদে ইবনে আব্বাস- হাঃ ২৯/২৮।
[১১৩] নাসাঈ- হাঃ ৫৬৯১, দারেমী- হাঃ ২২৭১।
[১১৪] নায়লুল আওতার- ৭/২৩।

- ঋতুকালে বা পবিত্র অবস্থায়, সহবাস পরবর্তী বা সহবাহপূর্ব সকল অবস্থায় খুলা' বৈধ।[১১৫] পক্ষান্তরে তালাক পবিত্র অবস্থায় সহবাসপূর্ব হওয়া জরুরী।
- তালাকে কোন কিছুর বিনিময় শর্ত নয়, কিন্তু খুলা' যদি স্ত্রীর নিছক ভাল লাগা না লাগার কারনে হয় তাহলে বিনিময় শর্ত।
- ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পন্থা মোতাবেক দুই তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ স্ত্রী খুলা' করিয়ে নেয়, সেক্ষেত্রে স্বামী ইচ্ছে করলে ঐ স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ ছাড়াই পূণরায় বিয়ে করে নিতে পারে। হযরত ইকরামাও রাঃ বলেন যে, এটি তালাক নয়।[১১৬] যদি খুলা' তালাক হত তাহলে এই পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেত।
- কুরআনে দু'টি তালাকের কথা উল্লেখ করার পর তৃতীয় তালাকের পূর্বে মালের বিনিময়ে বিবাহ মুক্তি বা খুলা'র কথা এসেছে। এতে বুঝা যায় যে, খুলা' তালাক নয়, বরং বিচ্ছেদ মাত্র। যদি খুলা' তালাকই হত তাহলে শেষোক্ত তালাকটি চতুর্থ তালাক হিসেবে গণ্য হতো। অথচ এ ব্যাপারে কোন প্রকার মতপার্থক্য নেই যে, সেটি তৃতীয় তালাক, চতুর্থ তালাক নয়।[১১৭]
- রাসুলুল্লাহ সাঃ ছাবিত বিন ক্বায়সের স্ত্রীকে খুলা' করিয়ে নেওয়ার পর তাকে খুলা'র ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। জামেউত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, রাবী' বিনতে মুআওয়ায রাঃ কে রাসুলুল্লাহ সাঃ খুলা'র পর এক ঋতুই ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১৮] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, খুলা তালাক নয়। কারন যদি খুলা' তালাক হতো, তাহলে নবী করীম সাঃ উক্ত মহিলাকে তিন তুহর পর্যন্ত ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিতেন।
- খুলা' তালাক না হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন, হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান, হযরত ইবনে ওমর, তাউস, ইকরামা, আহমদ, ইসহাক বিন রাহুইয়্যাহ, আবু সাউর ও দাউদ বিন যাহিরী রহঃ (আজমাঈন) প্রমুখগণ।
- যারা খুলা'কে তালাক বলেন তাদের একটি দলিল হল- উম্মে বাকর আসলামিয়া নাম্নী এক স্ত্রীলোক তার স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ বিন খালিদ রাঃ হতে খুলা' গ্রহন করেন এবং হযরত উসমান রাঃ ওটাকে এক তালাক হওয়ার ফতোয়া দেন। সাথে এটাও বলে দেন যে, সে মুহূর্তে যদি কোন কিছুর নাম নিয়ে থাকে তাহলে যা নাম নিয়েছে তাই হবে। ইবনে কাসীর উক্ত বর্ণনাটিকে দূর্বল বলেছেন।[১১৯]

[১১৫] ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/৩০০, ইসলামী ফিকাহ, কৃত- মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আত তুয়াইজিরী- ২/৫২১।
[১১৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৬৩৯।
[১১৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৬৩৯।
[১১৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৬৪১।
[১১৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৬৪০।

(একটি সতর্কতাঃ সম্প্রতি ইরান, ইন্দোনেশিয়া, নেদারল্যান্ড সহ বেশ কয়েকটি দেশে মুসলিমদের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের সীমার মধ্যে থেকেই 'শরীয়াভিত্তিক পতিতালয় (Islamic Brothels)' চালু হওয়ার খবর বিভিন্ন গনমাধ্যম সংস্থা জোরে-সোরে প্রচার করেছে। জানা যায়, ওসব পতিতালয়ের ব্যভিচারবৃত্তিকে দুটি উপায়ে শরীয়ত সম্মত বলে দাবি করা হয়। (এক) নিকাহে মুতা'র (প্রমোদ বিয়ে)[১২০] মাধ্যমে, যা ইমামিয়্যাহদের মাঝে এখন অবধি ধর্মীয় রীতি হিসেবে প্রচলিত আছে। (দুই) খুলা'র মাধ্যমে, অর্থাৎ অ-ইমামিয়্যাহ খদ্দের যারা নিকাহে মুতা'কে হারাম মনে করে, তাদের জন্য এটিকে এভাবে বৈধ করা হয়েছে যে, চুক্তির শুরুতে বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের কাছ থেকে মহর হিসেবে পতিতারা যে অর্থ আদায় করে, চুক্তি শেষে তার কিছু অর্থ ফেরত দিয়ে খুলা' করিয়ে নেয়। 'হট ক্রিসেন্ট' নামক এমন একটি বেশ্যালয়ের মালিক জনাথন সুইক জানান, এই প্রকারের যৌনবৃত্তি হালাল হওয়ার পোষকতায় আমাদের হাতে ফতোয়া রয়েছে। এখানে যারা যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে তারা প্রত্যেকেই মুসলিম এবং ফতোয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী তারা কোন মাদক সেবন করে না, সেই সাথে তারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়ে। কি হাস্যকর! ইসলামে এসবের কোনটিরই অনুমোদন নেই। নিকাহে মুতা' তথা প্রমোদ বিয়ে তো রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র ওফাতের বহু আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে আর খুলা'র মাধ্যমে পতিতাবৃত্তি এই কারনে বৈধ নয় যে, একেতো এ বিয়ে শরয়ী বিয়ের উদ্দেশ্য পরিপন্থী, পাশাপাশি এসব নাটকীয় বিয়েতে ইদ্দতের কোন নাম গন্ধও নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।)

তাফবীজ ঃ

স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটানোর দ্বিতীয় অধিকারটি হল তাফবীজ তথা স্বামী প্রদত্ত ক্ষমতাবল। অর্থাৎ, যদি স্বামী যেকোন সময় যেকোন শর্তসাপেক্ষে বা একেবারে শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে এ ব্যাপারে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দিয়ে রাখে যে স্ত্রী চাইলেই বিচ্ছেদ ঘোষণা করতে পারবে, সেক্ষেত্রে স্ত্রী শর্ত থাকলে শর্ত পূরনের মাধ্যমে এবং নিঃশর্ত হলে কোনপ্রকার বিনিময় ছাড়াই সালিশ ডেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। যেমন,

أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغاً عاقلاً، ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للضرورة

'স্বামী যদি জ্ঞান সম্পন্ন সাবালেক হয় তবে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। এছাড়া স্ত্রীও অধিকার রাখে যখন স্বামী স্ত্রীকেও তালাক দেওয়ার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা দিয়ে রাখে।

[১২০] নিকাহে মুতা' হল একটি অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক বিয়ে। ইসলামের শুরুর দিকে এ বিয়ের কিছুটা রেওয়াজ থাকলেও খয়বরের যুদ্ধের দিন মতান্তরে মক্কা বিজয়ের দিন এ বিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ অনুসারে চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আর জরুরী অবস্থায় (মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা থাকলে বা স্ত্রীর বৈধ খুলা' আবেদনে স্বামী অসম্মতি জ্ঞাপন করলে) কাযীও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।'[১২১]

তবে স্ত্রীর উচিৎ হবে, স্বামী প্রদত্ত ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার না করা এবং একে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমুল্য উপহার মনে করে এর প্রতি যথাযথ সম্মান করা। নবীপত্নীগণ তাই করেছিলেন। যেমন,

عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا

'আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ আমাদের এক সময় (বিচ্ছেদের) ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। তখন আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে গ্রহন করি। এতে আমাদের প্রতি (তালাক জাতীয়) কিছুই সাব্যস্থ হয় নি।'[১২২]

আজকাল আমাদের সমাজে দেখা যায়, কাযী সাহেব বিয়ে পড়ানোর সময় বলে থাকেন, অমুকের ছেলে অমুক, অমুকের মেয়ে অমুককে এত এত দেনমোহর ধার্য্য করে তাফওয়ীযের অধিকার সহ উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে নিকাহের প্রস্তাব দিচ্ছে, অমুকের মেয়ে অমুক কি রাজি আছেন বা বলা হয় 'বলুন মা কবুল'। তাফওয়ীয কি তা বর কনে উভয়কে ভালভাবে অবহিত না করে এরূপ বলা একদম অনুচিৎ।

উল্লেখ্য, তালাক, খুলা' বা তাফবীজ (এখতিয়ার) যাই হোক, তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়া জরুরী। অর্থাৎ বিবাহ হতে হবে পারস্পরিক পছন্দের, স্থায়ী, বংশধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, স্বাভাবিক ও বিধিসম্মত।

একটি প্রশ্নঃ নারী কি তালাক দিতে পারে?
উত্তরঃ না। নারীরা অন্য উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। যা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। পবিত্র কুরআনে তালাক সম্বলিত যত আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই পুরুষকে সম্বোধন করে হয়েছে। এছাড়াও, এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে মরফূ সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে যা কুরআনী আজ্ঞার অনুকূল হওয়ায় অপরিহার্য। যেমন,

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

'মহিলার সাথে যে সহবাসের অধিকার রাখে তার পক্ষ থেকে তালাক প্রযোজ্য।'[১২৩]
অর্থাৎ অধিকার উভয়ের সমান। শুধু প্রক্রিয়াটা ভিন্ন।

[১২১] আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু- ৯/৩৪৫।
[১২২] বুখারী- হাঃ ৪৯৬২, মুসলিম- হাঃ ৩৭৬০, আবু দাউদ- হাঃ ২২০৫, ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৫২, তিরমিযী- হাঃ ১১৭৯, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৪২৬৭, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৪১৮১।
[১২৩] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৮১, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৯৫৬, দারাকুতনী- হাঃ ১০২।

তালাক সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় ঃ

পাগল ও নাবালেগ, এই দুই প্রকারের ব্যক্তির তালাকের ব্যাপারে আমাদের সমাজে তেমন একটা বাড়াবাড়ি নেই। বলবৎ না হওয়াতেই সবাই একমত। সাময়িক স্মৃতিভ্রষ্ট, বেহুঁশ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাকের ব্যাপারে আমাদের দেশের মাওলানাদের অবস্থা অনেকটা দোদুল্যমান। নির্বোধ ও মাতালের তালাক বলবৎ হয় বলে মাওলানারা কিছুটা অ-স্বনির্ভরতার সহিত ফতোয়া দিয়ে থাকেন। আর ভুল বশতঃ তালাক, যবরদস্তির তালাক ইত্যাদি বলবৎ হওয়ার ব্যাপারে উনারা কিছুটা আত্মনির্ভরই বলা যায়। তবে ঠাট্টা-কৌতুক ও রাগের মাথায় প্রদত্ত তালাক বলবৎ হয়, এ ব্যাপারে মাওলানারা কোন প্রকার সংশয়বোধ করেন না। আবার উল্লেখিত সবকটি বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন মৌলানার কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে, ফতোয়া হাতে পেয়ে দূর্ভাগা ভুক্তভোগীর ভোগান্তির শেষ থাকে না। একেক বিষয়ে একেক মাওলানার একেক ফতোয়া। সবাই নিজের ফতোয়া সঠিক হওয়ার দাবি করেন। মাঝখানে ভুক্তভোগীদের পড়তে হয় নানা বিড়ম্বনা আর গোলকধাঁধায়। যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ যুগের পর যুগ পার করেও একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপণীত হতে পারেন নি, সে বিষয়ে একজন সাধারণ অনুকারী মুসলিমের দায়বদ্ধতা কতটুকু সেটাই প্রশ্ন। বছর কয়েক আগে ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাকের একটি ঘটনায় সারা ভারত জুড়ে হৈহট্টগোল লেগে গিয়েছিল। কারন এক স্বামী ঘুমের ঘোরে তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক বলে ফেলেছিল। পরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় মাওলানারা তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশেও এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে। কোন নারী প্রথম স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে কয়েক বছর ঘর-সংসার করার পর হঠাৎ স্থানীয় মোড়ল-মাওলানারা মিলে আবার ঘোষণা দিলেন যে, কোন কারনে আগের তালাক বৈধ নয়। ফলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে এতদিন যে দৈহিক সংসর্গ হয়েছে তা বিয়ে বৈধ না হওয়ার কারনে ব্যভিচার হয়েছে। এরকম আরও বহু ঘটনার প্রমাণ রয়েছে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র' এর 'ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫' বইতে। তাই তো জাতীয় কবি (কাজী নজরুল ইসলাম) বলেন,

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি ফেকাহ হাদীস চষে।"

পাগল, নাবালেগ, স্মৃতিভ্রষ্ট, বেহুঁশ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির ব্যক্তির তালাক ঃ

পাগল, নাবালেগ, স্মৃতিভ্রষ্ট, বেহুঁশ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক বলবৎ হয় না। যেমন,

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ

'হযরত আয়িশা রাঃ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়। নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। রাবী আবু বকর রহঃ এর বর্ণনায় এসেছে, বেহুঁশ ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়।'[১২৪]

নেশাগ্রস্থের তালাক ঃ

নেশাগ্রস্থের তালাকও পতিত হয় না, যদি না সে বুঝতে পারে সে কি সব বলছে। আল্লামা শওকানী রহঃ স্বীয় তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এর ফতওয়া উদ্ধৃত করেছেন,

إن طلاق السكران لا يقع لانه إذا لم يعلم ما يقوله انتفى القصد

'নেশাগ্রস্থের তালাক পতিত হয়না। কেননা, সে যখন বুঝতে পারে না সে কি বলছে তখন তার ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হয়।'[১২৫]

উসমান বিন আফ্‌ফান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, যাবির, যায়েদ, ত্বাউস, আত্বা, কাসেম, রবিয়্যাহ, লায়ছ বিন সা'আদ, ইসহাক, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহঃ (আজমাঈন) প্রমুখগণ এই মত পোষণ করতেন।

ইমাম তাহাবী রহঃ বলেন,

أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز والسكران معتوه كالموسوس

'বিদ্বানগণ এ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, বিকৃত মস্তিষ্কের ব্যক্তির তালাক বৈধ নয় এবং নেশাগ্রস্থরাও মস্তিষ্কবিকৃত নির্বোধের ন্যায়।'[১২৬]

---

[১২৪] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৪১, ২০৪২।
[১২৫] ফাতহুল ক্বাদীর- ১/৭০৫ পৃঃ।
[১২৬] ফাতহুল ক্বাদীর- ১/৭০৫পৃঃ।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহঃ স্বীয় গ্রন্থে সুনানে বায়হাক্বীর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,

عن عثمان بن عفان قال : طلاق السكران لا يجوز

'হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নেশাগ্রস্থের তালাক অসিদ্ধ।'[১২৭]

সুনানে বায়হাক্বীতেও এসেছে,

أن عثمان رضي الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق

'হযরত উসমান রাঃ বলেন, পাগল এবং মাতালের কোন তালাক নেই।'[১২৮]

ইমাম বুখারী রহঃও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[১২৯]

কোন কোন বিদ্বান তালাক পতিত হওয়ার উপর মত দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হল, যেহেতু নেশাগ্রস্থ কোন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হত্যাকান্ড হত্যাই ধর্তব্য হয়, কাজেই নেশাগ্রস্থের তালাকও অবশ্যই ধর্তব্য হবে। এ যুক্তি খুবই দূর্বল। কেননা, হত্যাকান্ড আর তালাক এক নয়। হত্যাকান্ডের উপর অনুমান করে যদি তালাক ধর্তব্য হয়, তাহলে নাবালেগের তালাকও ধর্তব্য হওয়ার কথা। কেননা, হত্যাকান্ড নাবালেগ দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে। আবার একই অনুমানের উপর নেশাগ্রস্থের তালাক ধর্তব্য হলে সালাতও ধর্তব্য হওয়ার কথা। যা অসম্ভব। কেননা কুরআন বলছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাতের ধারে কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না বুঝতে পার তোমরা কি সব বলছো।'[১৩০]

চূড়ান্ত কথা এই যে, নেশাগ্রস্থের তালাক পতিত হবে কি হবে না তা নির্ভর করবে حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 'যতক্ষণ না বুঝতে পার তোমরা কি সব বলছো' এই কথার উপর।

ভুলবশতঃ ও যবরদস্তির তালাক ঃ

ভুলবশতঃ বা যবরদস্তির তালাক কার্যকর হয় না। যেমন,

[১২৭] জামেউল আহাদীস- হাঃ ৩১৯৩৫, কানযুল উম্মাল- হাঃ ২৭৮৮৯।
[১২৮] সুনানে বায়হাক্বী কুবরা- হাঃ ১৪৮৯০।
[১২৯] বুখারী- ৫/২০১৭ পৃঃ।
[১৩০] সুরা নিসা- ৪৩।

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাঃ বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।'[১৩১]

সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামগণও যবরদস্তির তালাককে তালাক হিসেবে গণ্য করতেন না।[১৩২] জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় সম্বন্ধে বহু হাদীস রয়েছে। এছাড়াও, যদি জোরপূর্বক কোন কাজ বৈধ হতো তাহলে لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দ্বীনের মধ্যে যবরদস্তি নেই'[১৩৩] কথাটি মহান আল্লাহ বলতেন না। রাসুলুল্লাহ সাঃও যে কোন উপায়ে স্বীয় চাচা আবু তালেবকে কালিমা পড়িয়ে ছাড়তেন। হযরত নুহ আঃও স্বীয় পুত্র 'কিনআন'কে যেভাবেই হোক সঙ্গে নিতেন। জোরপূর্বক মালিকের মাল ছিনিয়ে নেয়া যায়, মালিকানা ছিনিয়ে নেয়া যায় না।

সংশয় ও নিরসন ঃ

সংশয় ১ ঃ তালাক ভুলবশতঃ হোক বা জোর-যবরদস্তির হোক পতিত হয়। কারন হাদিসে এসেছে, তিনটি কাজ (বিয়ে, তালাক ও রাজআত) এমন যা হাসি বা ঠাট্টাচ্ছলে হলেও বাস্তবিক বলে ধর্তব্য। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

'আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও বাস্তবিকই ধর্তব্য। তা হল বিবাহ, তালাক ও রাজআত।'[১৩৪]

নিরসন ঃ (১) উক্ত হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক সম্পর্কে হাদীসবেত্তাগণ সমালোচনা করেছেন। ইবনে হিব্বান সহ কতেক বিদ্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও অধিকাংশ বিদ্বান তার হাদীস গ্রহন করেন নি। যেমন আহমদ বিন

[১৩১] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৪৩, ২০৪৪, ২০৪৫, ২০৪৬, আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৩, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৫৮২৮।
[১৩২] যাদুল মাআদ- ৫/১৮৯পৃঃ।
[১৩৩] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৫৬।
[১৩৪] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৪, তিরমিযী- হাঃ ১১৮৪, ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৩৯, মিশকাত- হাঃ ৩২৮৪।

শুয়াইব আন নাসাঈ তার সম্বন্ধে বলেন, তিনি মুনকার[১৩৫] অর্থাৎ কুফুরী নয় এমন কোন কওলী বা আমলী ফিসকের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। হাফেজ ইবনু হাজর আল আসক্বালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন এবং তা বর্ণনা করতেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দূর্বলতা রয়েছে।[১৩৬] তিনি তার হাদীস পরিহারযোগ্য বলেছেন।[১৩৭] তিনি আরও বলেন, ইবনে আরদাকের অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়নি।[১৩৮] কাজেই এই হাদীসের উপর অপরিহার্য নির্ভরশীল হওয়া অনুচিৎ।

(২) ইসলামে চৌদ্দ প্রকারের নারী পুরুষের মাঝে বিবাহ বন্ধন বৈধ নয় বলা হয়েছে (৪:২৩)। এদের মুহার্‌রাম বা মুহার্‌রমাহ বলা হয়। প্রশ্ন হল, যদি ভুল বশতঃ এই প্রকারের নারী পুরুষদের মাঝে কোন কারনে বিয়ে সংঘটিত হয়ে যায় অথবা কেউ পেশীর জোরে হোক কিংবা মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে যদি কোন মাহরাম নারী পুরুষকে এরূপ বিয়েতে বাধ্য করে, তাহলে সে বিয়ে বৈধ হবে কি না? সহিহ বুখারীতে এর জবাব এসেছে,

وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما

‘হাসান রহঃ বলেছেন, যখন কেউ অজান্তে কোন মুহার্‌রাম (যাদের সাথে বিয়েতে বসা বৈধ নয়) মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে, তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।’[১৩৯]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহঃ বলেন, ‘এ বিয়ে বাতিল। আর বাতিল হওয়ার মুল কারন হল মহান আল্লাহ যাদের সাথে আক্বদ হারাম করেছেন এ বিয়েতে তাদের সাথেই আক্বদ হয়।’[১৪০]

আপত্তিকারীগণ এবার কি বলবেন? আসল কথা হলো, হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক আর যবরদস্তি কিংবা ভুল এক নয়। ঠাট্টা, তামাশা, বাস্তব এসবকিছু নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরেই হয়। এজন্য ঠাট্টা-তামাশার তালাক ধর্তব্য। পক্ষান্তরে, ভুল বা যবরদস্তি নিজের ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধেই হয়। যেহেতু ইসলামে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে মুসলিম উম্মাহ মুক্ত, সেহেতু ভুল বা যবরদস্তির তালাক ধর্তব্য নয়। এছাড়াও, ভুলবশতঃ বা যবরদস্তির তালাক কার্যকর হয় না মর্মে মরফূ সূত্রে সহিহ হাদিস মজুদ আছে। পাশাপাশি এতে মানবিক মূল্যবোধও চরমভাবে ভুলুণ্ঠিত হয়।

[১৩৫] তালখীস- ৩/৪৪৯, রাবী নং ১৫৯৭, মা’আনীল আখইয়ার- ৩/২১০, মিযানুল ই’তিদাল- ৪/২৭০, তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব- রাবী নং ২৮২৬, তাহযীবুল কামাল- রাবী নং ৩৭৯২, পৃঃ ১৭/৫২।
[১৩৬] তাহযীবুল কামাল- রাবী নং ৩৭৯২, পৃঃ ১৭/৫২।
[১৩৭] আল মুগনী ফী যুআফা- ২/৩৭৮, রাবী নং ৩৫৪৮, আর রদ্দ- ১/৪১।
[১৩৮] আর রদ্দ (যাহাবী) - ১/৪১।
[১৩৯] বুখারী- ৭/৫১৮ পৃঃ,।
[১৪০] জামেউল আহাদিস- ১৩৮ পৃঃ।

ঠাট্টা কৌতুক সবক্ষেত্রে বাস্তব না হলেও বিয়ে, তালাক ও রাজআতের ক্ষেত্রে বাস্তবিক আখ্যা দেয়ার পেছনেও রয়েছে ইসলামের সুচারু দূরদর্শিতা ও নিগুঢ় হেকমত। কারন বিয়ে, তালাক, রাজআত ইত্যাদি কার্যগুলোর সাথে নারীর ইজ্জতের প্রশ্ন জড়িত। কেউ যাতে পন্থা মোতাবেক বিয়ে, তালাক, রাজআত ইত্যাদি সম্পন্ন করার পরও বিশেষ কোন স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে এ কথা বলে পার পেয়ে না যেতে পারে যে, আমি তো অমনি ঠাট্টা করেছি। এভাবে নারীর সম্মান যাতে কোন কাপুরুষ দ্বারা প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়, এজন্য ইসলাম এরূপ কড়া নির্দেশনা আরোপ করেছে। মোটকথা, এসব ব্যাপারে রসিকতা করাও অন্যায়, কারন এতে নারীর মান-সম্মানে আঘাত লাগে। সুতরাং এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নারীর সম্মান রক্ষার্থে ইসলামের ভূমিকা একেবারেই শূন্য সহনীয়।

আমাদের এটাও বুঝতে হবে, নারীর ইজ্জত-আব্রু ও অধিকার সমুন্নত রাখতেই এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অ-পুরুষ, ধর্মদস্যু, ফতোয়া ব্যবসায়ীরা এক্ষেত্রে নারীর অধিকারের কথা মোটেও চিন্তা করে না। স্বামী তার নিজের ভুলের কারনে বা অন্যের জোরাজোরিতে অনোন্যপায় হয়ে তালাক বলে ফেললে আর সেই তালাক কার্যকরী গন্য করা হলে এক্ষেত্রে যদি নারীর ইজ্জত-আব্রু, অধিকার ও জৈবিক নিশ্চয়তা সুরক্ষিত থাকত তাহলে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেখা যায়, নারীর জীবনটাই পাছে বিপন্ন হতে চলেছে। নারীরা এত ঠুনকো জীবন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে কেন? রঈসুল মুফাচ্ছিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ সুরা বাক্বারাহর ২২৯ নং আয়াতে উদ্ধৃত أو تسريح باحسان অংশটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

عن ابن عباس قوله : أو تسريح باحسان قال ان يسرحها باحسان ، فلا يظلمها من حقها شيئا

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ أو تسريح باحسان এর ব্যাপারে বলেন, তা হলো স্ত্রীকে সদ্ভাবে বিদায় করা। স্ত্রীর অধিকারের প্রশ্নে কোন কিছুতেই তার উপর জুলুম করা যাবে না।’[১৪১]

রাগের মাথায় তালাক ঃ

রাগের মাথায় তালাক অসিদ্ধ। তালাক হতে হবে ঠান্ডা মাথায়, সুস্থ মস্তিষ্কে, ধির-স্থিরভাবে ও নিয়ম মেনে। যেমন,

[১৪১] তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম- ২/৪১৯।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِى كَانَ يَسْكُنُ إِيلْيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِى إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِى غَلاَقٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلاَقُ أَظُنُّهُ فِى الْغَضَبِ

'ইলিয়ার অধিবাসী মুহাম্মদ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু সালিহ রাঃ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আদি ইবনু আদি আল কিনদির সাথে সিরিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কায় গেলাম। তিনি আমাকে সাফিয়্যাহ বিনতে শায়বার কাছে পাঠালেন। কেননা সাফিয়্যাহ আয়িশা রাঃ থেকে হাদিস সংরক্ষণ করছিলেন। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রাঃ কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ রাগের অবস্থায় কোন তালাক হয় না এবং দাসত্বমুক্ত করা যায়না। ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন, আমার মতে 'আল গিলাক্ব' অর্থ ক্রোধান্ধ অবস্থায় তালাক প্রদান করা।'[১৪২]

হাদীসের বিরুদ্ধে যুক্তি ও অপনোদন ঃ

রাগের মাথায় প্রদত্ত তালাককে কার্যকরী তালাক প্রমাণ করার জন্যও সমাজের কিছু ধর্মদস্যু নানা অবান্তর যুক্তির অবতারনা করে থাকেন। এছাড়াও, প্রায় বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করাকে বন্দুক বা কামানের গুলাগুলির সাথেও তুলনা করতে শুনা যায়। হতে পারে, উনারা যুক্তি দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদিসকে মুছে দিতে চান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব আজেবাজে ধরনের শয়তানি কুযুক্তিগুলো সমাজে ভালভাবেই শেকড় গেড়েছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, একবিংশ শতাব্দিতে এসেও আজকের সভ্য সমাজ কথিত হালালায়ে শরিঈয়্যাহ বা নিকাহ হালালা নামক অসভ্য হিল্লা প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। আজও কোন না কোন বুড়ো মোড়ল বা আলাভোলা কোন নির্বোধ কিংবা পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবকে এক রাতের জন্য হলেও 'ভাড়াটে পাঠা' হতে দেখা যায়।

যুক্তি ১ ঃ কারো গলা কেটে আফসোস করলে যেমন গলা কাটা হয়নি প্রমাণিত হয় না, তেমনি যেভাবেই হোক তালাক দিয়ে আফসোস করলেও তালাক হয়নি বলা যায় না। যুক্তি পেশ করা হয়, অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও কাউকে গুলি করে বা অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হলে, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলি বৈধভাবে করা হলো, না অবৈধভাবে করা হলো, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। মাওলানা আশরফ আলী থানবী রহঃ কৃত **'বেহেশতী জেওর'** এর ষষ্ঠ খণ্ডের তালাক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'যে

[১৪২] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৫।

একজন দূর্বল অধীনস্থ মানুষকে কামরার মধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া গুলি করিয়া মারে, কিন্তু এ ব্যক্তি পাপী হওয়া সত্ত্বেও তাহার গুলিতে যেমন লোকটি মরিয়াই যায়, মৃত্যু ঠেকান যায় না, ঠিক সেইরূপে যদি কোন নির্বোধ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক কিংবা উপরোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থাসমূহে তালাক দেয়, তবে সে তালাক পড়িবেই পড়িবে, স্ত্রী বিচ্ছেদ হইবেই হইবে।'

অপনোদন ঃ তালাক গুলাগুলির মত কোন দূর্ঘটনা নয়। এটি একটি নির্ধারিত প্রক্রিয়া। নিরুপায় দম্পতি পরস্পর থেকে আলাদা হওয়ার যে প্রক্রিয়া তা-ই তালাক। যাতে রাগের বশত এই প্রক্রিয়াকে কোনভাবেই হেলা-উপেক্ষা না করা হয়, সেজন্যই রাগের মাথায় তালাক হবে না বলে রাসুলুল্লাহ সাঃ ঘোষনা দিয়েছেন। যা মুমিন মাত্রই অক্ষরে অক্ষরে পালনে বাধ্য। উত্তর এটুকুতেই যথেষ্ট হতে পারতো। কিন্তু ক্বিয়াসগুলো যে কতটা অবান্তর-অসামঞ্জস্যপূর্ন ও মানবতার বিরুদ্ধ তা আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমতঃ বিবাহের মত পবিত্র একটি বন্ধনকে এভাবে চিত্রায়িত করা মোটেও ঠিক হয়নি। কেননা, কোন পিতা-মাতা তার দূর্বল মেয়েকে নিঃসহায় অবস্থায় সবলের অধীনস্থ করে গুলি খাওয়ার মত তালাক খেয়ে মরার জন্য বিয়ে দেয় না। যাই হোক, তালাকের সাথে গুলাগুলির ক্বিয়াস বিভিন্ন কারনে অযৌক্তিক। যেমন, (১) শরিয়তে তালাক প্রদানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সুন্নত তরিকা বাতলানো আছে। কিন্তু কাউকে গুলি করে হত্যা করার কোন সুন্নত পদ্ধতি শরীয়তে নেই। (২) তালাক দেওয়া ঘৃণিত হলেও বৈধ (হালাল)। পক্ষান্তরে স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। (৩) দূর্বল অধীনস্থ স্ত্রীকে নিঃসহায় অবস্থায় কামরায় পেয়ে গুলি করে হত্যা করার পরিণাম আর তালাক উচ্চারণের পরিণাম কষ্মিনকালেও এক নয়। (৪) নিরুপায় হলে তালাকের অনুমতি দেয়া হয়েছে, গুলি করে হত্যার অনুমতি দেয়া হয়নি। (৫) তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পর থেকে স্বাধীন হয়, আর গুলি করে হত্যা করলে একজনকে দুনিয়া থেকেই চিরবিদায় নিতে হয়। (৬) পাগল, মাতাল, নাবালেগ যে কেউ রাগের মাথায় হোক বা ঠান্ডা মাথায়, ভুলে হোক কিংবা বুঝেশুনে, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, কাউকে গুলি করে হত্যা করলে যদি হত্যা হয়েই যায়, তাহলে পাগল, মাতাল, নাবালেগের তালাক পতিত হবে না কেন? (৭) প্রথম তালাক ও দ্বিতীয় তালাক ফেরৎযোগ্য। এ দু'প্রকারের তালাক উচ্চারণের পরও যথোচিৎ পন্থায় স্ত্রীকে ফিরেয়ে আনার সুযোগ আছে। পক্ষান্তরে, কোন বন্দুকের গুলি একবার নল থেকে বের হয়ে গেলে তা ফেরৎ আনার কোন সুযোগ আছে কি? তাহলে তালাকের সাথে গুলির ক্বিয়াস সঠিক হয় কিভাবে?

দেখুন, গুলি করতেও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে তৈরী হতে হয়। এই যেমন বন্দুকে গুলি ভর্তি করা, লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তাক করা, নিশানা ঠিক করা তারপর ট্রিগারে চাপ দেওয়া। অন্যথা, লক্ষ্যস্থল ভেদ করা যায় না। তেমনি রাগের

মাথায় হুট করে গুলি করে বসলেন, বন্দুকে গুলি ছিল কিনা, কোথায় গুলি করলেন, নিশানা কি তারও কোন ঠিক ঠিকানা নাই, এসব পাগলামীতে মোটেও লক্ষ্যস্থল ভেদ হয় না। বড় আফসোসের বিষয়, সমাজে যে হারে গুলি কামানের ক্বিয়াস চর্চা হচ্ছে, আজ যদি সে হারে কুরআন সুন্নাহ চর্চা হতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

যুক্তি ২ ঃ আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী রহঃ কৃত 'জা-আল হক' এর দ্বিতীয় খণ্ডে তাৎক্ষণিক তিন তালাকের আলোচনায় বলা হয়েছে, রোযা অবস্থায় কেউ রাগের মাথায় খেয়ে ফেললে যদি তার রোযা ভেঙ্গে যায়, তাহলে তালাক কেন নয়? এছাড়াও, অনেক আলেমকে তালাকের সাথে আত্মহত্যার তুলনা করতেও দেখা যায়। বলা হয়, রাগের মাথায় কেউ বিষ খেয়ে মরে যাওয়ার পর পুনরায় এসে সে কি বলতে পারে, আমি রাগের মাথায় বিষ খেয়েছি?

অপনোদন ঃ (১) পূর্ণ বিচ্ছেদের জন্য তালাক একবার বা দুইবার দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় অথবা তৃতীয়বার তালাক দিতে হয়। কিন্তু খাবার একবার পেটে গেলেই রোযা ভেঙ্গে যায়। (২) রোযা অবস্থায় সঙ্গম করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। পক্ষান্তরে, প্রথম দুই তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে হলে সঙ্গমের দ্বারা তালাক প্রত্যাহার হয়ে যায়। (৩) ইচ্ছে করে রোযা ভাঙলে রোযা রেখে কাফ্ফারা আদায়ের নিয়ম আছে, কিন্তু তালাক দিলে আবার তালাক দিয়ে কাফ্ফারা আদায়ের কোন নিয়ম নেই। (৪) বেলা শেষে রোযা ভাঙতেই হবে, কিন্তু বিবাহ বন্ধন আজীবনের। (৫) রোযা ইসলামের ফরয বিধান, যা অস্বীকার করা কুফুরী। সুস্থ সবল আক্বেল, বালেগ ও ঋতুমুক্তা নারী মাত্রই রমযান মাসে সওম পালনে বাধ্য। পক্ষান্তরে তালাক কোন ফরয বিধান নয় বরং হালাল হলেও ঘৃণিত। কেউ জীবনে একবারও তালাক দেয়নি, এরজন্য তাকে আল্লাহর দরবারে মোটেও জবাবদিহি করতে হবে না।

আর আত্মহত্যার মত একটি গুরুতর হারাম বিষয়কে তালাকের সাথে অনুমাণ করা আরও মারাত্মক। কেননা, ইসলামে নিরুপায় দম্পতির জন্য তালাক বা বিচ্ছেদের অনুমতি আছে, কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার কথা ভাবাও পাপ। আত্মহত্যায় বিষ, ফাঁস, গুলি সবকিছু নিজেকে হজম করতে হয়, আর তালাক অন্যজনকে হজম করানো হয়। তালাক দেওয়া হয় দুর্বিষহ দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। পক্ষান্তরে, আত্মহত্যা করা হয় চিরতরে জাহান্নামী হওয়ার জন্য। মনে রাখা উচিৎ, অনেক আত্মহত্যায় মানুষ ব্যর্থ হয়। যেমন কেউ কেউ আত্মহননের উদ্দেশ্যে দুইতলা ছাদ থেকে লাফ দিয়েও মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে থাকে, আবার অনেকে বিষপান করেও বিষে ভেজাল থাকার কারনে ছটপট করে কিন্তু মরে না। সুতরাং, ভেজাল বিষে যেমন মানুষ মরে না, তেমনি ভেজাল তালাকও পতিত হয় না।

যুক্তি ৩ ঃ তালাক তো দেওয়াই হয় মুলত রাগের মাথায়। কেউ কি ঠান্ডা মাথায় তার বিবিকে আদর করতে করতে তালাক দেয়?

অপনোদন ঃ (১) মানুষ রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ভুল করবে, নিষ্পাপ সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে তা জানতেন বলেই তো রাসুলুল্লাহ সাঃ এটি করতে বারণ করেছেন। (২) রাগারাগি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মোটেও পছন্দের ছিল না।[১৪৩] (৩) রাগের মাথায় তালাক না হওয়ার পক্ষে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুস্পষ্ট সহিহ সুন্নাহ মরফূ সূত্রে বর্ণিত আছে। যা উম্মতকুল অক্ষরে অক্ষরে পালনে বাধ্য। (৪) কারো গোছানো সংসার যখন এলোমেলো হয়ে যায়, কারনে অকারনে তিক্ততায় ভরে উঠে, দুর্বিষহ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা, সেই মুহূর্তে এরূপ বিভীষিকাময় জীবন-যাত্রা থেকে রেহাই পেতে হলে তাকে অবশ্যই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা, ক্রোধান্ধ অবস্থায় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেকবুদ্ধি সবকিছু স্বভাবতঃ লোপ পায়। এছাড়াও, রাগের মাথায় তালাক দেওয়ার শিক্ষা কুরআন সুন্নাহর কোথাও নেই।

যুক্তি ৪ ঃ রাগের মাথায় তালাক হারাম হলেও তা পতিত হবে। কেননা, কোন কাজের হারাম হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। যেমন, চুরিকৃত চাকু দ্বারা পশু জবাই করা হারাম, কিন্তু কেউ জবাই করে ফেললে তা হালাল হয়ে যায়। এ যুক্তিটিও জা'আল হক গ্রন্থকারের।

অপনোদন ঃ 'কোন কাজের হারাম হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না।' তাহলে তো পাগল নাবালেগ কিংবা নারীর তালাকও পতিত হবার কথা। আসলে কি তাই? আর পশু জবাই করার ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহ'য় নির্ধারিত তরিকা বাতলানো আছে। এই তরিকার বিপরীত উপায়ে জবাই করা হলে তা হালাল হয় না। যেমন গায়রুল্লাহ'র নামে পশু জবাই করা হারাম, করলেও তা হারাম-ই।[১৪৪] তাহলে কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত তরিকার বিপরীত উপায়ে তালাক দিলে তা সিদ্ধ হয় কি করে? আর পশুটি কোন চাকু দিয়ে জবাই হয়েছে, চাকুটি চুরিকৃত কিনা, তা মুসলমান কামার বানিয়েছে নাকি অমুসলিম কামার বানিয়েছে এ বিষয়ে পশু খাদকরা বেখবর থাকে। ইসলামে বেখবরদের পাপ পূণ্য থেকে ফুরসত দেয়া হয়েছে।[১৪৫] তাছাড়া, জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য জবাই কাজে ব্যবহৃত চাকুটির বৈশিষ্ট কি হবে তা কোথাও বলা হয়নি।

---

[১৪৩] ইবনে মাজাহ- হাঃ ৪১৮৯, তিরমিযী- হাঃ ২০২০।
[১৪৪] সুরা বাক্বারাহ ঃ ১৭৩, সুরা মায়েদাহ ঃ ৩, সুরা নাহল ঃ ১১৫।
[১৪৫] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০৪১, ২০৪২।

ইসলামে ক্বিয়াস বৈধ, তবে মনগড়া ক্বিয়াস নয়। যেহেতু এসব ধারণাপন্থীদের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী, তাই এ বিষয়ে খোদ ইমাম আবূ হানিফা রহঃ এর মুলনীতি কি ছিল তা উল্লেখযোগ্য। ইমাম আযম রহঃ এই সমস্ত যুক্তিবাদীদের বেশ কড়া ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

البول في المسجد أحسن من بعض القياس

'বহু ক্বিয়াস আছে, যা গ্রহনের চেয়ে মসজিদে প্রশ্রাব করা উত্তম।'[১৪৬]

ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর মাসআলা ইস্তিম্বাতের মুলনীতি সম্বন্ধে আরও বর্ণিত আছে,

روى أبو جعفر الشيزاماري بسنده المتصل إلى الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول: "كذب والله وافترى علينا من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى القياس وكان يقول نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة وذلك أننا ننظر أولاً في دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة ثم أقضية الصحابة فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به

'আবু জা'ফর শায়যামারী ইমাম আবূ হানিফা হতে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন, তিনি (ইমাম আযম রহঃ) বলতেন, যারা বলেন যে আমরা কুরআন হাদীসের বক্তব্যের উপর ক্বিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি, আল্লাহর কসম! তারা মিথ্যা বলেন এবং অপবাদ আরোপ করেন। নস (কুরআন সুন্নাহ'র বক্তব্য) থাকতে ক্বিয়াসের কি প্রয়োজন? তিনি আরও বলতেন, আমরা খুব বেশি জরুরী অবস্থায় (নস দ্বারা মীমাংসা করা না গেলে) ক্বিয়াসের আশ্রয় গ্রহন করি। তবে আমরা কোন মাসআলার দলিল খুঁজি প্রথমে আল্লাহর কিতাবে, তারপর সুন্নাহ'য়, তারপর সাহাবীগণের ফায়সালার মধ্যে। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এতে কোন দলিল না পাই, তখন কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত কোন বিধানের উপর ক্বিয়াস করি।'[১৪৭]

ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص عن كتاب الله أو سنة عن رسول الله أو إجماع عن الأمة وإذا اختلف الصحابة على أقوال نختار منها ما هو أقرب الى الكتاب أو السنه ونجتنب عما جاوز ذلك

'আল্লাহর কিতাবে অথবা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাতে কোনো বক্তব্য থাকলে অথবা উম্মাতের ইজমা বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ দ্বারা কথা বলার অধিকার কারো নেই। আর যদি সাহাবীগণ মতভেদ করেন তবে আমরা তাঁদের

[১৪৬] আল ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কাহ, কৃত খতীবে বাগদাদী- পৃঃ ২৯৬।
[১৪৭] মাজলাতুল জামিয়া ইসলামিয়া- ৮/২৮১।

মতগুলোর মধ্য থেকে কুরআন অথবা সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী বক্তব্যটি গ্রহণ করি এবং এর ব্যতিক্রম সব কিছু পরিত্যাগ করি।'[১৪৮]

اياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي عليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل

'খবরদার! কেউ আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে যুক্তি দিয়ে কথা বলবে না। তোমরা অবশ্যই সুন্নাহ'র অনুসরণ করবে। এ থেকে যে-ই মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে-ই বিভ্রান্ত হবে।'[১৪৯]

ইমাম ইবনে আবি যায়েদ রহঃ স্বীয় 'জামে' গ্রন্থে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত' এর আক্বীদা, আদর্শ ও রীতির আলোচনায় বলেন,

التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس

'হাদীসই গ্রহনীয় হবে। না যুক্তি দ্বারা হাদীসের বিরোধিতা করা যাবে, না ক্বিয়াস দ্বারা হাদীস প্রত্যাখ্যান হবে।'[১৫০]

মোটকথা, ইসলামে তালাক ব্যবস্থা সরাসরি কুরআন সুন্নাহ দ্বারা মীমাংসিত একটি স্বতন্ত্র বিধান। যা কোনভাবেই যুক্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হবার নয়।

[১৪৮] তাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ- ২/৪৭৩।
[১৪৯] ক্বাওয়ায়ীদুত তাহদীদ, কৃত আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী দামেশকী- পৃঃ ১৩।
[১৫০] উসুলুল ফিক্বহ আলা মানহাযি আহলিল হাদীস- পৃঃ ১৭।

এক মজলিসে তিন তালাক ঃ

কোন কোন ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে আপন স্ত্রীকে কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত পদ্ধতির বিপরীত উপায়ে বিদআতি পন্থায় এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে। আবার অত্যল্পক্ষণ পর রাগ প্রশমিত হলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মন পুনরায় অনুশোচনায় ভরে উঠে। কিন্তু এরূপ একত্রিত তিন তালাকের কারনে তালাকের সংখ্যাসীমা শেষ হয়ে যাওয়ায় উভয়ের সংসারযাত্রায় নেমে আসে নানা প্রতিবন্ধকতা এমনকি তাদের একত্র বসবাস সমাজে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শরীয়তে উল্লেখিত সংকটের প্রতিকার কী? অর্থাৎ এই প্রকারের তালাক কার্যকর হবে কি না? হলে তা তিন তালাক গণ্য হবে নাকি এক তালাক? এ নিয়ে বিদ্বানগণের মাঝে যেমন বাড়াবাড়ির শেষ নেই, তেমনি সাধারণ মুসলমানের মাঝেও শেষ নেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের। তাই এ বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

মুসলিম সমাজে তালাকের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ও অমীমাংসিত বিষয়টি হল এই 'যুগপৎ তিন তালাক'। যুগ যুগ ধরে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের যেন শেষ নেই। জানা যায়, এই মাসআলায় দ্বিমত করার দায়ে শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তায়মিয়্যাহ রহঃ কে কারাবাসে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র আল্লামা হাফেজ ইবনুল কায়্যিম আল যাওজী রহঃ এই মাসআলার জন্য শত শত মাইল হেঁটে মুনাজারা করতে যেতেন। প্রতিপক্ষের বিভিন্ন আপত্তিসমূহের সমুচিৎ জবাব পেশ করতেন। আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী রহঃ তাঁর 'তিন তালাক প্রসঙ্গ' নামক পুস্তিকাতেও আলোচ্য বিষয়ে যথার্থ ও ক্ষুরধার আলোচনা পেশ করেছেন। অধম উক্ত পুস্তিকার আগাগোড়া পুঙ্খানো পুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং এ অধ্যায়টি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সিংহভাগ সাহায্য তা হতেই নিয়েছি। অনেকেরই দাবি বিষয়টি বহু আগেই মীমাংসা হয়ে গেছে এবং তা একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করলে তিন তালাক গণ্য হওয়ার উপর। এই দাবি সঠিক নয়। তাই এ অধ্যায়টি এভাবে সাজিয়েছি যে, প্রথমে আলোচ্য বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদ ও মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কি করণীয়, তারপর কুরআন সুন্নাহর আলোকে একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাকের প্রকৃত শরয়ী

হুকুম ও হুকুমের পোষকতায় দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপন এবং সবশেষে এ বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিসমূহেরও যথাযথ সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত জবাব উপস্থাপন করেছি।

বিদ্বানগণের মতভেদ ঃ

'শরয়ী তালাক' যা প্রদান করে পুরুষ স্ত্রীকে পূণরায় গ্রহন করতে পারে, মানুষকে তার সমগ্র জীবনে এরূপ তালাক দেওয়ার অধিকার মাত্র দুইবার দেওয়া হয়েছে। এই দুই তালাককে রজয়ী তালাক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই প্রকারের তালাক দুইবার দেওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিক বা না নিক, যদি তৃতীয় তালাক তথা শেষ তালাকটিও পন্থা মোতাবেক প্রদান করে ফেলে, তাহলে উক্ত স্ত্রী তার পক্ষে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যাবে। অবশ্য সে স্ত্রী অপর কোন পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়ার পর শরয়ী উপায়ে যদি মুক্তি লাভ করতে পারে (ঠিকা, হিল্লা প্রভৃতি উপায়ে নয়), তবেই তার পূর্ব স্বামী ফের নতুন করে সে স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। উল্লেখিত সংবিধান সম্পূর্ন কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক যা ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোকপাত করেছি। তবে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করলে তার বিধান কি এ প্রসঙ্গে উম্মতে মুসলিমাহর বিদ্বানগণের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহঃ (৫৫৪-৬০৬) লিখেন,

قال قوم أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة وهذا التفسير هو قول من قال الجمع بين الثلاث حرام وزعم أبو زيد الدبوسي في الأسرار أن هذا هو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم وقول ابي حنيفة انه وان كان محرما الا انه يقع والقول الثاني أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثلاث وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الثلاث وهو مذهب الشافعي ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين الأول وهو اختيار كثير من علماء الدين أنه لو طلقها اثنين أو ثلاثاً لا يقع إلا الواحدة وهذا القول هو الأقيس لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة والقول بالوقوع سعى في إدخال تلك المفسدة في الوجود وأنه غير جائز فوجب أن يحكم بعدم الوقوع والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه وإن كان محرماً إلا أنه يقع وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد

'বিদ্বানগণের একটি দলের অভিমত এই যে, শরয়ী তালাকের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে একত্র তিন তালাক দেওয়ার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথমের পর দ্বিতীয়,

অতঃপর তৃতীয়বারে তালাক দেওয়া আবশ্যক। যে সকল বিদ্বানগণ যুগপৎভাবে তিন তালাক প্রদান করাকে হারাম সাব্যস্ত করে থাকেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যা তাঁদেরই প্রদত্ত। আল্লামা আবু যায়েদ দুবুসী স্বীয় 'আসরাস' নামক উসূলে ফিক্বহের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার কার্যকে হযরত ওমর, উসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবু মুসা আশআরী, আবুদ্দারদা ও হুযায়ফা রাঃ প্রভৃতি সাহাবাগণ হারাম বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর অভিমত এই যে, এক সঙ্গে তিন তালাক যদিও হারাম, তথাপি তা তিন তালাকই ধর্তব্য হবে। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, যে তালাক প্রদানের পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায় তা দুই তালাক পর্যন্ত, তৃতীয় তালাকের পর আর ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই। যাঁরা একত্রিতভাবে তিন তালাক প্রদান করা সিদ্ধ বলেন, এই উক্তি হচ্ছে তাঁদের প্রদত্ত উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর, যা ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর অভিমত। বিদ্বানগণের এই দলটি আবার দুইভাগে বিভক্ত হয়েছেন। একদল বলেন, এবং এটি বহু বিদগ্ধ বিদ্বানগণের অভিমত যে, এক সঙ্গে দুই বা তিন তালাক প্রদান করলে তা কেবল এক তালাকই গণ্য হবে। এই অভিমতই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং অধিক যুক্তিযুক্ত। কারন শরয়ী তালাক ব্যবস্থা দ্বারা যে সকল অনিষ্টের প্রতিরোধ করা হয়েছে, একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার ব্যবস্থা উক্ত অনিষ্টসমূহকে (প্রতিরোধ করে না বরং) সৃষ্টি করার প্রেরণা যোগায় এবং এটি সম্পূর্ন অবৈধ। অতএব, একত্রিত তিন তালাক তিন তালাক রূপে গণ্য না হওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করাই ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় অভিমত অর্থাৎ একত্রে তিন তালাক হারাম হলেও তা তিন তালাক রূপেই গণ্য হবে, ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর এই অভিমতের ভিত্তি হল, তালাক গণ্য না করার ব্যবস্থায় উল্লেখিত অনিষ্টসমূহের কোন ইঙ্গিত নাই।'[১৫১]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহঃ প্রদত্ত বিদ্বানগণের মতভেদের তালিকা যদিও সংক্ষিপ্ত, বস্তুতঃ যুগপৎভাবে প্রদত্ত তিন তালাকের বৈধতা ও কার্যকারিতা সম্মন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ আরও বিস্তর। যথাঃ

১. এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা সম্পূর্ন হারাম। কাজেই হারাম হওয়ার দরুন উক্ত তালাক আদৌ ধর্তব্য নয়।
২. এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা সম্পূর্ন হারাম। তবে হারাম হলেও তা দ্বারা তিন তালাকই গণ্য হবে।
৩. এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা বৈধ। যেহেতু তিন তালাক বৈধ, সুতরাং তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকর হবে।

[১৫১] মাফাতিহুল গায়েব- ৬/৮২-৮৩পৃঃ।

৪. এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা বৈধ। তবে তালাক প্রদানকারীর অভিপ্রায় অনুসারে তালাকের প্রয়োগ নির্ণয় করা হবে।
৫. অ-সহবাসকৃতা নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে সে প্রথম তালাকেই 'বায়েনা' হবে। অন্যত্র বিবাহ ব্যতিরেকে পূণঃগ্রহন করার উপায় নাই।
৬. অ-সহবাসকৃতা নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে সে প্রথম তালাকেই 'বায়েনা' হবে। তবে তাকে অন্যত্র বিবাহ ছাড়াই নতুন করে বিবাহের মাধ্যমে পূণঃগ্রহন করা যাবে।
৭. অ-সহবাসকৃতা নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে।
৮. সহবাসকৃতা ও অ-সহবাসকৃতা উভয়বিধ নারীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকর হবে। অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হওয়া ছাড়া তাকে পূণঃ গ্রহনের সুযোগ নেই।
৯. এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা অবৈধ। তথাপি প্রদান করলেও তা এক তালাকই ধর্তব্য হবে।

দেখা যাচ্ছে, একত্রিত তিন তালাক সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে নয় প্রকারের মতভেদ বিদ্যমান আছে। কাজেই একত্রিত তিন তালাক সংশ্লিষ্ট মাসআলা যে সম্মানিত বিদ্বানগণের নিকট একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা এ ব্যাপারে আর কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। সময়াভাব ও কলেবর সীমিত রাখার লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রকারের মতভেদের বিশদ আলোচনা আপাত পরিহার করছি এবং বিষয়টিকে চুড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে সম্মানিত বিদ্বানগণের অতি প্রাসঙ্গিক ও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত তিন প্রকার অভিমত নিম্নে তুলে ধরছি।

প্রথম অভিমত ঃ পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে একত্রিতভাবে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে এই কাজ হারাম ও বিদআত হওয়ার দরুন পাপ হবে, কিন্তু এক তালাকও সংঘটিত হবে না।

তাবেয়ী বিদ্বানগণের একটি দল, বিশেষতঃ তাঁদের নেতৃস্থানীয় ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসায়েব এই অভিমত পোষণ করতেন। এটি আল্লামা আলুসী রহঃ স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।[১৫২] ইবনুল আলীইয়া, হিশাম ইবনে হাকাম এবং আবু উবায়দাও এই মতের অনুসারী ছিলেন।[১৫৩] হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে এটি অন্যতম।[১৫৪] ইমামিয়্যাহ বিদ্বানগণ, মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের একাংশ ও অধিকাংশ

[১৫২] রুহুল মা'আনী- ১/৪৩০পৃঃ, জালাউল আইনাইন- পৃঃ ১৪৬।
[১৫৩] নায়লুল আওত্বার- ৬/১৯৭পৃঃ।
[১৫৪] ইমাম নববীর শরহে মুসলিম- ১/৪৭৭পৃঃ।

যাহেরী বিদ্বানগণও এই মতের সমর্থক ছিলেন।[১৫৫] উল্লেখ্য, বর্তমান শিয়ারা এই মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্শ্বদেশ ভারতেও আইনী লড়াই ও আন্দোলন সমানে বহাল রেখেছে।

এছাড়াও, একত্রিত তিন তালাককে হারাম ও বিদআত স্থির করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন হযরত ওমর ফারুক রাঃ, হযরত উসমান গণি রাঃ, হযরত আলী মর্তুযা রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ, ইমরান ইবনুল হুসাইন রাঃ, আবু মুসা আশআরী রাঃ, আবু দারদা রাঃ ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাঃ প্রভৃতি সাহাবীগণ। আল্লামা দবুসীর প্রমুখাৎ ইমাম রাযী রহঃ তাঁর তাফসীরে এটি উল্লেখ করেছেন।[১৫৬] শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ বলেন, ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাঃ, ইমাম আবু হানিফা নো'মান রহঃ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের মধ্যে বহু বিদ্বান একত্রিত তিন তালাককে বিদআত ও হারাম বলেছেন।[১৫৭]

দ্বিতীয় অভিমত ঃ পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী সহবাসিতা হউক বা না হউক, আর একত্রিত তিন তালাক দেওয়া হারাম, বিদআত, বৈধ যাই হোক না কেন, তা তিন তালাকই গণ্য হবে।

হযরত আলী মর্তুযা রাঃ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ উভয়ের বাচনিক যে দ্বিবিধ উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তম্মধ্যে এটি অন্যতম।[১৫৮] হযরত ওমর রাঃ এর খিলাফত পরবর্তী সাহাবীগণের একটি বিরাট দল, অধিকাংশ তাবেয়ীন, আহলে ইমামগণের একটি ক্ষুদ্র দল, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং তাঁদের অনুবর্তীগণের অধিকাংশ এ সিদ্ধান্তই গ্রহন করেছেন।

তৃতীয় অভিমত ঃ একত্রিতভাবে তিন তালাক দেওয়া অবৈধ হলেও যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এইভাবে তিন তালাক দেয়, তাহলে তা এক তালাক গণ্য হবে এবং তালাকের নির্ধারিত ইদ্দতের মধ্যে হলে বিনা বিবাহে আর ইদ্দত নিঃশেষিত হওয়ার পর হলে বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে উক্ত স্বামী তার তালাকদত্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে ও হযরত আবু বকর রাঃ এর খিলাফতকালে, এমনকি হযরত ওমর রাঃ এর খিলাফতের প্রথম দুই থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত এই মত প্রচলিত

[১৫৫] ফতহুল বারী- ৯/২৮৯পৃঃ, ফতাওয়ায়ে ইবনে তায়মিয়্যাহ- ৩/২৭পৃঃ, রদ্দুল মুহতার- ২/৪১৯পৃঃ, ফতহুল কৃদীর- ৩/২৬পৃঃ, উমদাতুর রে'আয়া- ২/৬৭পৃঃ, তাফসীরে মাযহারী- ১/২৩৫পৃঃ।
[১৫৬] তাফসীরে কবীর- ২/২০২ ও ২৭৩ পৃঃ।
[১৫৭] ফতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ- ৩/৩৭পৃঃ।
[১৫৮] ই'লাম- ৩/৪৮পৃঃ, সুবুলুস সালাম- ২/৯৫পৃঃ, নায়লুল আওত্বার- ৬/১৭৯পৃঃ।

ছিল।[১৫৯] চতুর্থ খলিফা হযরত আলী মর্তুযা রাঃ এর প্রমুখাৎ যে দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত বর্ণিত রয়েছে, এটি তার অন্যতম।[১৬০] এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ এরও অভিমত। ইবনে ওয্যাহ কিতাবুল ওসায়েকে, আবু ওলীদ হিশাম আবদী মুফিদুল হুক্কামে ও শরীফ আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া বাহরুয্যাখেরে উল্লেখিত রেওয়ায়েতগুলি উদ্ধৃত করেছেন।[১৬১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃও এই অভিমত পোষণ করতেন।[১৬২] প্রখ্যাত সাহাবা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ, যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ প্রমুখগণও এই মতের অনুসারী ছিলেন।[১৬৩] হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ এর দ্বিবিধ অভিমতের মধ্যেও এটি অন্যতম।[১৬৪] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ লিখেছেন,

والثالث أنه محرم ولا يلزم فيه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويرى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس القولان

'একত্রিত তিন তালাক সম্বন্ধে তৃতীয় অভিমত এই যে, এরূপ তালাক যদিও হারাম কিন্তু এতে এক তালাক ব্যতীত অন্য কিছু সংঘটিত হয় না। এটিই হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ ও হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ এর উক্তি স্বরূপ বর্ণিত আছে। আর হযরত আলী রাঃ, ইবনে মাসউদ রাঃ ও ইবনে আব্বাস রাঃ এর প্রমুখাৎ এ বিষয়ে দ্বিবিধ উক্তিই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ একত্রিত তিন তালাক কেবল এক তালাক গণ্য হওয়া এবং তিন তালাক গণ্য হওয়া।'[১৬৫]

মতভেদপূর্ণ বিষয়ে করণীয় ঃ

যেহেতু, তিন তালাক প্রসঙ্গে গোড়াগুড়ি হতেই বিদ্বানগণের মাঝে মতভেদ চলে আসতেছে, এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমান কোনটি রেখে কোনটি গ্রহন করবে, এহেন

[১৫৯] মুসলিম- হাঃ ৩৭৪৭, আবু দাউদ- হাঃ ২২০২, দারাকুতনী- হাঃ ৪/১৩৮, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক- হাঃ ১১৩৩৭, মু'জামুল কাবীর- হাঃ ১০৯৩৯।
[১৬০] ই'লাম- ৩/৪৮পৃঃ, সুবুলুস সালাম- ২/৯৫পৃঃ, নায়লুল আওত্বার- ৬/১৭৯পৃঃ।
[১৬১] ফতহুল বারী- ৯/২১পৃঃ, নায়লুল আওত্বর- ৬/১১৭পৃঃ, ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ- ৩/৩৭পৃঃ, ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৯পৃঃ, সুবুলুস সালাম- ২/৯৮পৃঃ, মিসকুল খিতাম- ২/২১৫পৃঃ।
[১৬২] ইমাম নববীর শরহে মুসলিম- ১/৪৭৭পৃঃ, সুনানে আবু দাউদ, ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, ফতহুল কদীর- ৩/২৬পৃঃ, রদ্দুল মুহতার- ২/৪১৯পৃঃ।
[১৬৩] ফতহুল বারী- ৯/২৯০পৃঃ, ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, জালাউল আইনাইন- ১৪৬পৃঃ।
[১৬৪] ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৯পৃঃ, নায়লুল আওত্বর- ৬/১৯৮পৃঃ।
[১৬৫] মজমুউল ফাতাওয়া- ৮/৩৩পৃঃ, ফতাওয়া আল কুবরা- ৩/২৭৮পৃঃ, ইক্বামাতুত দলীল আলা ইবত্বালিত তাহলীল- ৩/৯৭পৃঃ। আরও দেখুন, ফতাওয়া আল আযহার- ২/৭৬পৃঃ।

সমস্যার কবল থেকে বাঁচানোর জন্য একটি কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সুরাহা বিধান আবশ্যিক জরুরী। এক্ষেত্রে দুটি মুখ্য মুলনীতির (principle) প্রতি লক্ষ্য রেখে চলা বিদ্বানগণের কর্তব্য।

প্রথম লক্ষণীয় মুলনীতিটি হলো, এ সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের প্রকৃত মীমাংসা কি-তা অনুসন্ধান করা এবং তা দলনিরপেক্ষ মনে বিচার করা। কেননা, আমরা মুসলমান মাত্রই আদিষ্ট হয়েছি যে,

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলে তোমরা তাহা আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (সাঃ) এর প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি সত্যই তোমাদের আল্লাহ ও পরলৌকিক জীবনে আস্থা থাকে। ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক ও (মতভেদ মীমাংসা করার) উৎকৃষ্টতম পন্থা।'[১৬৬]

এই আয়াত প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনুল কায়্যিম জওযী রহঃ বলেন,

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعا ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله

'এই মাসআলা যখন একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলারূপে উপস্থিত হয়েছে, সেজন্য এটিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহর কষ্টি পাথরে যাচাই করা আবশ্যক।'[১৬৭]

উপমহাদেশের মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহঃ বলেন,

فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحددون القرآن والسنة ، وحرم بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة ، وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم ، فيأخذه كلهم

'মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারোর মতের দিকে মনোনিবেশ করার অনুমতি দেননি। তেমনি মতবিরোধের প্রশ্নে অন্য কারো ভাষ্যের প্রতি মনোনিবেশ করাকে হারাম করেছেন। কেননা, কোন ব্যক্তির বক্তব্যও কুরআন-সুন্নাহ বহিঃর্ভূত ব্যাপার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহাবী ও তাবেঈগণের মাঝে এ ব্যাপারে ইজমা ছিল যে, তাঁদের পূর্ববর্তীদের যে কারোর ভাষ্যের দিকে মনোনিবেশ করা বা ব্যক্তি বিশেষের সব কথা নির্বিচারে মেনে নেয়া নিষিদ্ধ।'[১৬৮]

---

[১৬৬] সুরা নিসা ঃ ৫৯।
[১৬৭] ইগাছাতুল লাহফান- পৃঃ ৩২৩।
[১৬৮] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- পৃঃ ৩২৬।

অতএব, একত্রিত তিন তালাকের ব্যাপারেও বিদ্বানগণের যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এক্ষেত্রে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক ও কলহ নিস্পত্তির প্রধান উপায় হবে একেবারে দলান্ধ না হয়ে কোরআন ও হাদীসের মীমাংসার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় মুলনীতিটি হলো ইসতিহসান তথা মানবকল্যানের প্রাধান্য দেয়া (Humanity's prevalence)। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'মানবতার প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে?'[১৬৯]

আমরা জানি, একটি সংসারের সাথে একাধিক জীবনমানের প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। বিশেষ করে তালাকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি সংসারেরই অবসান ঘটে না, পাশাপাশি অনেক নিস্পাপ সন্তান সন্ততির জীবনেও নেমে আসে বিপন্নতার ঝড়। কাজেই ইসতিহসানের সদ্ব্যবহার এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই নফসে আম্মারার আরাম আয়েশ তালাশ করার কথা বলে ইসতিহসানকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান। অতি বিদ্রুপের সাথে বলে থাকেন এটি নিছক আবেগ তাড়িত বিষয়, ইসলাম আবেগ দিয়ে চলে না। বস্তুত এটি মোটেও আবেগ তাড়িত বিষয় নয়। তাই কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসতিহসানের প্রকৃত হুকুম কি তা সংক্ষেপে হলেও তুলে ধরা বেশ হবে মনে করছি।

ইসতিহসান ঃ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে রায় দেওয়াটাই হল ইসতিহসান (Welfare of humanity)। হানাফী মাযহাবে এটি ইজমা ক্বিয়াসের চাইতেও শক্তিশালী। এর উদাহরণ হলো, কোন গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ) পুরুষের জন্য অন্য গায়রে মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ দেখে যে, এরূপ কোন গায়রে মাহরাম নারী সাঁতার না জানার কারনে পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে, অথবা উঁচু ছাদের এমন এক জায়গায় তার অবস্থান, যেকোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, অথবা সে রেল লাইন ধরে হাঁটছে, তবে এতটাই আত্মভোলা হয়ে আছে যে নিশ্চিত ট্রেনে কাটা পড়বে, অথবা দূর্যোগ কবলিত কোন স্থানে আটকা পড়েছে, অথবা ডেলিভারী কেস যাকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে নেওয়া জরুরী, তবে নেওয়ার মত কোন মাহরাম ব্যক্তি ঘরে নেই, এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত নারীকে গায়রে মাহরাম হলেও প্রয়োজনে স্পর্শ করে সাহায্য করা ওয়াজীব। অনুরূপ রমযান মাসে রোযা রেখে দিনের বেলায় কিছু খাওয়া হারাম। কিন্তু যখন অতি দূর্বল কাউকে খেতে দেখা যাবে,

---

[১৬৯] সুরা আর রহমান ঃ ৬০।

তখন শরীয়ত বলছে, এ কাজটি হারাম হলেও তাকে বারণ করো না। হাদীসে বলা হয়েছে, যে শরীর হারাম ভক্ষণ করে সেই শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৭০] অথচ জীবন রক্ষার্থে ঔষধ হিসেবে হারাম বস্তুকেও বৈধ রেখেছে ইসলাম। অন্যথা আমরা নির্বিচারে কোন ঔষুধ সেবন করতে পারতাম না। এটাই হলো ইসতিহসান। পবিত্র কুরআনে এর দলিল রয়েছে,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

'আর আল্লাহ তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার কাঠিন্য আরোপ করেন নাই।'[১৭১]

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না।'[১৭২]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেককে শুধু তারই মুকাল্লাফ বানান যা তার সামর্থের মধ্যে থাকে।'[১৭৩]

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

'কোন লোকেরই উচিৎ নয় এমন বিধান আরোপ করা যা ক্ষমতার অতিরিক্ত।'[১৭৪]

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'দেখ, তোমাদের পক্ষে যাহাই সহজসাধ্য আল্লাহ তাহাই চান, আর যাহা তোমাদের পক্ষে দুরূহ তাহা তিনি চান না।'[১৭৫]

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

'আর যে ব্যক্তি কোন মানবের বেঁচে থাকায় সহযোগিতা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির বেঁচে থাকায় সহযোগিতা করল।'[১৭৬]

এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীসও রয়েছে যাতে শুধু মানবজাতি নয় বরং সমস্ত প্রাণীকুলের প্রতিই ইসতিহসান তথা দয়া প্রদর্শন ও সহজতা আরোপ করার নির্দেশ ফুটে উঠেছে।

[১৭০] মুসনাদে আবি ইয়ালা- হাঃ ৮৩ (সনদ দূর্বল)।
[১৭১] সুরা হাজ্জ ঃ ৭৮।
[১৭২] সুরা আরাফ ঃ ৪২, সুরা মুমিনুন ঃ ৬২।
[১৭৩] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৮৬।
[১৭৪] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩৩।
[১৭৫] সুরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫।
[১৭৬] সুরা মায়েদাহ ঃ ৩২।

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, এক নারী একটি বিড়ালের কারনে জাহান্নামের শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। ফলে অনাহারে বিড়ালটির মৃত্যু হয় এবং সেই কারনে উক্ত নারী জাহান্নামে যায়। তাকে বলা হয়, আল্লাহ অধিক অবগত, তুই একে আটকে রাখা অবস্থায় না একে খাদ্য ও পানীয় দিলি, আর না একে ছেড়ে দিলি, যাতে সে জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে হলেও তার জীবন রক্ষা করতে পারতো।'[১৭৭]

عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদাহ আনসারী রহঃ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আমি সালাতের জন্য দাঁড়াই এবং তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা আমার কাছে অপছন্দনীয় হওয়ায় আমি সালাত সংক্ষেপ করি।'[১৭৮]

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে এও এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, أعلم من شدة وجد أمه من بكائه 'আমি জানি যে, শিশু কাঁদলে মায়ের মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে।'[১৭৯]

عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر

'মুসা ইবনে আনাস রাঃ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তোমরা কিছুলোক মদীনায় ফেলে এসেছ। অথচ তোমরা যতদূর সফর করেছ এবং যা কিছু ব্যয় করেছ আর যতটা পথ অতিক্রম করেছ তারা সবকিছুতেই তোমাদের সঙ্গে

[১৭৭] আদাবুল মুফরাদ- হাঃ ৩৭৯।
[১৭৮] বুখারী- হাঃ ৮৩০, আবু দাউদ- হাঃ ৭৮৯, ইবনে মাজাহ- হাঃ ৯৯১।
[১৭৯] বুখারী- হাঃ ৬৭৭, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ১২০৬৭, বায়হাক্বী- হাঃ ৪২১৩।

আছে। একথা শুনে অনেকেই আরজ করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটা কিভাবে সম্ভব যে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে? তারা তো মদীনায় অবস্থান করছে। রাসুলুল্লাহ সাঃ উত্তর দিলেন, তাদেরকে তো অপারগতা আটকে রেখেছে।'[১৮০]

হাদীসে আরও এসেছে, যে ব্যক্তি মানুষকে রহম করে না, আল্লাহ তাকে রহম করেন না। এও এসেছে, কোন মুসলমান যদি কোন ফলবান গাছ রোপন করে আর তা হতে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তাহলে তা তার পক্ষ থেকে সদকা বলে গণ্য হবে। অপর এক হাদীসে এসেছে কোন ব্যক্তি মানুষের চলাচলে অসুবিধা হওয়ার কারনে একটি গাছ কেটে ফেলে আর সেই ব্যক্তিকে রাসুল সাঃ জন্নাতে বিচরণ করতে দেখেছেন। এরকম মানবতার প্রতিকূল হলে রাসুলুল্লাহ সাঃ প্রয়োজনে কুরআন দ্বারা মীমাংসিত বিধানও আপাত শিথিল করেছেন। তবুও প্রাণপ্রিয় উম্মতকে সাধ্যের অতিরিক্ত চাপিয়ে দেন নি। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 'সব ধরণের সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও।'[১৮১] এই আয়াত দ্বারা সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করার উপর আবশ্যিকতা সাব্যস্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 'আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।'[১৮২] এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফরয সালাত জামাআতবদ্ধ হয়ে আদায় করা জরুরী। এগুলো কুরআনে বর্ণিত বিধান, যা সমস্ত মুসলমানের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। এবার এই হাদীসটি লক্ষ্য করুন,

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

'হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পাঁজরের মধ্যে ব্যথা থাকায় সালাত আদায়কালে আমার অসুবিধা হত। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সম্ভব হলে তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, এতে অসুবিধা হলে বসে সালাত আদায় কর এবং তাতেও যদি অসুবিধা হয় পার্শ্বদেশের উপর ভর করে সালাত আদায় কর।'[১৮৩]

[১৮০] বুখারী- হাঃ ৪১৬১, আবু দাউদ- হাঃ ২৫১০।
[১৮১] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩৮।
[১৮২] সুরা বাক্বারাহ ঃ ৪৩।
[১৮৩] বুখারী- হাঃ ১০৬৬, আবু দাউদ- হাঃ ৯৫৩, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১২২৩, তিরমিযী- হাঃ ৩৭২।

সহজ কথায়, ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবিকতার ধর্ম। মানবজাতির সহজসাধ্য জীবনাচরণ ইসলামের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

أحب الدين إلى الله الحنيفة السمحة

'আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মনঃপূত হইতেছে একাগ্রচিত্ত ও সহজসাধ্য ধর্মাচরণ।'[১৮৪]

হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইবনে আবি শায়বা স্ব স্ব মুসনাদে ও ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় 'তর্জমাতুল বাব' আর সুবিখ্যাত 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থেও সংকলিত করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতেও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه

'রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, নিশ্চয় দ্বীন সহজ। আর দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়।'[১৮৫]

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন,

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

'নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।'[১৮৬]

হাদিসটি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতেও বর্ণিত আছে।

সুতরাং ফলকথা এই যে, ইসতিহসান কোন আবেগ তাড়িত বিষয় নয় বরং এটি কুরআন সুন্নাহ অনুমোদিত শরয়ীতের একটি বলিষ্ঠ মুলনীতি। যার ভিত্তিতে অপারগ অবস্থায় ও মতভেদপূর্ণ বিষয়ে করণীয় কী তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাজেই, একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে বিদ্বানগণের বিভিন্ন প্রকার মতভেদসমূহ ও মতভেদেসমূহের পোষকতায় আনীত বিভিন্ন প্রকার দলিলসমূহ কিছুক্ষণের জন্য সমপর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করে নিলেও তম্মধ্যে যা অধিক কুরআন সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পাশাপাশি অধিক জনহিতকর ও সহজসাধ্য বিবেচিত হবে তা-ই উম্মতে মুসলিমার জন্য বিধান হিসেবে সাব্যস্ত করা আবশ্যক হবে।

[১৮৪] ছহীহ বুখারী- ২/২৯পৃঃ।
[১৮৫] বুখারী- হাঃ ৩৯, নাসাঈ- হাঃ ৫০৩৪, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৩৫১, শুয়াবুল ঈমান- হাঃ ৩৫৯৮।
[১৮৬] ছহীহ বুখারী- হাঃ ৬৯, ২২৬৯, মুসলিম- হাঃ ৪৬২৬, আবু দাউদ- হাঃ ৪৮৩৭, আদাবুল মুফরাদ- হাঃ ২৪৫, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২১৩৬, ১২৩৩৩, মু'জামুল কবীর- হাঃ ১০৯৭৩, মুসনাদে আবি ইয়ালা- হাঃ ৭৩১৯, শুয়াবুল ঈমান- হাঃ ৭৯৩৪।

এক মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাক সিদ্ধ নয় ঃ

তালাক সম্পর্কে সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হয়ে ক্ষিপ্র গতিতে চুড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা শরীয়তের অনুমোদিত আচরণ নয়। কেননা, শরীয়ত কখনো আকস্মিক বা তড়িৎ তালাকের শিক্ষা দেয়নি, শরীয়ত পক্রিয়ামুলক তালাকের শিক্ষা দিয়েছে। যাতে এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে চিন্তা-ভাবনার সমান সুযোগ ভোগ করতে পারে। ইসলামের সূচনালগ্ন হতে আজ অবধি কোন সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে' তাবেয়ী, ইমামে মুজতাহিদ বা কোন শরিয়া বিশেষজ্ঞ বিদ্বান এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন নি। তালাক দেওয়া যদি একান্তই অপরিহার্য হয়, তাহলেই নিরুপায়ের উপায় হিসেবে স্ত্রী যেই সময়ে ঋতুমুক্তা ও পরিচ্ছন্না হবে, সেই সময়ে যৌন মিলনের পূর্বেই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বামী তাকে পন্থা মোতাবেক এক তালাক প্রদান করবে আর স্ত্রী তালাকের ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামীগৃহে অপেক্ষা করবে। তালাকের এই বিধি-বিধান সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। এস্থানে এক মজলিসে তিন তালাক অসিদ্ধ হওয়ার কতিপয় দলিল আলাদা ভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

১ম দলিল ঃ

একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাকের অবৈধতা পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

'হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন। আর আপনার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে ভয় করুন।'[১৮৭]

আয়াতের মুল তাৎপর্য এই যে, তালাক দিতে হবে নারীর পরিচ্ছন্না অবস্থায় সহবাসপূর্ব প্রতি তুহরে (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে), অর্থাৎ এক তুহরে এক তালাক, তার পরবর্তী তুহরে আরেক তালাক, এরকম পৃথক পৃথকভাবে। পাশাপাশি ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রাখা ও ইদ্দত গণনা করাও অপরিহার্য। এটাই শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা। যদি একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক বৈধ গণ্য করা হয় তাহলে এই নির্দেশনা একেবারে অমুলক হয়ে যায়। যা শরীয়তে মোটেও কাম্য নয়। পাশাপাশি রাজয়ী তালাকদ্বয় তথা যে দুটি তালাকের পর স্ত্রীকে পূণঃ গ্রহন করা যায় কুরআনে বর্ণিত উক্ত বিধানটিও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়। সুতরাং কুরআন লঙ্ঘিত বিধানকে বৈধ সাব্যস্ত করা বস্তুত কুরআন লঙ্ঘনকেই বৈধ করার শামিল। হ্যাঁ, একত্রিত তিন তালাক

[১৮৭] সুরা ত্বালাক ঃ ১।

অজ্ঞতাবশতঃ দেয়া হলে তা যদি এক তালাক গণ্য করা হয় তাহলে উক্ত আয়াতের সাথে আর কোন বিরোধ থাকে না, বরং এর পোষকতায় বহু বিশুদ্ধ হাদিসও মজুদ রয়েছে। যা গ্রন্থনার যথাস্থানে আলোকপাত করা হবে।

২য় দলিল ঃ

সুরা বাক্বারাহর নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর ও তাৎপর্য দলনিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে তিন তালাক একসঙ্গে উচ্চারণ করা অবৈধ হওয়া ও তালাক পৃথক পৃথক তুহরে সহবাসের পূর্বে উচ্চারণীয় হওয়া সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

'তালাক (প্রত্যাহারযোগ্য) দু'বার। তারপর হয় পুরোদস্তুর রক্ষণ নয়ত হৃদ্যতার সহিত বিদায়।'[১৮৮]

(১) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহঃ স্বীয় 'তাফসীরে মাযহারী'তে উদ্ধৃত আয়াতের দীর্ঘ ব্যাখ্যার একাংশে উল্লেখ করেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তালাক দিতে হবে একটি একটি করে। অর্থাৎ তালাককে শরীয়ত সম্মত করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন তুহরে (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী পবিত্র অবস্থায়) পর্যায়ক্রমে দু'টি তালাক প্রদান করতে হবে। একসাথে দুই তালাক দেয়া যাবে না। এখানে 'মার্‌রতান' শব্দটিকে কেবল দ্বিবচন মনে করলে হবে না, মনে করতে হবে একের পর এক, এভাবে দুইবার। যেমন পবিত্র কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (অতঃপর দৃষ্টি ফেরাও দু'বার), একথার অর্থ দৃষ্টি ফেরাও একবার, তারপর আরেকবার- এভাবেই দু'বার। এখানে দু'টি দৃষ্টিপাতই হতে হবে পৃথক পৃথক সময়ে; একই সময়ে নয়। আর একই সময়ে তো দু'বার দৃষ্টিপাত করা সম্ভবই নয়। সুতরাং দু'টি তালাকই হতে হবে পৃথক পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।[১৮৯]

(২) মুফতি মুহাম্মদ শফি রহঃ স্বীয় তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে 'তাফসীরে রুহুল মা'আনী'র বরাত দিয়ে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন, উদ্ধৃত আয়াতে 'মার্‌রতান' শব্দ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, একসঙ্গে দুই তালাক দেওয়া উচিৎ নয়। বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথক ভাবে দুই তালাক দেওয়াটাই শরীয়ত সম্মত। 'আত্‌ তালাকু তালাকান' এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু 'মার্‌রতান' শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক ভাবে হওয়া জরুরী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি একবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার

[১৮৮] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।

[১৮৯] তাফসীরে মাযহারী- ১ম খন্ড, পৃঃ ৫২৪।

দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কুরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া।[১৯০]

(৩) 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল (IRFI)' এর সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত শরিয়াবিদ ইব্রাহীম বি. সায়েদ পিএইচ.ডি. এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি তাঁর 'Triple Talaq' শিরোনামের এক আর্টিকেলে মাওলানা ওমর আহমদ উসমানীর বরাত দিয়ে উক্ত আয়াতের ব্যাপারে লিখেন, 'আত্ তালাকু মার্‌রতান' এর মর্মার্থ হল তালাক উচ্চারিত হবে দুইবারে। তিনি বলেন, 'মার্‌রতান শব্দটি পৃথক দুটি তালাক উচ্চারণের মাঝখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময়ের দূরত্ব নির্দেশ করে। যেমন বলা হয়ে থাকে, আমি দুইবার তোমার বাড়ি অবধি গিয়েছি, কিন্তু তুমি সেখানে ছিলে না। এখানে কিছু সময়ের দূরত্ব বুঝানো ছাড়া একবারে দুইবার যাওয়া বুঝানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমি প্রথমবার তোমার বাড়ি অবধি গিয়েছি, কিন্তু তুমি সেখানে ছিলে না, পরে আবার গিয়েছি, তখনও ছিলে না। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুটি তালাক উচ্চারণের কথা বলা হয়েছে।

(৪) তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে,

حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرءان، ثم قال الله تعالى ذكره في الثالثة:"إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان"

'প্রখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রহঃ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষ তার স্ত্রীকে পরিচ্ছন্না অবস্থায় সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। অতঃপর যখন স্ত্রী ঋতুবতী হয়ে পুণঃ পবিত্র হবে তখন তার এক 'কুরু' সমাপ্ত হবে। তারপর (সংশোধন না হলে) দ্বিতীয় তালাকটি প্রথম তালাকের মত করে প্রদান করবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয় ঋতুকালটিও সম্পন্ন হবে তখন স্ত্রী দুই তালাক প্রাপ্ত হবে আর দুই 'কুরু' সমাপ্ত হবে। তারপরেই আল্লাহ তা'য়ালা তৃতীয় তালাকের কথা বলেছেন, আর তা হলো "إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان"।'[১৯১]

[১৯০] তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহঃ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫২৮।
[১৯১] তাফসীরে তাবারী- ৪/৫৩৮।

৩য় দলিল ঃ

কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত বিধান যেহেতু পরিচ্ছন্না অবস্থায় সহবাসপূর্ব প্রতি তুহরে এক তালাক দেওয়া, সেহেতু এর বিরুদ্ধাচরণ অবশ্যই বিদআত হিসেবে পরিগণ্য। এইজন্য সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রকারের তালাককে 'তালাকে বিদআহ' নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আর এ কথাও অনস্বীকার্য যে, শরীয়তের নামে সৃষ্ট বিদআত সর্বদা প্রত্যাখ্যাত। যেমন,

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

'হযরত আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, যদি কেউ আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।'[১৯২]

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

'হযরত আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করল যা আমাদের ধর্মে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।'[১৯৩]

একবার প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যান আর বলেন,

ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق

'লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যারা এরূপ কোন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যদিও তা একশতবার করা হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সত্য ও সুদৃঢ়।'[১৯৪]

৪র্থ দলিল ঃ

عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

'হযরত আব্দুল্লাহ (বিন মাসউদ) রাঃ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন সহবাসমুক্ত পবিত্র অবস্থায় (তুহরে) তালাক প্রদান হচ্ছে যথার্থ নিয়মের (সুন্নাত) তালাক।'[১৯৫]

[১৯২] বুখারী- হাঃ ২৬৯৭, মুসলিম- হাঃ ১৭১৮, আবু দাউদ- হাঃ ৪৬০৬, আহমদ- হাঃ ২৩৯২৯।
[১৯৩] মুসলিম- হাঃ ৪৫৯০, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৫১২৮, ২৫৪৭২, দারাকুতনী- হাঃ ৮০, ৮১।
[১৯৪] বুখারী- হাঃ ২০৪৭, ২৪২১, ৪৪৪, ২৫৮৪, মুসলিম- হাঃ ৩৮৫০, আবু দাউদ- হাঃ ৩৯৩১, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৪৫২২, ২৬৩৩৫, দারাকুতনী- হাঃ ৭৭।
[১৯৫] বুখারী- হাঃ ২০১০, ইবনে মাজাহ- হাঃ ৬৫১।

৫ম দলিল ঃ

عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها

'হযরত আব্দুল্লাহ রাঃ তালাক পদ্ধতি সম্পর্কে বলেনঃ স্বামী স্ত্রীকে তার (সহবাসমুক্ত) প্রতি তুহরে এক তালাক দিবে এবং সে তৃতীয় তুহরে পৌঁছলে তাকে শেষ তালাক দিবে।'[১৯৬]

৬ষ্ঠ দলিল ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাঃ যুগে স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেন। তখন হযরত ওমর রাঃ উক্ত বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি সাঃ ওমর রাঃ কে নির্দেশ দেন, আপনি আব্দুল্লাহকে বলুন সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং পরবর্তী তোহর পর্যন্ত আপন ঘরেই রেখে দেয়। অতঃপর সে যখন পূণরায় ঋতুবতী হওয়ার পর পূণঃ ঋতুমুক্তা হবে, তখন ইচ্ছে হলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হল তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ইদ্দত যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'[১৯৭]

এই হাদিসটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তালাক উচ্চারণের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির অবজ্ঞা হওয়ার কারনে রাসুলুল্লাহ সাঃ হযরত ওমর রাঃ কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ যেন তাঁর স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং সেই সাথে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন যথার্থ পদ্ধতিতেই তালাক প্রদান করা হয়।

৭ম দলিল ঃ

একই সময়ে প্রদত্ত তিন তালাক যে শরয়ী রীতির প্রতিকূল, তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত হাদিসটিও যথেষ্ট হতে পারে।

---

[১৯৬] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০২১।

[১৯৭] বুখারী- হাঃ ৪৯৫৩, মুসলিম- হাঃ ৩৭২৫, আবু দাউদ- হাঃ ২১৮১, ২১৮৭, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৫২৯৯, মুয়াত্তা মালেক- হাঃ ২১৩৯, দারেমী- হাঃ ২২৬২।

محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله

'মাহমুদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ অবগত হলেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। এটি শুনে রাসুলুল্লাহ সাঃ অতিশয় রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর বললেন, আমি এখনো তোমাদের মাঝে বর্তমান আছি, তথাপি কি আল্লাহর কিতাবের সাথে বিদ্রুপ করা হচ্ছে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি কি তাকে হত্যা করব না?'[১৯৮]

এ হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ক্রোধ ও গযবের কারন। যারা একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে বৈধ বলে থাকেন, তারা কি করে মেনে নিয়েছেন যে, যে কাজটি আল্লাহর কিতাব নিয়ে উপহাস করার শামিল এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ক্রোধের কারন, রাসুলুল্লাহ সাঃ সে কাজের সাথে সম্মত হয়েছেন? অপ্রিয় হলেও অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সমাজের প্রচলিত তালাক ব্যবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অভিপ্রায়কেই কোরবানী দেয়া হয়েছে। যে কাজটি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ক্রোধের কারন, সে কাজটিকেই শরয়ী আইন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কাজের দরুন রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র হৃদয় জর্জরিত হয়, সে কাজ কখনো বৈধ হতে পারে না। আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের গযব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

পরিশিষ্টঃ দলিল হিসেবে উত্থাপিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহের উদ্দেশ্য একেবারেই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, যাতে দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনে কোনরূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়ে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় থাকে, সে লক্ষ্যে তালাক প্রদানের কার্যকে বিলম্বিত করা এবং স্ত্রী ও স্বামীকে উভয়ের মনোভাব স্থির করার জন্য অবসর দেয়াই আল্লাহ ও তদীয় রাসুল সাঃ এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিবেকের দাবিও তাই। মূলত যুগপৎ তিন তালাকের বৈধতা এবং তা তিন তালাক কার্যকরী সাব্যস্ত করা শরীয়তের এই মহান উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করে দেয়। এতে স্বামী স্ত্রীর পরিতাপ ও অনুশোচনাকে যেমন অবমুল্যায়ন করা হয়, তেমনি কৃত ভুল শুধরে নেয়ার যে সুযোগ পবিত্র কুরআনে একাধিকবার দেয়া হয়েছে, সে সুযোগ থেকেও তাদের একেবারে বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাদের তিল তিল সাধনায় সাজানো সুন্দর সংসার আর নিরপরাধ কোমলমতি সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ ঢলে পড়ে অন্ধকারের অতল গহ্বরে।

---

[১৯৮] নাসাঈ- হাঃ ৫৫৯৪।

সুতরাং বলা যায়, যুগপৎভাবে তিন তালাক প্রদান করা কেবল বিধি বহিঃর্ভূত বা গা-জোরি আচরণই নয়, যথেষ্ট নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে।

একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাকে এক তালাক কার্যকর হয় ঃ

একসাথে তিন তালাক উচ্চারণকে ইসলামী পরিভাষায় 'তালাক ই বিদআহ' বলা হয়। বস্তুতঃ এই প্রকারের তালাক যে শরীয়তের বিধি পরিপন্থী ও অবৈধ, এ সম্মন্ধে সম্মানিত সাহাবাগণের মাঝেও কোনরূপ মতভেদ ছিল না। বরং এক ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে শুনে এক সাহাবী তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হন।[১৯৯] আর এক মুখে একত্রে তিন তালাক উচ্চারণ করলে যে তিন তালাকই প্রযোজ্য হবে, এ ধরনের কোন আইনও নবীজী মুহাম্মদ সাঃ এর যুগে ছিল না। এমনকি প্রথম যুগের কোন সাহাবীর মুখ থেকেও একথা উচ্চারিত হয় নি। এটি মুলত ইসলাম পূর্ণতা লাভ করার বহু পরে হযরত ওমর রাঃ এর শাসনামলের তৃতীয় বর্ষে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রস্তাবিত তাঁর একটি সাময়িক সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। বিশ্ববিখ্যাত শরিয়াবিদ ড. আব্দুর রহমান ডোই বলেন, নবীজী সাঃ এর ওফাতের বহু পরে তালাকের এক নতুন নিয়ম উদ্ভাবিত হয় যে, স্বামী একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করে বা লিখে দেয়। এই প্রকারের তালাকে অনুতাপ বা পূণর্বিবেচনার কোন সুযোগ নেই। অজ্ঞ মুসলমানেরা এইভাবে পাপ করে। নবীজী সাঃ তীব্রভাবে এতে বাধা দিয়েছেন।[২০০]

এক্ষণে, একত্রিত তিন তালাকে এক তালাক হওয়ার পোষকতায় দলিল প্রমাণাদি ও একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার নেপথ্য ইতিহাস এবং ইতিহাসের পোষকতায় দলিল প্রমাণাদি পেশ করতে যাচ্ছি।

১ম প্রমাণ ঃ

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

'তালাক (প্রত্যাহারযোগ্য) দু'বার। তারপর হয় পুরোদস্তুর রক্ষণ নয়ত হৃদ্যতার সহিত বিদায়।'[২০১]

(১) উল্লেখিত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে আহসানুল বায়ান' এ বলা হয়েছে, আয়াতে মহান আল্লাহ 'তালাকাতান' (দু'তালাক) বলেন নি, বরং বলেছেন, 'আত্ তালাকু মার্‌রতান' (তালাক দু'বার)। এ থেকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একই সময়ে দুই

[১৯৯] নাসাঈ- হাঃ ৫৫৯৪।
[২০০] শরিয়াহ; দি ইসলামিক ল'- পৃঃ ১৭৯।
[২০১] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।

বা তিন তালাক দেওয়া এবং তা কার্যকরী গণ্য করা মহান আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। মহান আল্লাহর হিকমতের দাবি হল, একবার তালাক দেওয়ার পর (তাতে 'তালাক' শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার প্রয়োগ করুক) এবং অনুরূপ দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর (তাতেও 'তালাক' শব্দ একবার প্রয়োগ করুক বা একাধিকবার প্রয়োগ করুক) স্বামীকে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ত্বরান্বিত ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃত কর্ম সম্বন্ধে পূণর্বিবেচনা করার সুযোগ দেওয়া। আর এই হিকমত এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেওয়া তিন তালাককে তিন তালাক কার্যকরী সাব্যস্ত করে চিন্তা-বিবেচনা ও ভুল সংশোধনের পথ একেবারে রুদ্ধ করে দিলে মহান আল্লাহর সেই উদ্দিষ্ট হিকমত আর অবশিষ্ট থাকে না।[২০২] এ হলো এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তার বিধান। আর তিন তালাক এক শব্দে দিলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন তাফসীরে শা'রাভীতে উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

فالآية نصها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات، وإنما هي طلقة واحدة

'অত্র আয়াত এ কথাটির সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত দলিল যে, এক শব্দে তিন তালাকে তিন তালাক পতিত হয় না, বরং তাতে এক তালাক পরিগণ্য হয়।'[২০৩]

(২) হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন,

قوله ثلاثا لا معنى له : لأنه لم يطلق ثلاث مرات

'এই একত্রিত তিন তালাকের কোন মানেই হয় না। কেননা, এই তালাক তিনবারে দেয়া হয়নি।'[২০৪]

(৩) তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে,

وهو اختيار كثيرٍ من علماء أهل البيت أنَّه لو طَلَّقها اثنتين أو ثلاثاً ، لا يقع إلاَّ واحدة

'অধিকাংশ ওলামায়ে ইসলাম এ সিদ্ধান্তই গ্রহন করেছেন যে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে একসঙ্গে দুই তালাক বা তিন তালাক দেয়, তাহলে তা কেবল এক তালাকই গণ্য হবে।'[২০৫]

[২০২] তাফসীরে আহসানুল বায়ান- পৃঃ ৬৪।
[২০৩] তাফসীরে শা'রাভী- ১/৬১৭।
[২০৪] ফাতাওয়া আল কুবরা- ৩/২৫২, আল জামে' লিআহকামিল কুরআন- ৩/১৩২।
[২০৫] তাফসীরে কাবীর- ২/২৪৭।

(৪) এছাড়াও, ইমাম আবু দাউদ রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এর ফতওয়া সনদ সহ সংকলন করেছেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়্যুব হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি ইবনে আব্বাস রাঃ হতে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

'ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রিতভাবে তিন তালাক প্রদান করে বসে, তাতে এক তালাকই বলবৎ হবে।'[২০৬]

২য় প্রমাণ ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

'হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন। আর আপনার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করুন।'[২০৭]

সুরা বাক্বারাহ এর উপরোল্লেখিত আয়াত ও সুরা ত্বালাকের অত্র আয়াতে তালাক সম্বলিত যে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম বায়হাক্বী রহঃ প্রমুখগণ স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন,

فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর সিদ্ধান্ত ছিল, নিশ্চয় তালাক প্রতি তুহরে ভাগ ভাগ করে দিতে হবে। এই সুন্নত সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা এই যে, 'অতঃপর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের (একান্ত নিরুপায় হলে) তালাক দাও, তবে ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে।'[২০৮]

উদ্ধৃত আয়াতের তাৎপর্যের পোষকতায় ইমাম ত্বাবরানীও ইবনে আব্বাস রাঃ হতে নবী সাঃ এর হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন,

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق إلا لعدة ولا عتاق إلا لوجه الله

[২০৬] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৯, নাসাঈ- হাঃ ৩৪০৬।

[২০৭] সুরা ত্বালাক ঃ ১।

[২০৮] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৩৮৭, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭৬৪।

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাঃ হতে বর্ণনা করেছেন, কোন তালাকই বিশুদ্ধ নয় ইদ্দতের অবকাশ ব্যতীত এবং কোন দাসত্বমুক্তি বিশুদ্ধ নয় যদি না তা আল্লাহর জন্য হয়।'[২০৯]

এছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে,

حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: الطلاق للعدّة طاهرًا من غير جماع

'...হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তালাক হচ্ছে সহবাস পূর্ব পরিচ্ছন্না অবস্থায় প্রদত্ত ইদ্দতের তালাক।'[২১০]

এমতাবস্থায় একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা হলে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সমূহের তাৎপর্যের সাথেও চরমভাবে উপহাস করা হয়। কেননা, উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসের মুল নিহিতার্থই যেখানে নারীর ইদ্দত পালনের অবকাশ রাখা, ইদ্দত গণনা করা ও আল্লাহর বিধি বিধান পালনে আল্লাহকে ভয় করা, সেখানে একসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক কার্যকরী ধরা হলে উক্ত তাৎপর্যসমূহের কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকে না। এছাড়াও, সুরা ত্বালাকের উল্লেখিত আয়াত ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত হাদীস সমূহের মুল নিহিতার্থ একেবারেই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে তালাকের বিধান প্রদান করেছেন, তা কেবলই ইদ্দতের তালাক, আকস্মিক বা যুগপৎ তালাক নয়। ইদ্দত নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই মীমাংসা করে নিতে হবে যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে শান্তি পূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে, না চিরদিনের মত তাকে পরিহার করবে। তিন তালাক একত্রিতভাবে বলবৎ করতে গেলে কুরআনের এই উদ্দেশ্যটিও ব্যর্থ হয়ে যায়। কারন ইদ্দত গণনার কোন অবসর এমতাবস্থায় থাকে না। আয়াতের শেষাংশে এই মুহলত দেওয়ার ও তালাকের শেষকে বিলম্বিত করার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তালাকের পর স্বামী স্ত্রী উভয়ের মনে অনুশোচনার সঞ্চার হতে পারে, তাই পুণর্মিলনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তালাকের যুগপৎ প্রয়োগ আয়াতের এ বিধানটিও লঙ্ঘন করে।

সুতরাং একথাই প্রতীয়মান যে, তালাকের আকস্মিক ও যুগপৎ প্রয়োগ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের সরাসরি পরিপন্থি এবং এই পদ্ধতিতে তালাকের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। অনুশোচনা ও পুণর্মিলনের সমুদয় সম্ভাবনা নিমেষেই খতম হয়ে যায়। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাঃ সাহাবী রুকানাকে তার একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে পুণঃগ্রহন করতে আদেশ করেছিলেন। সেইসাথে এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআন দ্বারা

[২০৯] ত্বাবরানী- হাঃ ৭২৫২, জামেউল আহাদিস- হাঃ ৪৩০।

[২১০] তাফসীরে তাবারী- ২৩/৪৩২।

কোন সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে ভিন্ন কোন দলিল দ্বারা তা লঙ্ঘনের সুযোগ নেই। ইমাম শাফেয়ী রহঃ যথার্থ বলেছেন,

ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها فإن قيل من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول وفرض علينا الأخذ بقوله

'পবিত্র কুরআনে দ্বীনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। রয়েছে যথার্থ হেদায়াত ও নির্দেশনা। আর যদি কোন বিধি-বিধান সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেক্ষেত্রেও তা বাস্তবে কুরআন দ্বারাই হয়েছে বলবো। কেননা, কুরআন আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অনুসরণ ওয়াজীব করেছেন এবং তাঁর বাণী গ্রহন করাও ফরয করেছেন।'[২১১]

৩য় প্রমাণ ঃ

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন করেছো এবং নারীরা তোমাদের কাছে থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।'[২১২]

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে مِّيثَاقًا غَلِيظًا তথা 'সুদৃঢ় অঙ্গীকার' বলে অবহিত করেছেন। মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে যে অঙ্গিকার 'সুদৃঢ়' তা নিশ্চয় এতটা ঠুনকো হবে না যে, তালাক! তালাক! তালাক! এ তিনটি শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই সবকিছু মুহুতের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কুরআনের অন্য একাধিক আয়াতেও (২ ঃ ২৩৫, ২৩৭) পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে عُقْدَةُ النِّكَاحِ 'বিবাহ-গ্রন্থি বা বিবাহ-গিট' বলা হয়েছে। আর আমরা জানি, শক্ত কোন গিট খুলতে গেলে অবশ্যই গিট খুলার পদ্ধতি মেনে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট উপায়ে গিট খুলে নিতে হয়। আচমকা টান দিলে গিট আরও জটিল হয়। অনুরূপ চটজলদি তালাকেও পরিস্থিতি আরও জটিল ও সংকটময় হওয়া ছাড়া কিছুই হয় না।

এছাড়াও, উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন,

قوله عليه السلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله

'রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমরা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত আমানত হিসেবেই গ্রহন করেছো।'[২১৩]

[২১১] আল ইতক্বান- ২/৩৩১, ক্বাওয়াতিউল আদিল্লাহ- পৃঃ ২৯।
[২১২] সুরা নিসা ঃ ২১।
[২১৩] আল জামে' লিআহকামিল কুরআন- ৫/১০৩।

৪র্থ প্রমাণ ঃ

ইমাম মুসলিম রহঃ তাঁর সহিহ গ্রন্থে আব্দুর রায্যাকের প্রমুখাৎ, তিনি তাউসের পুত্রের বাচনিক এবং তিনি স্বীয় পিতার নিকট হতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে আর হযরত আবু বকর রাঃ এর সময়ে এবং হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর কাল পর্যন্ত একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক হিসেবেই গণ্য হত। তারপর হযরত ওমর রাঃ বললেন, যে বিষয়ে জনগণকে মুহলৎ দেয়া হয়েছিল, তারা এটাকে ত্বরান্বিত করেছে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তাদের উপর তিন তালাকের বিধান জারী করে দেই, তাহলে উত্তম হয়। অতঃপর হযরত ওমর রাঃ সে ব্যবস্থাই প্রবর্তিত করলেন।'[২১৪]

৫ম প্রমাণ ঃ

ইমাম মুসলিম রহঃ পূণঃ আব্দুর রায্যাকের প্রমুখাৎ রেওয়াত করেছেন, তিনি বলেন, ইবনে জুরায়েজ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতার উক্তি রেওয়ায়েত করেছেন,

أن أبا الصهباء قال لابن عباس اتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم

'আবু সাহবা রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর রাঃ এর যুগে এবং ওমর রাঃ এর শাসনামলের তিন বৎসরকাল পর্যন্ত একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো? হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।'[২১৫]

ইমাম আবু দাউদ রহঃও এই হাদীসটিকে তাঁর নিজস্ব সনদে আব্দুর রায্যাক ও ইবনে

[২১৪] মুসলিম- হাঃ ৩৭৪৬। আরও দেখুনঃ মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৮৭৫, দারাকুতনী- হাঃ ১৩৭, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭৪৯, মু'জামুল কাবীর- হাঃ ১০৯৩৮, বুলুগুল মারাম- ৪২২ পৃঃ।
[২১৫] মুসলিম- হাঃ ৩৭৪৭।

জুরায়জের রেওয়ায়েতে হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিতে স্বীয় সুনানে সন্নিবেশিত করেছেন।[২১৬]

লক্ষণীয় যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে ও হযরত আবু বকর রাঃ এর শাসনামলে এবং হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর খিলাফতের তিন বৎসরকাল পর্যন্ত যুগপৎভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার রীতি সম্পর্কিত হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর এই সাক্ষ্য শুধু আবু সাহবা-ই বর্ণনা করেন নি, ইবনে আব্বাস রাঃ এর ছাত্র তাউসও তা সরাসরিভাবে হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন। তাউসের নিকট হতে এই সাক্ষ্য দুই ব্যক্তি রেওয়ায়েত করেছেন। তারা হলেন একজন তাউসের পুত্র আব্দুল্লাহ, অপরজন ইব্রাহীম ইবনে মায়সারা। আবার ইবনে তাউসের প্রমুখাৎ ইবনে জুরায়জ ও আব্দুর রায্যাক সরাসরিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। পূণশ্চ, আবু সাহবা বর্ণিত হাদিস ইব্রাহীম ইবনে মায়সারার নিকট হতে আইয়ুব সখতিয়ানীও রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইবনে জুরায়জের বাচনিক আব্দুর রায্যাক তা রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং আবু সাহবার হাদিস যে প্রত্যেক স্তরে একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অতএব, আবু সাহবা বর্ণিত এই হাদিস সম্পর্কে কোন আপত্তিই গ্রহনযোগ্য হবার নয়।

৬ষ্ঠ প্রমাণ ঃ

ইমাম মুসলিম রহঃ পূণঃ স্বীয় সনদে হাম্মাদ ইবনে যায়েদের নিকট হতে এবং তিনি আইয়ুব সখতিয়ানীর নিকট হতে এবং তিনি ইব্রাহীম ইবনে মায়সারার নিকট হতে এবং তিনি তাউসের নিকট হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে,

أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذاك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم

'আবু সাহবা ইবনে আব্বাস রাঃ কে বললেন, আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত জবাবে আমাকে বলুন, রাসুলুল্লাহ সাঃ ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর যুগে একত্রিত তিন তালাক কি এক তালাক ছিল না? ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, একই ছিল, কিন্তু ওমর রাঃ এর যুগে যখন জনসাধারণ উপর্যুপরি একসঙ্গে তিন তালাক দিতে লেগে গেল, তখন হযরত ওমর রাঃ তাদের উপর তিন তালাকের আদেশ প্রয়োগ করলেন।'[২১৭]

---

[২১৬] আবু দাউদ- হাঃ ২২০২। আরও দেখুনঃ দারাকুতনী- হাঃ ৪/১৩৮, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক- হাঃ ১১৩৩৭, মু'জামুল কাবীর- হাঃ ১০৯৩৯।

[২১৭] মুসলিম- হাঃ ৩৭৪৮।

৭ম প্রমাণ ঃ

ইমাম আবু দাউদ রহঃ আব্দুর রায্যাকের হাদিস হতে, তিনি ইবনে জুরায়জের বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবু রাফে'র কোন পুত্র ইকরিমার নিকট হতে এবং তিনি ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন যে,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم وقالت ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة وإخوته وقال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل فقال راجع امرأتك أم ركانه فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)

'ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুকানার পিতা আব্দে ইয়াযীদ উম্মে রুকানা (রুকানার মা) কে তালাক প্রদান করেন এবং মুযায়না গোত্রের অন্য এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। উক্ত মহিলা একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজ মস্তক হতে একটি চুল উপড়ে অভিযোগ করল, এই চুল দ্বারা যেটুকু হয়, আব্দে ইয়াযীদের দ্বারা এর অতিরিক্ত আমার কার্যোদ্বার হয় না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। রাসুলুল্লাহ সাঃ উষ্মা বোধ করলেন এবং রুকানা ও তার ভাইদের আহ্বান করলেন। অতঃপর তিনি সাঃ সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, আব্দে ইয়াযীদের এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক অংশে আর এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক অংশে কি আব্দে ইয়াযীদের সৌ-সাদৃশ্য নেই? সকলেই বলল, অবশ্যই আছে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ আব্দে ইয়াযীদকে বললেন, তুমি একে তালাক দাও। আব্দে ইয়াযীদ তাই করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাঃ আব্দে ইয়াযীদকে আবার নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানা (রুকানা ও তার ভ্রাতাগণের মা) কে পুণঃগ্রহন করো। আব্দে ইয়াযীদ বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, তা আমি জানি, তুমি তাকে পুণরায় গ্রহন করো। এরপর তিনি সাঃ পবিত্র কুরআন হতে সুরা ত্বালাকের প্রথম আয়াত তিলাওয়াত করেন, হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ

অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।'[২১৮]

(হাদীসটির সনদে হালকা ত্রুটি আছে। তা সত্ত্বেও এটি কুরআনী আজ্ঞা ও অন্য বিশুদ্ধ হাদীসের অনুকূলে হওয়ায় বিশুদ্ধতা লাভ করেছে।)

৮ম প্রমাণ ঃ

ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা তাঁদের সনদ সহকারে বর্ণনা করতেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ ইবনে হুসাইনের বাচনিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইকরিমার প্রমুখাত রেওয়ায়েত করেছেন যে,

عن بن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দে ইয়াযীদের পুত্র রুকানা তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করেন। পরে স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হলে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কীরূপ তালাক দিয়েছ? রুকানা বললেন, একত্রিতভাবে তিন তালাক দিয়েছি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, ঠিক আছে, এই তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে। সুতরাং তুমি যদি মনে কর, তবে তাকে পূণঃ গ্রহন করতে পার। অতঃপর রুকানা তার (তিন তালাকদত্তা) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, অবশ্যই তালাক হতে হবে প্রতি তুহরে।'[২১৯]

হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম মহানায়ক হাফেজুল ইসলাম আল্লামা ইবনে হাজর আল আসক্বালানী রহঃ উক্ত হাদীসের ব্যাপারে বলেন,

وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات

[২১৮] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৮। আরও দেখুনঃ বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭৬৩, মুসান্নাফে আব্দ রায্যাক- হাঃ ১১৩৩৪।

[২১৯] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৩৮৭, মুসনাদে আবি ইয়ালা- হাঃ ২৫০০। আরও দেখুনঃ ফাতহুল বারী- ৯/৩৬২পৃঃ, বায়হাক্বী আল কুবরা- হাঃ ১৪৭৬৪, রাওজাতুল মুহাদ্দেসীন- হাঃ ১৮৫০, ইরওয়া আল গালীল- ৭/১৪৪পৃঃ, ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/২৬৯পৃঃ, ইগাছা- ১/২৮৭পৃঃ।

'হাফেয আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করেছেন। এই হাদীসটি বক্ষমান মাসআলার অকাট্য প্রমাণ। অন্যান্য রেওয়ায়েতগুলিতে যে সকল ত্রুটি বা পরোক্ষ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, এই হাদীসে সেগুলি নেই।'[২২০]

এখানে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, আব্দে ইয়াযীদের পুত্র রুকানা তার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করেছেন এবং তিনি তা নিজ মুখে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দৃষ্টিতে এটি সুন্নত পরিপন্থী হওয়ায় তিন তালাকরূপে গণ্য হয় নি। ফলে তাকে পূণঃগ্রহনের নির্দেশ দিলেন। এর চেয়ে বলিষ্ঠ দলিল কি হতে পারে?

৯ম প্রমাণ ঃ

ইমাম নাসাঈ রহঃ আবু দাউদ সুলাইমান বিন সাইফ এর প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি আবু আসেমের বাচনিক এবং তিনি জুরায়য হতে, তিনি ইবনে তাউস হতে, তিনি তাঁর পিতার উক্তি রেওয়ায়েত করেছেন,

أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم

'আবু সাহবা রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর নিকট এসে বললেন, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জানেন না, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে এবং হযরত আবু বকর রাঃ এর যুগে ও হযরত ওমর রাঃ এর প্রাথমিক যুগে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হতো? তিনি বললেন, হ্যাঁ।'[২২১]

১০ম প্রমাণ ঃ

আমাদের হানাফী মাযহাবেও একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার অভিমত রয়েছে। প্রখ্যাত হানাফী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রাযী রহঃ, তিনি একত্রিত তিন তালাকের ক্ষেত্রে এক তালাক হওয়ার ফতওয়া প্রদান করতেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত ফতওয়াসমূহ আল্লামা মাযেরী রহঃ স্বীয় 'মু'লিম বিফাওয়ায়েদে মুসলিম' গ্রন্থে এবং ইমাম আবু বকর রাযী রহঃ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহঃ হানাফী মাযহাবের প্রথম সারির ইমামগণের অন্যতম এবং ইমাম আ'যম রহঃ এর দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহঃ এর বিশিষ্ট ছাত্র।

[২২০] ফাতহুল বারী- ৯/৩৬২পৃঃ, আওনুল মা'বুদ ৬/২০০পৃঃ।

[২২১] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৯।

স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান রহঃ এর বাচনিকও এই ধরনের একটি ফতওয়া আলমগীরীতে বর্ণিত আছে। যেমন, ইব্রাহীম রহঃ ইমাম মুহাম্মদ রহঃ এর ফতওয়া নকল করেছেন,

رَوَى إِبْرَاهِيمُ عن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قِيلَ لِرَجُلٍ أَطَلَّقْت امْرَأَتَك ثَلَاثًا قال نعم وَاحِدَةً قال الْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ عليها ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَجْعَلُهَا وَاحِدَة

'ইব্রাহীম রহঃ ইমাম মুহাম্মদ রহঃ এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। একত্রে দিয়েছি। ইমাম মুহাম্মদ রহঃ বললেন, ক্বিয়াস সূত্রে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হয়েছে, কিন্তু আমরা ইসতিহসানের সাহায্য নেব (মানবিক বিবেচনা করব) এবং উক্ত তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করব।'[২২২]

এছাড়াও ইমাম মুহাম্মদ রহঃ স্বীয় 'আমালী'তে বলেছেন, কোন সাধারণ লোক এমনকি কোন বিষেশজ্ঞ ফক্বীহও যদি তার স্ত্রীকে বলে 'তোমাকে তিন তালাক বায়েন দিলাম' এবং তার মাযহাব অনুযায়ী সে যদি এটাকে তিন তালাক বায়েন মনে করে, কিন্তু সমকালীন কাযী যদি রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সেটাকে 'তালাকে রজঈ বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক' বলে ফায়সালা দেন, তাহলে তার জন্য উক্ত তালাকদত্তা স্ত্রীর সাথে নিঃসংকোচে ঘর করার অবকাশ রয়েছে।[২২৩]

অতএব, উল্লেখিত প্রমাণসমূহ নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের পর এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ আকস্মিকভাবে স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করলেও তা এক তালাক বলেই গণ্য হবে এবং এই এক তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পুরুষ ইচ্ছা করলে তার সেই তালাকদত্তা স্ত্রীকে বিনা বিবাহে পূণরায় গ্রহন করতে পারবে। আর যদি ইদ্দত নিঃশেষিত হয়ে যায়, তাহলে বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে এই নির্দেশনা স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[২২২] ফতোয়ায়ে হিনদিয়্যাহ- ১/৩৫৬পৃঃ, আলমগিরী- ২/৭০পৃঃ।
[২২৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ৩৩৬ পৃঃ, আল ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ- শেষ পৃষ্ঠা (কৃত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ), ফতোয়ায়ে ইয়াসআলুনাকা, ৪/২৮।

'আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ন করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা প্রদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আল্লাহ জানেন, তোমরাই জান না।'[২২৪]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর রহঃ এর বরাত দিয়ে হাফেজ ইবনু হাজর আল আসক্বলানী রহঃ লিখেন,

اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء

'কুরআনের ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে স্ত্রীর অভিভাবকগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।'[২২৫]

অতঃপর তিনি হাফিয ইবনুল মুনযির রহঃ থেকে আলী বিনে তালহার মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,

عن بن عباس هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعه وليها

'এই আদেশ এরূপ পুরুষ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং পূণর্মিলনের পূর্বে ইদ্দত নিঃশেষ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও স্বামী তার সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহন করতে চায় এবং স্ত্রীর ইচ্ছাও তাই, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবকগণ সেই পূণর্মিলনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।'[২২৬]

আপত্তি ও জবাব ঃ

যুগপৎ তিন তালাক সংশ্লিষ্ট আলোচনা এখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার স্বপক্ষে ইতিমধ্যে কুরআন হাদীস থেকে যেসব দলিল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি, সেগুলোর বিরুদ্ধেও বিরুদ্ধবাদীদের বহুবিধ আপত্তি রয়েছে। এস্থানে সেসব আপত্তি সমূহের সমুচিৎ জবাব পেশ করা হল।

আপত্তি ১ ঃ একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাকই গণ্য হবে। কেননা, এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এর ফতওয়া এরূপই ছিল। আর তাঁর যেসকল রেওয়ায়েত সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে,

[২২৪] সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৩২।
[২২৫] ফাতহুল বারী- ৮/১৯২পৃঃ।
[২২৬] ফাতহুল বারী- ৮/১৯২পৃঃ।

সেগুলো তাঁরই ফতওয়ার বিরোধী। কাজেই ইবনে আব্বাস রাঃ এর রেওয়ায়েতগুলির পরিবর্তে তাঁর ফতওয়াই অনুসরণীয় হবে।

জবাব ঃ এই আপত্তি গ্রাহ্য হতে হলে সর্বপ্রথম একটি মূলনীতি স্থিরিকৃত হওয়া আবশ্যক। তা হল, কোন সাহাবীর আচরণ বা ফতওয়া যদি তাঁর রেওয়ায়েতের বিপরীত হয়, সেক্ষেত্রে সাহাবীর ফতওয়া বা আচরণ অনুসরণীয় হবে, নাকি তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসই গ্রহণীয় হবে। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রেওয়ায়েতকারীর রেওয়ায়েতকেই গ্রহণীয় বিবেচনা করেন। কারন, যেহেতু হাদীসের ভিত্তিতে ফতওয়া হয়, ফতওয়ার ভিত্তিতে হাদীস হয় না, সেহেতু সকল ফতওয়া হাদীসের অনুকূলে হওয়া আবশ্যক। কেননা, হাদীস হল আসল আর ফতওয়া হল তার ফরা'। তাছাড়া কোন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য নির্ভূল হওয়া স্বাভাবিক হলেও তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এ কথা বলার উপায় নেই যে, তা সর্বদা সর্ববিধ নির্ভূল। এজন্য মূলনীতি হিসেবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন,

أن الصحابي إذا عمل بخلاف الحديث لم يحتج به واتبع عمل الصحابي والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله إذا خالف الحديث

'সাহাবী যদি রেওয়ায়েতের বিপরীতে আমল করেন এবং সাহাবীর সেই আমল যদি হাদীসের তুলনায়ও প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেক্ষেত্রে সাহাবী যা রেওয়ায়েত করেছেন তাই গ্রহণীয় হবে। রেওয়ায়েতের বিপরীত ফতওয়া গ্রহণীয় হবে না।'[২২৭]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ রহঃ আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন,

وعمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح في روايته والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث

'রেওয়ায়েতকারীর স্বীয় রেওয়ায়েতের বিপরীত আচরণের জন্য উক্ত হাদীসের কোন দোষ সাব্যস্ত হতে পারে কিনা? এ বিষয়ে ইমাম আহমদ রহঃ ও অধিকাংশ বিদ্বানগণের সুপ্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, হাদীসের কোন দোষ সাব্যস্ত হবে না। কারন হাদীসের ক্রটি ছাড়াও রেওয়ায়েতকারী স্বীয় রেওয়ায়েতের বিপরীত আমল করার অপরাপর বহুবিধ কারন থাকতে পারে।'[২২৮]

তিনি আরও বলেন,

قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله

[২২৭] ইগাছাতুল লাহফান, ১/২৯৩পৃঃ।
[২২৮] সিরাতে মুসতাক্বীম, ১/১২৯পৃঃ।

'সাহাবীর বক্তব্য দলিল নয়। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্যের বিপরীতে কিভাবে তাঁদের বক্তব্য দলিল হতে পারে?'[২২৯]

এছাড়াও হাদীস শাস্ত্রের ইমামকুল এই মুলনীতির উপর একমত যে, সাহাবীর মরফূ রেওয়ায়াত তাঁর নিজস্ব মতামতের বিপরীতে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। যেমন হাফেজ ইবনে হাজর রহঃ বলেন,

بان الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان

'এক্ষেত্রে রাবীর রেওয়ায়েতই গ্রহনীয় হবে। ফতোয়া গ্রহনীয় হবে না। কেননা, রাবীর ফতোয়ায় ভুলও থাকতে পারে।'[২৩০]

তাই উল্লেখিত মূলনীতির বশবর্তী হয়ে ইমাম আহমদ রহঃ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এর ফতওয়ার চেয়ে হাদীসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব ফতওয়ার দোহাই দিয়ে হাদীসকে কোনভাবেই উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

আপত্তি ২ ঃ যেই সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কিঞ্চিৎ ইশারায় প্রাণ উৎসর্গ করাকেও নিজের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের মনে করতেন, সেই সাহাবীগণ কিভাবে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীসের বিপরীতে ফতওয়া দিতে পারেন?

জবাব ঃ এই আপত্তিটিও প্রথম আপত্তির জবাব হতে পারে। যাই হোক, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ কেন তাঁর রেওয়ায়েতের বিপরীতে ফতওয়া দিয়েছিলেন সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা বিষয় পরিস্কার অবগত হওয়া জরুরী যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ তাঁর রেওয়ায়েতকৃত হাদীসের অনুকূলে কোন ফতওয়া পেশ করেছেন কিনা। যদি করে থাকেন, তাহলে কি সেই ফতওয়া তাঁর রেওয়ায়েত মোতাবেক হওয়া সত্ত্বেও পরিতাজ্য হবে নাকি গ্রহনীয় হওয়ার পাশাপাশি রেওয়ায়েত আরও দৃঢ়তা পাবে? এবার দেখা যাক, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ তাঁর রেওয়ায়েতের পোষকতায় আদৌ কোন ফতওয়া পেশ করেছেন কিনা। নিম্নে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্বন্ধে তাঁর তিনটি ফতওয়া সন্নিবেশিত হলঃ

১। ইমাম আবু দাউদ রহঃ হাম্মাদ ইবনে যায়েদের মাধ্যমে, তিনি আইয়ুব সখতিয়ানির নিকট হতে, তিনি ইকরিমার নিকট হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে,

عبد اللّٰه بن عباس رضي اللّٰه عنهما قال إذا قال أنتِ طالِقٌ ثلاثا بفَم واحد، فهي واحدةٌ

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ ফতওয়া পেশ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে তার

[২২৯] ইকতেযাউস সিরাত- ২৭৫ পৃঃ।
[২৩০] ফতহুল বারী- ৯/৩৬৩।

স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তালাক দিলাম! তোমাকে তালাক দিলাম! তোমাকে তালাক দিলাম! অর্থাৎ তিনবার, তাহলে তা এক তালাক গণ্য হবে।'[২৩১]

হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহঃ বলেন, এই বক্তব্যের সনদ বুখারীর শর্তের অনুরূপ। বিশুদ্ধতা ও গৌরবের দিক দিয়েও এই সনদ সর্ববিধ ত্রুটিমুক্ত।[২৩২]

২। ইমাম আব্দুর রায্যাক রহঃ স্বীয় সনদ সহকারে আইয়ুবের নিকট হতে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে,

عن أيوب قال دخل الحكم بن عيينة على الزهري بمكة وأنا معهم فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا فقال سئل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها وأخبره بقول الزهري قال فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة

'আইয়ুব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হাকাম ইবনে উয়ায়না ইমাম যুহরীর কাছে আগমন করলেন, আমিও (আইয়ুব সখতিয়ানি) তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হাকাম এরূপ একজন বিবাহিতা কুমারী সম্বন্ধে ইমাম যুহরীকে প্রশ্ন করলেন, যার স্বামী তার সাথে যৌন বিহারের পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিয়েছিল। যুহরী জবাব দিলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাঃ, আবু হুরায়রা রাঃ ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, আর তাঁরা সকলেই এই ফতওয়া দিয়েছিলেন যে, অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীকে তার স্বামী পুণরায় গ্রহন করতে পারবে না। আইয়ুব বলেন, হাকাম সেস্থান হতে প্রস্থান করে ইবনে আব্বাস রাঃ এর ছাত্র ত্বাউসের কাছে আসলেন। তখন তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। হাকাম তাঁকে উপরিউক্ত মাসআলা সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস রাঃ এর ফতওয়া কি জিজ্ঞেস করলেন এবং যুহরী যা বলেছেন তাও তাঁকে অবহিত করলেন। আইয়ুব বলেন, আমি দেখলাম, এ কথা শুনে ত্বাউস অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁর দুই হাত উত্তোলিত করে বলেন, আল্লাহর শপথ! ইবনে আব্বাস রাঃ তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করতেন।'[২৩৩]

৩। একত্রিত তিন তালাকের বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর রায় কিরূপ ছিল এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম বায়হাক্বী রহঃ প্রমুখগণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

---

[২৩১] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৯।
[২৩২] ইগাছাতুল লাহফান- ৩২৩, ২৮৭পৃঃ।
[২৩৩] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক- হাঃ ১১০৭৮। আরও দেখুন, আওনুল মাবুদ- ৬/১৯৫পৃঃ।

فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর অভিমত ছিল, নিশ্চয় তালাক প্রতি তুহরে ভাগ ভাগ করে দিতে হবে। এই সুন্নত সকল মানুষের উপর প্রযোজ্য ছিল এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা ছিল যে, 'অতঃপর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের (একান্ত নিরুপায় হলে) তালাক দাও, তবে ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে।'[২৩৪]

লক্ষ্যণীয়, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ প্রদত্ত যুগপৎ তিন তালাক এক তালাক গণ্য হওয়ার পোষকতায় উদ্ধৃত ফতওয়াগুলি পবিত্র কুরআনের فطلقوهن لعدتهن (৬৫:১) 'অতঃপর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের (একান্ত নিরুপায় হলে) তালাক দাও, তবে ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে।' আয়াতের তাৎপর্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, যুগপৎ তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা হলে ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রাখা, ইদ্দত গণনা করা আর তালাক সম্পর্কিত বিধি বিধান পালনে আল্লাহকে ভয় করা ইত্যাদি সম্বলিত যে নির্দেশনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এবার আসি, ইবনে আব্বাস রাঃ কেন তাঁর রেওয়ায়েতের বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান করেছেন। প্রথম জবাব হল, হযরত ওমর রাঃ যে কারনে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার আইন চালু করলেন, সেই একই কারনে হযরত ইবনে আব্বাস রাঃও উক্ত আইনবলে মত প্রদান করেছেন। কি কারনে হযরত ওমর রাঃ একত্রিত তিন তালাককে তিন গণ্য করার আইন চালু করলেন তার দালিলিক আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পেশ করব। দ্বিতীয় জবাব হল, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হযরত ওমর রাঃ এর সাথে একমত পোষণ করে মুলত শাসকের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কেননা তিনি জানতেন, এই আইন সাময়িক এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রণীত হয়েছে। হাফেজ ইবনুল কাইয়িম জাওযী রহঃ বলেন,

وعن ابن عباس فيه روايتان إحداهما موافقة عمر رضي الله عنه تأديبا وتعزيرا للمطلقين

'ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ বিষয়ে দু'ধরনের ফতওয়া রয়েছে। যার একটি হল হযরত ওমর রাঃ এর সাথে একমত হয়ে ফতওয়া প্রদান করা, যার উদ্দেশ্য ছিল শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং তালাকের অপব্যবহার কারীদের প্রতি কঠোর হওয়া।'[২৩৫]

প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এর প্রমুখাৎ দুই ধরনের ফতওয়াই বর্ণিত আছে। কতেক ফতওয়ায় তিনি একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক সাব্যস্ত রেখে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে হযরত ওমর রাঃ এর সাথে একমত পোষণ করেছেন

---

[২৩৪] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৩৮৭, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭৬৪।
[২৩৫] ইগাছাতুল লাহফান- ২৮৭পৃঃ।

এবং অপরাপর ফতওয়ায় তিনি যে সকল হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন সেগুলোর অনুকূলে অবস্থান নিয়ে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেছেন। এখন দেখার বিষয় হলো, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর সর্বশেষ চূড়ান্ত অবস্থান কি ছিল? সে সম্বন্ধে ইমাম আবু দাউদ রহঃ সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس

'অতঃপর ইবনু আব্বাস রাঃ তাঁর শেষোক্ত মত হতে প্রথম মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।'[২৩৬]

অতএব, হাদীসবেত্তাদের অবলম্বিত সূত্র অনুসারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় প্রকার ফতওয়া তথা কুরআনের আয়াত ও আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল রেওয়ায়েতের স্বপক্ষে পেশকৃত ফতওয়াই অগ্রগণ্য ও অনুসরণীয় হবে।

আপত্তি ৩ ঃ একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করাই ছিল সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত ও আমল। কাজেই যুগপৎ তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা নিঃসন্দেহে সাহাবীগণের সিদ্ধান্তের অন্যথাচরণ।

জবাব ঃ এই আপত্তির জবাব এটুকু বলাতেই যথেষ্ট হতে পারে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর শাসনকালের দীর্ঘ আড়াই বছর পর্যন্ত লক্ষাধিক সাহাবী একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাকরূপে গণ্য করতেন। আর এ বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হযরত ওমর ফারুক রাঃও তাঁদের সাথে একমত ছিলেন। তাহলে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করলে সাহাবীগণের অন্যথাচরণ হয় কিরূপে? প্রমাণ স্বরূপ, ইমাম মুসলিম রহঃ পূণঃ আব্দুর রায্যাকের প্রমুখাৎ রেওয়াত করেছেন, তিনি বলেন, ইবনে জুরায়েজ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতার উক্তি রেওয়ায়েত করেছেন,

أن أبا الصهباء قال لابن عباس اتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله

صلى الله عليه و سلم و أبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم

'আবু সাহবা রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর রাঃ এর যুগে এবং ওমর রাঃ এর শাসনামলের তিন বৎসরকাল পর্যন্ত একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হত? হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।'[২৩৭]

---

[২৩৬] আবু দাউদ- হাঃ ২২০০, ইরওয়াউল গালীল- ৭/১২১পৃঃ।

[২৩৭] মুসলিম- হাঃ ৩৭৪৭। আরও দেখুন, আবু দাউদ- হাঃ ২২০২, দারাকুতনী- ৪ খন্ড, হাঃ ১৩৮, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক- হাঃ ১১৩৩৭, মু'জামুল কাবীর- হাঃ ১০৯৩৯।

অতএব, একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করলে যে সাহাবীগণের নির্ধারণের বিরুদ্ধাচরণ হবে এ অভিযোগ অনুর্বর ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং সাহাবীগণের পক্ষাবলম্বনই প্রমাণিত হয়।

আপত্তি ৪ ঃ কোন কোন হযরাত দাবি করেছেন, হযরত আবু সাহবার হাদীসের সনদে অনিশ্চয়তা রয়েছে। সনদ সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি এই যে, এক সনদে হাদীসটি 'ত্বাউস আন ইবনে আব্বাস' রূপে আর অন্য সনদে তা 'ত্বাউস আন আবি সাহবা আন ইবনে আব্বাস' রূপে বর্ণিত হয়েছে।

জবাব ঃ এরূপ হওয়াতে হাদীসটি মোটেও ক্রটিযুক্ত হয়নি, বরং আরও সুদৃঢ় এবং ক্রটিমুক্ত হওয়ার পাশাপাশি গ্রহনযোগ্যতার দিক থেকে আরও একধাপ অগ্রগণ্য হয়েছে। কেননা, ত্বাউস হাদীসটি আবু সাহবার কাছ থেকেও শুনেছেন এবং স্বীয় শিক্ষক ইবনে আব্বাস রাঃ এর কাছ থেকেও শুনেছেন অর্থাৎ এক রেওয়ায়েতে হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে আবু সাহবা রাঃ বর্ণনা করেছেন এবং তা আবু সাহবা রাঃ নিকট হতে ত্বাউস বর্ণনা করেছেন। অপর রেওয়ায়েতে হাদীসটি ত্বাউস সরাসরি তাঁর শিক্ষক ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। অন্তত দুইজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য একই রূপ হলে তা সত্য বলেই গৃহীত হয়। তাছাড়া ইবনে আব্বাস রাঃ এর রেওয়ায়েতের কারনে আবু সাহবার রেওয়ায়েতের সত্যতাও প্রতিপাদিত হয়ে গেল। সুতরাং উক্ত হাদীসের সনদে অনিশ্চয়তা থাকা তো দূরের কথা, বরং আবু সাহবা রাঃ ও তাউস রহঃ উভয়ের সাক্ষ্য দ্বারা ইবনে আব্বাস রাঃ এর রেওয়ায়েত আরও বেশি সুনিশ্চয়তা লাভ করেছে।

এছাড়াও হাদীস শাস্ত্রের বহু শ্রুতিধর ইমাম ইবনে আব্বাস রাঃ এর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। পরম বিশ্বস্ত হাফেজুল হাদীস আব্দুর রায্যাক (১২৫–২১১) এই হাদীসটি 'আখবারানী' বলে শাব্দিকভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এরূপ মক্কার স্বনামধন্য ফকীহ, হাদীস শাস্ত্রের প্রথম প্রণেতাগণের অন্যতম ইবনে জুরায়েয (৮০–১৫০) আব্দুল্লাহ ইবনে তাউসের হাদীস হতে এটি শাব্দিকভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। সহিহ মুসলিমেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আপত্তি করা হবে কোন অধিকারে? এছাড়াও ইরাকের উসতাদ হাফেজুল হাদীস ইমাম হাম্মাদ (৯৮১–১০৭৯) সৈয়দুল ফুকাহা আইয়ুব সখতিয়ানীর নিকট হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনে মায়সারার নিকট হতে এবং তিনি তাউসের প্রমুখাৎ এই হাদীস রেওয়ায়েত করেন। স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে, তাউসের নিকট হতে আনআনা, আখবারা ও তাহদীস এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতেই এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাউসের এই হাদীসে তদীয় পুত্র আব্দুল্লাহ একক রাবী নন, আবার শুধু আব্দুর রায্যাক বা ইবনে জুরায়েযও এই হাদীস এককভাবে রেওয়ায়েত করেন নি। সুতরাং সনদের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উসূলে হাদীসের পরিপন্থী।

আপত্তি ৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর সূত্রে তাবেয়ী তাউসের বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, ইবনে আব্বাস রাঃ এর সাথে তাউসের সাক্ষাত প্রমাণিত হয়নি।

জবাব ঃ লক্ষণীয়, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর জন্ম হয় ৬১৯ খৃষ্টাব্দে পবিত্র মক্কায় এবং ওফাত হয় ৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তায়েফে। আর হযরত তাউস রহঃ এর ওফাত হয় ৭২৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং উভয় ক্ষণজন্মার ইহত্যাগের পার্থক্য ছিল মাত্র ৩৫ বছর।

হযরত তাউস রহঃ এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তঃ তিনি প্রথম সারীর তাবেয়ী এবং ইয়ামেনের শীর্ষ ফক্বীহ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবু আব্দির রহমান তাউস ইবনে কায়সান আল ইয়ামেনী। তিনি চল্লিশবার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন এবং মক্কায় হজ্ব পালনরত অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পঞ্চাশ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ পান। রিওয়ায়াত-দিরায়াত কোনটাতেই তাঁর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোন বিদ্বান কিঞ্চিৎও আপত্তি করেন নি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও মুসতাযাবুত দা'ওয়াত ব্যক্তি। তাঁর যানাজা পড়িয়েছেন হযরত হিশাম ইবনে আব্দুল মালেক রহঃ।[২৩৮]

এবার আসুন, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ ও তাঁর মাঝে ইহত্যাগের পার্থক্য ছিল মাত্র ৩৫ বছর। আর তিনি হজ্বব্রত পালন করেন চল্লিশবার। হজ্ব যেহেতু মক্কায় হয়, সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইবনে আব্বাস রাঃ এর ওফাতের পাঁছ বছর আগে থেকেই তাঁর মক্কা যাওয়া আসা শুরু হয়। এখন হযরত তাউস রহঃ যে ইবনে আব্বাস রাঃ এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে আসতেন তার প্রমাণ কী? প্রকৃতপক্ষে তাউস রহঃ ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এরই একজন যোগ্যতম ছাত্র এবং তাঁর থেকে তিনি হাদীসও গ্রহন করেছেন। যেমন,

'أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني من كبار التابعين والعلماء سمع ابن عباس وأن عمر وجابرا وغيرهم وروى عنه خلائق من التابعين واتفقوا على فضيلته ووفور علمه وحفظه وتثبته'

'আবু আব্দির রহমান তাউস ইবনে কায়সান আল ইয়ামেনী ছিলেন একজন শীর্ষ পর্যায়ের তাবেয়ী ও আলেম। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ, ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ, যাবের রাঃ প্রমুখগণের কাছ থেকে হাদীস গ্রহন করেছেন। তাঁর সূত্রে অন্যান্য তাবেয়ীগণ সেসব হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এবং সকলেই তাঁর ফযিলত সম্পর্কে একমত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতা, স্মরণ-সংরক্ষণ ও সেসবের প্রামাণিকতাতেও সকলেই একমত ছিলেন।'[২৩৯]

[২৩৮] তাবাক্বাতিল মুফাসসিরীন, কৃত আহমদ বিন মুহাম্মদ আল আদনারাবী- পৃঃ ১৩।
[২৩৯] মাওসুআতুল আ'লাম- পৃঃ ৩৩৫।

'أنه سمع من زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي هريرة، وزيد بن أرقم، وابن عباس، وهو معدود في كبراء أصحابه. وروى أيضا عن جابر، وسراقة بن مالك، وصفوان بن أمية، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعن زياد الاعجم، وحجر المدري، وطائفة'

'তিনি (তাউস) যায়েদ ইবনে ছাবিত, আয়েশা, আবু হুরায়রা, যায়েদ ইবনে আরকাম, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আজমাঈন) এর মত বড়মাপের সাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। এছাড়াও তিনি যাবের, সিরাকাত ইবনে মালেক, সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ, ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, যিয়াদ আল আযম, হিযর আল মিদরী, ত্বায়েফা (রাযিয়াল্লাহু আজমাঈন) প্রমুখগণের কাছ থেকেও হাদীস গ্রহন করেছেন।'[২৪০]

এবার দেখুন, স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাঃ স্বীয় ছাত্র হযরত তাউস সম্পর্কে কি বলছেন,

'عن ابن عباس إني لأظن طاووسا من أهل الجنة'

'হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, আমার মতে তাউস জন্নাতী।'[২৪১]

উল্লেখিত আসারটি বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে আবি রিবাহ রহঃ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, যাঁর সাথে সাক্ষাতই প্রমাণিত নয়, তাঁর সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস রাঃ এর মত ব্যক্তিত্ব এমন গতানুগতিক ধারণা করবেন কেন? অতএব, ইবনে আব্বাস রাঃ এর সাথে যে তাউসের সাক্ষাত হয়নি এই আপত্তিটিও সঠিক নয়।

আপত্তি ৬ ঃ একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ব্যতীত আর কোন সাহাবী রেওয়ায়েত করেন নাই, আর ইবনে আব্বাসের নিকট হতেও তাউস ছাড়া অন্য কোন তাবেয়ী এটি বর্ণনা করেন নাই।

জবাব ঃ আল্লামা হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম যওজী রহঃ এই আপত্তির যথার্থ জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال : إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل وإنما يحكي عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها قائل من الفقهاء قد تفرد الزهري بنحو ستين سنة لم يروها غيره وعملت بها الأمة ولم يردوها بتفرده

'আমরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে এমন একজনকেও জানিনা, যিনি একথা বলেছেন যে, যে হাদীসটি শুধু একজন সাহাবী রেওয়ায়েত করেছেন তা গ্রহনযোগ্য হবে

[২৪০] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৫/৩৯।
[২৪১] তাহযীবুত তাহযীব- ৫/৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৫/৩৯।

না। অবশ্য বিদআত অবলম্বী ও তাদের অনুসারীদের মাঝে এরূপ গাল-গপ্পের প্রচলন আছে। কিন্তু ফকীহগণের মধ্যেও কেউ এ কথা বলেন নি। ইমাম যুহরী রহঃ এককভাবে এরূপ অন্যুন ষাটটি সুন্নত রেওয়ায়েত করেছেন, যা অন্য কারো প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়নি। অথচ উম্মত সেগুলো গ্রহন করেছে এবং যুহরী রহঃ এককভাবে রেওয়ায়েত করেছেন বলে সে হাদীসগুলি কেউ প্রত্যাখ্যান করেন নি।'[২৪২]

আর এটিও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এরূপ বহু হাদীস রয়েছে যেগুলি তাউস অপেক্ষা নিম্নস্তরের রাবীগণ রেওয়ায়েত করেছেন, কিন্তু ইমামগণ সেসব হাদীস বর্জন করেন নি। তদুপরি, শুধু তাউস হযরত ইবনে আব্বাসের এই হাদীসের একক রেওয়ায়েতকারী নন, ইবনে আব্বাসের বিশিষ্ট ছাত্র ও মুক্ত ক্রীতদাস হযরত ইকরিমাও রুকানার হাদীস ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন এবং এটি তাউসের রেওয়ায়েতের পরিপোষক হওয়ার জন্য একেবারেই যথেষ্ট।

আপত্তি ৭ ঃ ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীসটি বিরলতা দোষে দূষণীয়, অর্থাৎ 'শায'।

জবাব ঃ এই হাদীসটি এবং এই প্রকারের যেকোন হাদীস কস্মিনকালেও 'শায' এর পর্যায়ভুক্ত নয়। এ বিষয়ে উসূল শাস্ত্রের জনক (১) ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث بل الشاذ أن يروي خلاف ما رواه الثقات

'কোন বিশ্বস্ত রাবী যদি তাঁর রেওয়ায়েতে একক হন, তজ্জন্য সে হাদীস 'শায' হয় না বরং বিশ্বস্ত রাবীদের বিরুদ্ধে যদি কেউ একক কোন হাদীস রেওয়ায়েত করে, বস্তুত সে হাদীসকেই 'শায' বলা হয়।'[২৪৩]

(২) হাদীস শাস্ত্রের আরেক দিকপাল হাফেজ ইবনে হাজর আল আসক্বলানী রহঃ 'শায' এর সংজ্ঞায় বলেন,

مخالفة المقبول لمن هو أولى منه

'মাকবুল রাবী কর্তৃক তারচেয়ে উত্তম রাবীর বিরোধিতা করাই হল শায।'[২৪৪]

(৩) জামে' তিরমিযীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে,

أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه

'শায হলো যখন কোন মকবুল রাবী তারচেয়ে উত্তম কোন রাবীর বিপরীতে রেওয়ায়েত করেন।'[২৪৫]

[২৪২] ইগাছাতুল লাহফান- ২৯৬ পৃঃ।
[২৪৩] ক্বাওয়ায়েদুত তাহদীস- ১/৫২পৃঃ।
[২৪৪] আন নুযহাহ- ১/৯৮পৃঃ।

(৪) মিশকাতুল মাসাবীহ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরআতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ما خالف فيه الراوي من هو أرجح وأوثق منه

'শায হলো কোন রাবীর তারচেয়ে অগ্রগণ্য ও বিশ্বস্ত কোন রাবীর বিরোধিতা করা।'[২৪৬]

ফলকথা, যদি তাউস অথবা ইকরিমার মধ্যে কেউ একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার হাদীস এককভাবেও ইবনে আব্বাস রাঃ এর প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করতেন, তথাপিও এই হাদীসকে 'শায' বলার উপায় ছিল না। কারন একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করতে হবে- রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রমুখাৎ এরূপ একটিও বিশুদ্ধ দ্ব্যর্থহীন হাদীস বিদ্বানগণ সম্মিলিতভাবে রেওয়ায়েত করেন নি। অতএব, এই আপত্তিটিও অবান্তর প্রমাণিত হল।

আপত্তি ৮ ঃ যুগপৎ তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা সম্বন্ধে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও হযরত আবু বকর রাঃ এর যুগের যে নির্দেশ তা হযরত ওমর রাঃ এর নির্দেশ দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। অথবা ইবনে আব্বাস রাঃ এর রেওয়ায়েত তাঁর ফতওয়া দ্বারা মনসূখ (রহিত) হয়ে গেছে।

জবাব ঃ এই প্রকারের দাবি ডাহা মিথ্যা, বাতিল ও অসম্ভব। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ওফাতের পর শরীয়তের কোন নির্দেশ মনসূখ হতে পারে না। জগদশুদ্ধ লোকেরও এ অধিকার নেই। পবিত্র কুরআনের বাণী,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'[২৪৭]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর

[২৪৫] তুহফাতুল আহওয়াযী- ২/৮৪।
[২৪৬] মিরআতুল মাফাতীহ- ১/৩৮৪।
[২৪৭] সুরা আহযাব ঃ ৩৬।

আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।'[২৪৮]

এছাড়াও যে দ্বীন রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপর পূর্ণতা লাভ করেছে,[২৪৯] সে দ্বীনের কোন বিধি-বিধান অন্য কারও নির্দেশ বা ফতোয়া দ্বারা বাতিল হতে পারে না। অতএব, কোন মর্দে মুমিনের মুখ হতে এরূপ অর্বাচীন আহমকী উক্তি নির্গত হওয়া ঈমানের জন্যও মারাত্মক আশংকার।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

'মস্তবড় সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে নির্গত হয়। তারা যা বলতেছে তা সর্বৈব মিথ্যা।'[২৫০]

আপত্তি ৯ ঃ এরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হয় যে, একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ব্যবস্থা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ পরিপন্থী ছিল।

জবাব ঃ আচ্ছা বলুন, একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ব্যবস্থা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কোন নির্দেশের পরিপন্থী ছিল? একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করতে হবে এরূপ কোন নির্দেশ কি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ছিল? তাহলে তিন তালাক একসঙ্গে প্রদান করলে তা বিদআত হবে কেন? রাসূল সাঃ এর দ্বারা কোন বিদআত কার্য সংঘটিত হতে পারে? তিন তালাক একসঙ্গে প্রদান করা যে বিদআত তা আজ অবধি কোন সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, আইম্মায়ে মুজতাহদীন এমনকি কোন মামুলি বিদ্বানও অস্বীকার বা দ্বিমত করতে পেরেছেন কি? রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কোন নির্দেশ এমনকি সাধারণ মৌন অনুমোদনও সুন্নাহ হয়ে যায়, কস্মিনকালেও বিদআত হতে পারে না।

বস্তুত, এই আপত্তি গ্রাহ্য হতে পারতো, যদি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর এরূপ কোন নির্দেশ থাকত যে, একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাকে তিন তালাকই সাব্যস্ত হয় অথবা তোমরা একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য কর। অথচ এর বিপরীত নির্দেশটাই মজুদ রয়েছে।[২৫১] এছাড়াও, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর সাক্ষ্য এই যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাঃ রুকানার তিন তালাকদত্তা স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[২৫২] এই সাক্ষ্য কি উপরিউক্ত আপত্তির অলীকতা সাব্যস্ত করে না? এছাড়াও এই হাদীস ইমাম আহমদ ও আবু ই'য়ালা স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং আবু

[২৪৮] সুরা নিসা ঃ ৬৫।
[২৪৯] সুরা মায়েদাহ ঃ ৩।
[২৫০] সুরা কাহফ ঃ ৫।
[২৫১] এ ব্যাপারে যথাস্থানে অন্যূন দশটি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।
[২৫২] ৮ম প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

ই'য়ালা ও ইবনে হজর এর বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করেছেন। অধিকন্তু যদি সত্য সত্যই এটি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অজ্ঞাত ব্যাপার হতো, তাহলে আবু সাহবা রাঃ এর কথার জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ স্বীকারোক্তি দিতেন কি? তিনি কি তার জবাবে এটি বলতেন না যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন কিনা আমি তা জানি না? পক্ষান্তরে দেখা যায়, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর বিপরীতে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রমুখাৎ হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।[২৫৩] তাছাড়া, সত্যই যদি এটি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অজ্ঞাত থাকত, তাহলে হযরত ওমর রাঃ এর এ কথার কি অর্থ হবে যে, إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة অর্থঃ 'যে বিষয়ে লোকদের মুহলৎ দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে তারা ক্ষিপ্র হয়েছে?' একথার পরিবর্তে যদি যুগপৎ তিন তালাকে তিন তালাকই গণ্য হবে এরূপ কোন হাদীস বা অভিপ্রায়ের কথা রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে মরফূ মুত্তাসিল সূত্রে মজুদ থাকত, হযরত ওমর রাঃ কি তা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করে দিতেন না? পক্ষান্তরে তিনি বললেন, فلو أمضيناه عليهم অর্থঃ 'যদি আমরা তিন তালাকের ব্যবস্থা তাদের উপর বলবৎ করে দেই, তা হলে উত্তম হয়।' এই উক্তি দ্বারা একথাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যুগপৎ তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার আইনের প্রকৃত প্রবর্তক হলেন হযরত ওমর ফারুক রাঃ, রাসুলুল্লাহ সাঃ নন। অর্থাৎ এটি হযরত ফারুকে আযম রাঃ এরই নিজস্ব মত। এরকম পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সাময়িক আইন প্রবর্তনের অধিকার মুসলিম শাসকের জন্য অনুমোদিত।[২৫৪] অতএব, যেহেতু একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাকে তিন তালাকই কার্যকর হয়ে যায় এরূপ কোন নির্দেশ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রমুখাৎ পাওয়া যায় না, কাজেই উত্থাপিত আপত্তিরও আর কোন ভিত্তি রইল না।

আপত্তি ১০ ঃ রুকানার হাদীস সম্বন্ধেও এই আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে নিশ্চয়বাচক অর্থে তালাক (তালাকে বাত্তা) দিয়েছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ ইমাম আবু দাউদ রহঃ এর আসন্ন বর্ণনাটি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। আবু দাউদ এ এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা তাঁর পিতার নিকট হতে এবং তিনি রুকানার নিকট হতে এই ঘটনা বিবৃত করেছেন যে,

أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

'রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে নিশ্চয়বাচক অর্থে তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাঃ তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন।'[২৫৫]

[২৫৩] ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম প্রমাণ দ্রষ্টব্য।
[২৫৪] 'হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
[২৫৫] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৮।

ইমাম আবু দাউদ রহঃ এই হাদীসটিকে পরম বিশুদ্ধ বলেছেন।

জবাব ঃ প্রথমে দেখে নেয়া যাক, ইমাম আবু দাউদ রহঃ প্রশ্নে আনীত হাদীসটিকে কিসের ভিত্তিতে পরম বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি বলেন, لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به 'কেননা, তারা উক্ত ব্যক্তিরই সন্তান আর ব্যক্তি সম্পর্কে তার সন্তান ও ঘরের অন্যান্যরা অধিক জ্ঞাত হয়।' এইটুকু ধারনার উপর হাদীস পরম বিশুদ্ধতা লাভ করতে পারে না। আমরা জানি রাসুলুল্লাহ সাঃ সম্বন্ধে হযরত আয়েশা রাঃ এর চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ ছিলেন না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সংক্রান্ত হাদীস হযরত আয়েশা রাঃ অস্বীকার করা সত্ত্বেও তা বিশুদ্ধ। এ রকম অনেক বিশুদ্ধ হাদীসে মা আয়েশা রাঃ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাছাড়া, রুকানার হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও ইবনে হিব্বান স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। রুকানার স্বীয় স্ত্রীকে 'আলবাত্তা'য় তালাক দেওয়ার ঘটনা যদি পরম বিশুদ্ধও হয়, তাতে তাঁর পিতা আব্দে ইয়াযীদের একত্রিত তিন তালাকের হাদীস বাতিল হবে কেমন করে? পিতা ও পুত্রের ঘটনা কি পৃথক পৃথক হতে পারে না? এছাড়াও 'আলবাত্তা'র হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসের প্রতিকূল নয় কি? আর ইবনে ইসহাকের হাদীসের বিশুদ্ধতাও কি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি?

এবার 'আলবাত্তা'র হাদীসটি কিরূপ পরম বিশুদ্ধ, তা একটু পরীক্ষা করা যাক।

(১) 'আলবাত্তা'র এই হাদীস সম্বন্ধে ইবনে হাজর আসক্বলানী রহঃ এর সাক্ষ্য এই যে,

واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه

'আলবত্তা'র হাদীসটি কি স্বয়ং রুকানা বর্ণনা করেছেন, নাকি এটি তাঁর নামে মুরসাল আকারে বর্ণিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীসের সনদে অসামঞ্জস্যতার দোষ ধরেছেন। ইবনে আব্দুল বার স্বীয় তামহীদে বলেন, বিদ্বানগণ 'আলবত্তা'র হাদীসকে দূর্বল বলেছেন।'[২৫৬]

(২) এই হাদীসের সনদ সম্বন্ধে উকায়লী বলেছেন,

إسناده مضطرب

'এই হাদীসের সনদ অনিশ্চিত।'[২৫৭]

[২৫৬] তালখীসুল হাবীর- ৩/৪৫৮পৃঃ।
[২৫৭] মিযানুল ই'তিদাল- ২/৪৬৩পৃঃ।

(৩) হাফেজ যাহবী রহঃ جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، حدثنا عبدالله بن على بن يزيد، عن أبيه، عن جده، এই সনদে বর্ণিত 'তালাকে বাত্তা'র হাদীস সম্বন্ধে ইমাম বুখারী রহঃ এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন যে,

قال البخاري لم يصح حديثه تفرد بهذا جرير

'ইমাম বুখারী রহঃ বলেন, তার (আলী ইবনে ইয়াযীদ) হাদীস সঠিক নয়। অধিকন্তু এই হাদীস একমাত্র জারীর ব্যতীত অন্য কেউ রেওয়ায়েত করেন নাই।'[২৫৮]

(৪) হাফেজ ইবনে হজর আসক্বলানী রহঃ আলী ইবনে ইয়াযীদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন,

علي بن يزيد بن ركانة مستور من الرابعة

'আলী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা হচ্ছেন চতুর্থ স্তরের অজ্ঞাতনামা রাবী।'[২৫৯]

(৫) উকায়লী 'আলী ইবনে ইয়াযীদ' সম্বন্ধে বলেন,

حديثه مضطرب ولا يتابع

'তার হাদীস অনিশ্চিত এবং অনুসরণযোগ্য নয়।'[২৬০]

(৬) আবার জরীর যে জুবাইর ইবনে সাঈদের নিকট হতে এই হাদীস গ্রহন করেছেন, সেই জুবাইর ইবনে সাঈদ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ রহঃ তার তালাকে বাত্তা সম্বলিত হাদীসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'তিনি দূর্বল'।

قال النسائي الزبير بن سعيد ضعيف، وهو معروف بحديث في طلاق البتة

'ইমাম নাসাঈ বলেন, জুবাইর ইবনে সাঈদ হচ্ছেন দূর্বল, আর তিনি এই 'তালাকে বাত্তা' সংক্রান্ত হাদীসের জন্য পরিচিত।'[২৬১]

(৭) জুবাইর ইবনে সাঈদ সম্পর্কে আল্লামা শওকানী বলেছেন,

وقد ضعفه غير واحد وقيل انه متروك

'একাধিক বিদ্বান জুবাইর ইবনে সাঈদকে দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি তার হাদীস পরিতাজ্যও বলা হয়েছে।'[২৬২]

(৮) আবুল হাসান আযলী স্বীয় 'সীক্বাত' এ 'জুবাইর ইবনে সাঈদ' সম্বন্ধে বলেন,

[২৫৮] মিযানুল ই'তিদাল- ৩/১৬১পৃঃ।
[২৫৯] তাক্বরীবুত তাহযীব- ১/৭০৫পৃঃ।
[২৬০] তাহযীব- ৫/২৮৫, রাবী নং ৫৫৮।
[২৬১] মিযানুল ই'তিদাল- ২/৬৭পৃঃ।
[২৬২] মিযানুল ই'তিদাল- ১/৩০৮পৃঃ।

روى حديثا منكرا في الطلاق

'সে তালাকের বিষয়ে মুনকার (পরিত্যাজ্য) হাদীস বর্ণনা করেছে।'[২৬৩]

(৯) 'আলবাত্তা'র হাদীস সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ আব্দুল হক রহঃ তাঁর আহকামে বলেছেন,

فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نافع عن عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَكُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ، وَالزُّبَيْرُ أَضْعَفُهُمْ

'এই হাদীসের সনদে যে আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে সায়েব রয়েছেন, তিনি নাফে' ইবনে উজায়ের ইবনে আব্দে ইয়াযীদের নিকট হতে এবং তিনি রুকানার নিকট হতে এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। আর জুব্যাইর ইবনে সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে রুকানার নিকট হতে এবং আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা আলী ইবনে ইয়াযীদের নিকট হতে এবং তিনি তদীয় পিতামহ রুকানার নিকট হতে এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। এরা সকলেই দূর্বল রাবী, আর তাদের মধ্যে জুবাইর ইবনে সাঈদ সর্বাপেক্ষা দূর্বল।'[২৬৪]

(১০) ইমাম খাত্তাবী রহঃ এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

وقد حكى الخطابي، أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها

'ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ এই হাদীসের সমুদয় সনদকেই দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন।'[২৬৫]

সুতরাং আবু দাউদের এই হাদীস যে অতীব দূর্বল সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, প্রমাণ হিসেবে আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত রুকানার হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ এবং ইবনে হাজর ঐ হাদীসটিকে অকাট্য দলিল বলে মত দিয়েছেন।[২৬৬]

আপত্তি ১১ ঃ কোন কোন বিদ্বান দাবি করেছেন, (৭ম প্রমাণ) আব্দে ইয়াযীদের হাদীসটি দূর্বল। কেননা, উক্ত হাদীসের সনদে আবু রাফে'র কোন পুত্র তা অজ্ঞাত।

জবাব ঃ এই আপত্তির জবাবে হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী রহঃ এর একটি মূল্যবান অভিমত প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

[২৬৩] সীক্বাত- রাবী নং ৪৯৩, তাহযীব- রাবী নং ৫৮৪, মা'রিফাতুস সীক্বাত- রাবী নং ৪৯৩।

[২৬৪] নাসাবুর রায়াহ- ৩/৩৩৭পৃঃ, তা'লিকুল মুগনী- ৩/৪৩৯পৃঃ।

[২৬৫] যাদুল মা'আদ- ৫/২৫৫পৃঃ।

[২৬৬] ফাতহুল বারী- ৯/৩৬২পৃঃ, আওনুল মা'বুদ ৬/২০০পৃঃ।

فمن العجب تقديمُ نافع ابن عجير المجهول الذي لا يُعرف حاله ألبتة، ولا يُدرى من هو، ولا ما هو على ابن جريج، ومعمر، وعبد الله بن طاووس فى قصة أبي الصهباء، وقد شهد إمامُ أهل الحديث محمدُ بن إسماعيل البخارى بأن فيه اضطراباً، هكذا قال الترمذى فى الجامع، وذكر عنه فى موضع آخر: أنه مضطرب. فتارةً يقول: طلقها ثلاثاً، وتارةً يقول: واحدةً، وتارة يقول: البتة، وقال الإمام أحمد: وطرقه كُلُّها ضعيفة، وضعفه أيضاً البخارى، حكاه المنذرى عنه.ثم كيف يُقدَّم هذا الحديثُ المضطربُ المجهولُ رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لِجهالة بعض بنى أبي رافع، هذا وأولادُه تابعيون، وإن كان عبيد الله أشهرَهم، وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه ابنُ جُريج

'বড়ই আশ্চর্য্য যে, নাফে' ইবনে উজায়ের যিনি একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, আর যার অবস্থা সম্পূর্ণ অবিদিত, তিনি যে কে আর কি তার পরিচয় কিছুই জানা নাই, তাকে হযরত আবুস সাহবার হাদীস রেওয়ায়েতকারী ইবনে জুরায়েজ, মা'মর ও আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস প্রভৃতির তুলনায় অগ্রগণ্য করা হয়। অথচ, হাদীস শাস্ত্রের অধিনায়ক মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহঃ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নাফে' ইবনে উজায়েরের হাদীসে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী রহঃ তাঁর জামে' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। অন্যস্থানে ইমাম বুখারী রহঃ স্বয়ং নাফে'কেই অস্থির বলেছেন। কেননা, কখনও তিনি বলেন, রুকানা তিন তালাক দিয়েছিলেন, কখনও বলেন এক তালাক, আবার কখনও বা বলেন আলবত্তা তালাক দিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ রহঃ বলেন, এই হাদীসটি যতগুলি তরিকায় বর্ণিত হয়েছে, তার সমস্তই দূর্বল। হাফেজ মনযরী রহঃ বলেন, ইমাম বুখারী রহঃও একে দূর্বল বলেছেন। এমতাবস্থায়, এরূপ অনিশ্চিত ও অজ্ঞাতনামা একটি হাদীসকে আব্দুর রাযযাক আন ইবনে জুরায়জের হাদীসের উপর শুধু আবু রাফে'র কোন পুত্রের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার দরুন কেমন করে অগ্রগণ্য করা যেতে পারে? অথচ তাঁর পুত্রগণ তাবেয়ী এবং তন্মধ্যে কারোর বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগও নেই এবং ইবনে জুরায়জের ন্যায় ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।'[২৬৭]

হ্যাঁ, একথা অনস্বীকার্য যে, আব্দে ইয়াযীদের হাদীস সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। যদিও ইবনে জুরায়জ 'তহদীসী' নিয়মে এই ঘটনা আবু রাফে'র কোন বংশধরের বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন, কিন্তু সে বংশধর কে তা সনদে উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে, আবু রাফে'র বংশধরগণের মধ্যে ফযল ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' ব্যতীত অন্য

[২৬৭] যাদুল মা'আদ- ৫/২৬৩পৃঃ।

কারো বৃত্তান্ত রিজালশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি। একে হাফেজুল ইসলাম ইবনে হাজর গ্রহণীয় (মাকবুল) সাব্যস্ত করেছেন।[২৬৮]

এইটুকু সন্দেহের জন্য আব্দে ইয়াযীদের হাদীস সম্পূর্ণ বর্জনীয় হতে পারে না। কেননা, প্রথমতঃ এই হাদীস সূরা তালাকের ১নং আয়াতের তাৎপর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের পোষকতায় একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসও মজুদ আছে। যেমন, ইমাম আহমদ, ইমাম বায়হাক্বী ও আবু ইয়ালা তাঁদের সনদ সহকারে বর্ণনা করতেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ ইবনে হুসাইনের বাচনিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইকরিমার প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন যে,

عن بن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দে ইয়াযীদের পুত্র রুকানা তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করেন। পরে স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হন। রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কীরূপ তালাক দিয়েছ? রুকানা বললেন, একত্রিতভাবে তিন তালাক দিয়েছি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, ঠিক আছে, এই তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে। সুতরাং তুমি যদি মনে কর, তবে তাকে পূণঃ গ্রহন করতে পার। অতঃপর রুকানা তার (তিন তালাকদত্তা) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন।'[২৬৯]

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং সর্বপ্রকার ত্রুটি বিমুক্ত। হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল হাফেজ ইবনে হাজর আসক্বলানী রহঃ বলেন,

وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات

'হাফেয আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করেছেন। এই হাদীসটি বক্ষমান মাসআলার অকাট্য প্রমাণ। অন্যান্য রেওয়ায়েতগুলিতে যে সকল ত্রুটি বা পরোক্ষ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, এই হাদীসে সেগুলি নেই।'[২৭০]

---

২৬৮ তকরীব- পৃঃ ৩০০।
২৬৯ মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৩৮৭, বায়হাক্বী আল কুবরা- হাঃ ১৪৭৬৪, মুসনাদে আবি ইয়ালা- হাঃ ২৫০০, রাওজাতুল মুহাদ্দেসীন- হাঃ ১৮৫০, ফাতহুল বারী- ৯/৩৬২পৃঃ, ইরওয়া আল গালীল- ৭/১৪৪পৃঃ, ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/২৬৯পৃঃ, ইগাছা- ১/২৮৭পৃঃ।
২৭০ ফাতহুল বারী- ৯/৩৬২পৃঃ, আওনুল মা'বুদ ৬/২০০পৃঃ।

কোন কোন কুলাগ্রগণ্য মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বিরুদ্ধে 'তদলীস' এর অভিযোগ আরোপ করেছেন। কিন্তু বিদ্বানগণ সম্যক অবগত আছেন যে, মুদাল্লিসের 'আনআনা' অগ্রাহ্য হইলে তাঁর 'তহদীস' মোটেও অগ্রাহ্য নয়। আর এই হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক 'আনআনা'র পরিবর্তে 'হাদ্দাসানী' বলে রেওয়ায়েত করেছেন। সুতরাং এই আপত্তির অলীকতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত আবু রাফে'র হাদীসের প্রামাণিকতাও প্রতিপাদিত হল।

আপত্তি ১২ ঃ রাসুল সাঃ এর যুগে সাধারণত লোকেরা তিন তালাকের মধ্যে প্রথম তালাক দ্বারা তালাকের নিয়ত করতেন এবং পরবর্তী দুই তালাক দ্বারা প্রথম তালাকের প্রতি জোর দিতেন। এজন্য যে কেউ এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে, তা এক তালাকই ধরা হতো।

জবাব ঃ উসূল হলো, কোন বাক্য তা'বীলের উপযোগী হতে হলে তাতে অনূন্য তিনটি কারন উপস্থিত থাকতে হবে। এক. বাক্যটি দূর্বোধ্য হতে হবে। দুই. বাক্যটি দ্বারা একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। তিন. বাক্যটি মহান আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কিত না হতে হবে। এ তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে বাক্যটির যে সম্ভাব্য অর্থ কুরআন বা কুরআন সমর্থিত অন্য বিশুদ্ব হাদীসের অধিক অনুকূলে হবে সে অর্থটিই গ্রহনীয় হবে।

(১) উপরোক্ত তা'বীলটি শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ ইমাম নববী রহঃ (৬৭৬ হিঃ) সহিহ মুসলিমে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীসের ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন। এই তা'বীল গ্রহনীয় হতো, যদি ইবনে আব্বাসের হাদীসটি দূর্বোধ্য হতো অথবা উক্ত হাদীসের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীসটি না দূর্বোধ্য, না এতে একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বরং হাদীসটি যে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মুল নিহিতার্থের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাতেও কোন সন্দেহ নেই। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কাজেই হাদীসটিতে তা'বীলের কোন অবকাশ নেই। সম্ভবত তিনি হযরত ওমর রাঃ কর্তৃক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারনে এরূপ তা'বীল করেছেন। হযরত ওমর রাঃ এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রকৃত কারন কি ছিল, তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ।

(২) আপত্তিতে উল্লেখ আছে, মানুষ প্রথম তালাক দ্বারা নিয়ত করতেন এবং পরবর্তী দুই তালাক দ্বারা প্রথম তালাকের প্রতি জোর দিতেন, এমন কোন বিশুদ্ধ হাদীস বা আছারের অস্তিত্ব আদৌ আছে বলে আমার জানা নেই। থাকলেও তা মোটেও বিবেচ্য হবে না। কারন, কারো অন্তরের খবর জানা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পক্ষে কোন মাধ্যমে সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাহলে কোন তালাকে নিয়ত

ছিল আর কোন তালাক দ্বারা জোর উদ্দেশ্য ছিল তা নিরুপণ হবে কিভাবে? ফারুকে আযম রাঃ-ই বা কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে, মানুষ তিন তালাক দ্বারা তিনেরই নিয়ত করছে? নিয়ত অদৃশ্য বিষয়। তা না হলে রুকানার হাদীসে ' فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কীরূপ তালাক দিয়েছ?' এ বাক্যটির কি অর্থ হবে? এছাড়াও আব্দে ইয়াযীদের হাদীসে 'إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি' এবং রুকানার হাদীসে ' طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد আমি তাকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছি' বাক্যগুলো দ্বারা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, উনারা প্রথম তালাকে নিয়ত করেছেন এবং পরবর্তী দুই তালাক দ্বারা প্রথম তালাকে জোর প্রদান করেছেন।

(৩) আপাত যদি ধরেও নিই যে ব্যাপারটি এরূপই ছিল, তাহলে তো তালাক প্রদানের সুন্নাত পদ্ধতি এরূপই হবার কথা ছিল। কিন্তু খোদ আপত্তিকারীরাও এ কথার উপর দ্বিমত করেন না যে, এই প্রকারের তালাক সুন্নাত পরীপন্থী। এভাবে তালাক দিলে তা বিদআত হিসেবেই পরিগণ্য হবে। কাজেই এই তা'বীল কি সরাসরি রাসুল সাঃ কে বিদআতী সাব্যস্ত করার নামান্তর নয়?

(৪) যেহেতু তা'বীলটি ইমাম নববী রহঃ এর, তাই আমরা এবার দেখব খোদ ইমাম নববী রহঃ এর নিকট হাদীস গ্রহনের মুলনীতি কি ছিল। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ উসূল শাস্ত্র 'আল মাজমূ' গ্রন্থে লিখেছেন,

فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظران كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا وهذا الذى قاله حسن متعين

'যদি কোন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী এমন কোন হাদীসের সন্ধান পান যা তার মাযহাবের বিপরীত, তাহলে দেখতে হবে যদি তিনি পূর্ণ ভাবে অথবা শুধু একটি বিশেষ অধ্যায়ে কিংবা শুধুমাত্র একটি বিশেষ মাসআলাতে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হন, তবে তিনি এ হাদীসটি গ্রহন ও পালন করবেন। আর যদি তার পক্ষে কোনরূপ ইজতিহাদ বা গবেষণা করার ক্ষমতা না থাকে, কিন্তু হাদীসটির বিরোধিতা করাও তার জন্য সংশয়ের হয়, সেক্ষেত্রেও তিনি মাযহাব বর্জন করে হাদীস গ্রহন করবেন। (দুটো শর্তে) যদি হাদীসটি বর্জন করার পক্ষে গ্রহনযোগ্য কোন উত্তর খুঁজে না পান অথবা ইমাম শাফেয়ী হাদীসটি গ্রহন না করলেও অন্য কোন মুজতাহিদ ইমাম উক্ত হাদীসটি গ্রহন করে

থাকেন। এমতাবস্থায় স্বীয় মাযহাবের ইমামের মতকে পরিত্যাগ করার জন্য ওজর হিসেবে হাদীসটি যথেষ্ট গণ্য হবে। তিনি (ইমাম নববী) আরও বলেন, এটিই উত্তম এবং এটিই (হাদীস গ্রহনের মুলনীতি হিসেবে) সুনির্ধারিত।'[২৭১]

অতএব, ইমাম নববী রহঃ এর তা'বীলের খণ্ডন তাঁরই পোষ্য মূলনীতি দ্বারা যথেষ্ট সাব্যস্ত হলো।

আপত্তি ১৩ ঃ সাহাবী রুকানার প্রদত্ত তিন তালাকে তিন তালাক উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এক তালাকই উদ্দেশ্য ছিল। যেমন,

عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم

'নাফে' ইবনে উযাইর ইবনে আব্দে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুকানা ইবনে ইয়াযীদ তাঁর স্ত্রী সুহায়মাকে আলবাত্তা শব্দ দ্বারা তালাক প্রদান করেন। তারপর ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে অবহিত করা হয়। তখন রুকানা বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছি। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছ? রুকানা পুনরায় বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এর দ্বারা এক তালাকের ইচ্ছা করেছি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ তার স্ত্রীকে পূণঃগ্রহনের নির্দেশ দিলেন।'[২৭২] ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি সহিহ বলেছেন।

জবাব ঃ (১) হানাফী মাযহাব অনুসারী কারোর জন্য এই হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ হবে না। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে যদি কারো মুখ ফসকেও তিন তালাক একবার বেরিয়ে যায়, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা পরিগণ্য হবে না। (২) 'আলবাত্তা' সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীসই বিশুদ্ধ নয়। ১০ নং আপত্তির জবাব দ্রষ্টব্য। (৩) হাদীসের রাবী নাফে' ইবনে উযায়র দূর্বল। শাহ আব্দুল হক রহঃ স্বীয় 'আহকামে' তাকে দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন।[২৭৩] ইমাম খাত্তাবী রহঃ ও ইমাম আহমদ রহঃও একে দূর্বল বলেছেন।[২৭৪] ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে ইমাম তিরমিযী রহঃ

---

[২৭১] আল মাজমূ- ১/৬৪, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩৩৪, আল ইনসাফ- ১/১০৮।
[২৭২] আবু দাউদ- হাঃ ২২০৮, দারাকুতনী- হাঃ ৮৮।
[২৭৩] নাসাবুর রায়াহ- ৩/৩৩৭পৃঃ, তা'লিকুল মুগনী- ৩/৪৩৯পৃঃ।
[২৭৪] যাদুল মা'আদ- ৫/২৫৫পৃঃ।

বলেন, হাদীসটি অনিশ্চিত।[২৭৫] আবু দাউদের ভাষ্যগ্রন্থ 'আউনুল মাবুদ' এর লেখক এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

بأن الحديث ضعيف ومع ضعفه مضطرب ومع اضطرابه معارض بحديث بن عباس أن الطلاق كان عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدة فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح

'এই হাদীসটি নিশ্চিতভাবে দূর্বল। দূর্বল হওয়ার পাশাপাশি অনিশ্চিতও। আর অনিশ্চিত হওয়ার সাথেসাথে ইবনে আব্বাসের হাদীসটির সাথেও সাংঘর্ষিক। এজন্য এই হাদীসটি সহিহ নয়।'[২৭৬]

(৪) আর ইমাম আবু দাউদের সহিহ বলার জবাবে হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন, 'ইমাম আবু দাউদের সহিস বলার দ্বারা হাদীসটি পরম বিশুদ্ধতা লাভ করেনি। মুলত তিনি এই হাদীসকে ইবনে জুরায়যের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় সহিহ বলেছেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণ করা যাবে না যে, হাদীসটি ইমাম আবু দাউদের নিকট সহিহ। তাঁর নিকট ইবনে জুরায়যের হাদীস যেমন যঈফ, তেমনি এই হাদীসও যঈফ। তিনি কেবল দুই যঈফের মধ্য থেকে এই হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেমন দুইজন রোগীর ক্ষেত্রে বলা হয়, এই রোগী ঐ রোগীর চেয়ে সুস্থ। মুলত দু'জনেই অসুস্থ।' অতঃপর ইবনুল কায়্যিম রহঃ হাদীসে রুকানা যেটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখ করে বলেন, ولا ريب أنه أصح من الحديثين 'আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসের মধ্যে ঐ হাদীসটি (হাদীসে রুকানা) অধিক সহিহ।'[২৭৭]

অতএব, এই হাদীসের তুলনায় হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর হাদীস ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত (হাদীসে রুকানা) হাদীস দুটি অধিক সহিহ হওয়ায় এবং কুরআনী আজ্ঞার অনুকূলে হওয়ায় অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হল। এছাড়াও সহিহ'র বিপরীতে যঈফ কিংবা যঈফ দ্বারা সহিহ'র তা'বীল গ্রহনযোগ্য নয় এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধই।

আপত্তি ১৪ ঃ একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার বিধান কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন স্ত্রীকে তার স্বামী যৌন বিহারের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয়। যেমন ইমাম আবু দাউদ স্বীয় গ্রন্থে সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন,

عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس رضي الله عنهما بلى كان

[২৭৫] আউনুল মাবুদ- ৬/২০৯।
[২৭৬] আউনুল মাবুদ- ৬/২০৮।
[২৭৭] আউনুল মাবুদ- ৬/২১০।

الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم

'ত্বাউস রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, আবু সাহবা রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ কে অধিক প্রশ্ন করতেন। একদা তিনি বলেন, আপনি কি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক দিলে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সময়ে, হযরত আবু বকরের যুগে এবং হযরত ওমরের খিলাফতের গোঁড়ার দিকে উক্ত তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করা হতো? ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সময়ে, আবু বকর ও ওমরের খিলাফতের প্রথম ভাগে কোন ব্যক্তি যৌন সংযোগের পূর্বেই যদি তার স্ত্রীকে একত্রিত ভাবে তিন তালাক প্রদান করতো, তাহলে তা এই তালাক বলেই গণ্য হতো। কিন্তু যখন ওমর দেখতে পেলেন যে, লোকেরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে, তখন তিনি সীমা লঙ্ঘণকারীদের জন্য তা তিন তালাক সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।'[২৭৮]

জবাব ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারীদের এই আপত্তিটিও উত্থাপনের কোন অধিকার নেই। কারন হানাফী মাযহাব এমতাবস্থায়ও তিন তালাক গণ্য করে।[২৭৯]

এবার মুল জবাবে আসা যাক। যুগপৎ তিন তালাককে যে সকল নারীর সাথে সঙ্গম হয়নি, শুধু তাদের জন্য এক তালাকরূপে সীমাবদ্ধ করার নির্দেশ বিভিন্ন কারনে সঠিক নয়। যথা ঃ

(১) উদ্ধৃত হাদীসটি দ্বয়ীফ (দূর্বল)। কেননা, উক্ত হাদীসের সনদ বিভিন্ন এবং এতে অজ্ঞাতনামা রাবী রয়েছেন। এছাড়াও আইয়্যুব যে একাধিক ব্যক্তির নিকট হতে ত্বাউসের রেওয়ায়েত গ্রহন করেছেন, সেই একাধিক ব্যক্তি কারা তাও জানা নেই। হাফেজ মনযরী রহঃ বলেছেন,

الرواة عن طاؤس مجاهيل

'যারা ত্বাউসের নিকট হতে রেওয়ায়েত করেছেন, তারা অজ্ঞাত ব্যক্তি।'[২৮০]

(২) পক্ষান্তরে, স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ রহঃ স্বীয় সনদ সহকারে 'আনআনা'র পরিবর্তে 'তহদীস' এর নিয়মানুসারে এই হাদীসটি আব্দুর রায্যাকের বাচনিক এবং ইবনে

[২৭৮] আবু দাউদ- হাঃ ২২০১।
[২৭৯] হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ঃ আল এনায়াহ- ৫/২৬৪, আল হেদায়াহ মাআ দ্দিরায়াহ- ৩৮৮ পৃঃ
[২৮০] আওনুল মা'বুদ- ৬/১৯৭পৃঃ।

জুরায়েযের বাচনিক এবং তিনি ত্বাউসের পুত্রের বাচনিক এবং তিনি স্বীয় পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে,

أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم

'আবু সাহবা রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ কে বললেন, আপনি কি এ বিষয়ে অবগত আছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ যুগে এবং আবু বকর রাঃ এর যুগে ও ওমর রাঃ এর খিলাফতের তিন বৎসরকাল পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক ধরা হতো? অতঃপর ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, হ্যাঁ।'[২৮১]

ইমাম নাসাঈ রহঃও এই হাদীস অনুরূপ মতনে বর্ণনা করেছেন।[২৮২]

সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়েই এই হাদীস সহিহ মুসলিমের অনুরূপ, যেখানে অজ্ঞাতনামা কোন রাবী নেই। এটি 'আনআনা' ভাবেও বর্ণিত হয়নি। আর এতে অর্থাৎ ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈর সম্মিলিত বর্ণনায় যৌন সংযোগ হওয়া বা না হওয়ার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং যৌন সংযোগ সম্পর্কিত হাদীস যদি এটির বিপরীতও হয়, তাহলেও উক্ত হাদীসের তুলনায় এই হাদীস অবশ্যই উৎকৃষ্টতর ও বলিষ্ঠতর। তা নয় কি?

আর যদি বলা হয়, এই হাদীসদ্বয়ে কোন বিরোধ নেই, তাহলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। কেননা, যৌন সংযোগ না হওয়ার হাদীসগুলো এ কথা বলে না যে, যে সকল হাদীসে যৌন সংযোগের কথা উল্লেখ নাই, সে সকল হাদীসকে উড়িয়ে দিতে হবে। অতীব বিরল ও দূর্বল একটি হাদীসের দোহাই দিয়ে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসকে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে উসূলে হাদীসের পরিপন্থী। প্রকৃত সুরাহা হল, একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক রূপে গণ্য করার ব্যবস্থা যদি যাদের সাথে যৌন সংযোগ হয়েছে আর যাদের সাথে হয়নি উভয়বিধ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে উভয় হাদীসে আর কোন বিরোধ থাকে না এবং উভয় হাদীসের উপর অবিকল আমল করাতেও আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এটিই উসূলে হাদীসের দাবি।

(৩) এ সম্পর্কে যতগুলি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কোনটিতেই যৌন সংযোগ না হওয়ার শর্ত উল্লেখিত নেই এবং ইমাম মুসলিমও এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করেন নি। কাজেই উত্থাপিত হাদীসে যৌন সংযোগ না হওয়ার কথা থাকলেও এ বিষয়ে বর্ণিত সবগুলি বিশুদ্ধ হাদীসকে এই হাদীস দিয়ে বিচার করা সঠিক হবে না।

---

[২৮১] আবু দাউদ- হাঃ ২২০২।
[২৮২] নাসাঈ- হাঃ ৩৪০৬।

(৪) আমরা জানি, সহবাসের পূর্বে কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে সেই স্ত্রীর ইদ্দত আবশ্যক। এ কথার অর্থ এমন নয় যে, সহবাসের পরে কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে সেই স্ত্রীর ইদ্দত নেই। তেমনি, সহবাসের পূর্বে একত্রে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হত, এটার অর্থ এ নয় যে, সহবাসের পরে একত্রে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হত না। উদাহরণ স্বরূপ, وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا 'আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে এড়াতে পারবো না।'[২৮৩] এখন এই আয়াত দ্বারা কি এটি বলা ঠিক হবে যে, আয়াতে فِي الْأَرْضِ (পৃথিবীতে) উল্লেখ থাকার কারনে আখিরাতে তারা আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারবে? হাদীসে এসেছে, إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ 'নিশ্চয় আল্লাহ কবরে কাফেরের শাস্তি বাড়িয়ে দেন, তার জন্য তার পরিবারের কান্নার কারনে।'[২৮৪] এর অর্থ কি এই যে, পরিবার পরিজনের হাসাহাসিতে কাফেরের শাস্তি হ্রাস পাবে? আরও এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'কিয়ামতের দিন আমি সমগ্র মানবজাতির সরদার।'[২৮৫] এর মানেও কি এই যে, দুনিয়াতে তিনি মানবজাতির সরদার হবেন না? হাদীসে কোন মুসলমানকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, হাদীসে অমুসলিমদের গালাগালির অনুমতি দিয়েছে। যখন দু'জন মু'মিন ব্যক্তি পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তখন মুখে আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর অর্থও এই নয় যে, মুখটা বাকী রেখে যেকোন অঙ্গে আঘাত করা যাবে। সুতরাং, উত্থাপিত হাদীসে যৌন সংযোগ না হওয়ার অর্থও এই নয় যে, যৌন সংযোগের পর একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে বিনা দলিলে তিন তালাকই গণ্য করতে হবে।

(৫) এই দাবি কেবলই ধারণা প্রসূত। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সময়ে, আবু বকরের যুগে ও ওমর ফারুকের খিলাফতের প্রথম তিন বৎসরকাল পর্যন্ত সহবাস পরবর্তী একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই ধরা হত, এই ধরণের বিশুদ্ধ হাদীস তো দূরের কথা, কোন দূর্বল বা জাল হাদীসও কোথাও বর্ণিত হয়নি।

আপত্তি ১৫ ঃ 'ওয়াইমির আজলানী' রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপস্থিতিতে স্বীয় স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছিলেন। এক্ষণে যদি একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়াটা অবৈধ হতো, আর এরূপ দেওয়াতে এক তালাক গণ্য হতো, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাদের

---

[২৮৩] সুরা জ্বিন ঃ ১২।
[২৮৪] বুখারী- হাঃ ১২২৬, নাসাঈ- হাঃ ১৮৫৮, বায়হাক্বী- হাঃ ৬৯৬৮।
[২৮৫] বুখারী- হাঃ ৪৪৩৫, মুসলিম- হাঃ ৫০১, তিরমিযী- হাঃ ২৪৩৪, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৯৬২৩।

বিচ্ছিন্ন করে দিতেন না। সুতরাং একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার নিয়ম রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগেও ছিল এবং তিনি একে তিন তালাকই গণ্য করেছেন।

জবাব ঃ (১) তাই যদি হয়, তাহলে তো তালাক প্রদানের সুন্নত নিয়ম এটাই হতো। বরং এই প্রকারের তালাক যে বিদআত কার্য, এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন শরয়ী বিদ্বান দ্বিমত করেন নি। রাসুলুল্লাহ সাঃ বিদআতের অনুমোদন দিবেন বা বিদআত কার্যে সম্মত হবেন এমন ধারণা কতবড় গোস্তাখীর ব্যাপার ভাবার দায়িত্ব আপনার। বস্তুতঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে যুগপৎ তিন তালাকের প্রচলন ছিল বটে, কিন্তু তিনি একে তিন তালাক নয়, বরং এক তালাকই গণ্য করতেন, যার প্রমাণ ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

(২) 'ওয়াইমির আজলানী'র হাদীসটি তালাক সংক্রান্ত নয়। এটি ছিল 'লিআন' সংক্রান্ত ঘটনা। অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ ছিল। নিয়ম হল, উভয়পক্ষের 'লিআন' এর ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ আপনা আপনিই ঘটে যায়। পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ সময় তিন তালাক বলাটা ছিল বাহুল্য কথা মাত্র। 'ওয়াইমির' এমনটি করার কারন হল, তিনি তার স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে একই বিছানায় দেখেছিলেন। সেজন্য তার মনে ভয় হচ্ছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ যদি তার স্ত্রীকে পুণরায় ফিরিয়ে নিতে বলেন! তাহলে তো তিনি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন। সেই ভয় থেকে তিনি আগ বাড়িয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশের পূর্বেই একসঙ্গে তিন তালাক বলে ফেলেন। সুতরাং এই তালাকের কোন কার্যকারিতা নেই। কেননা, তালাক না বললেও 'লিআন' এর কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ব্যাপারটি এমন যে, যদি কোন ব্যক্তি লোকসম্মুখে কাউকে খুন করার পর বলে, না আমি তাকে চড় মেরেছি মাত্র! আর স্বয়ং বিচারকই যখন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হন, তাহলে বিচারক নিশ্চয় অভিযুক্তের দ্বিতীয় কথার প্রতি কর্নপাত করবেন না। অনুরূপ, 'ওয়াইমির আজলানী'র বৈঠকে রাসুলুল্লাহ সাঃ লি'আনের বিচার করছিলেন, তালাকের নয়। যেহেতু লি'আন দ্বারা বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, সেজন্য তিনি সাঃ তালাকের কথা আমলেই নেননি। কেননা, তালাক আর লি'আন দুটোই ভিন্ন জিনিস।

আপত্তি ১৬ ঃ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাঃ একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাক কার্যকরী গণ্য করেছেন। যার প্রমাণ বহন করে এই হাদীসটি,

عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا

وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم

'আমের আশ-শাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফাতেমা বিনতে ক্বায়স রাঃকে বললাম, আপনার তালাকের ঘটনাটি আমাকে বলুন। তিনি বলেন, আমার স্বামী

ইয়ামেনে থাকা অবস্থায় আমাকে তিন তালাক দেয়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাঃ এটাকে জায়েয গণ্য করেন।'[২৮৬]

জবাব ঃ (১) উক্ত হাদীসে এক মজলিসে বা একত্রিত তিন তালাকের কথা উল্লেখ নেই। কাজেই সে তাকে নির্ধারিত পন্থায় স্বাভাবিক নিয়মে তিন তুহরে তিন তালাক দিয়েছিল বলেই বুঝতে হবে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে 'বায়েন তালাক' হিসেবে তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়ার পদ্ধতিই চালু ছিল। (২) হাদীসটি স্বামীর প্রবাসে থাকা অবস্থায় তালাক দেওয়া বৈধ কিনা এ সংক্রান্ত। একত্রিত তিন তালাক সংক্রান্ত নয়। (৩) হাদীসটির সনদে আপত্তি আছে। উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ফিরওয়াহ সম্পর্কে আবু আহমদ বিন আদী আল জুরজানী বলেন, তার সনদ বা মতন কোনটির কেউই অনুসরণ করেন নি। আবু বকর আল বুরকানী ও আবু হাতীম আর রাযী বলেন, তিনি মাতরুক তথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবু বকর আল বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবু বকর আল বায়হাক্বী বলেন, তিনি দূর্বল। আবু ইয়ালা আল খলিলী বলেন, তিনি খুবই দূর্বল।[২৮৭] ইয়াহয়িয়াহ ইবনে মায়ীন বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী।[২৮৮] ইমাম দারাকুতনী, ওরম বিন আলী, আবু যার'আ সহ বহু বিদ্বানের দাবি, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।[২৮৯] (৪) অত্র হাদীসের তিন তালাক যে একত্রিত তিন তালাক ছিল এরূপ ধারণা করা হলে হাদীসটি প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাঃ কোন কালেই বিদআত তালাকের অনুমোদন দেননি। তাছাড়া, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে এরূপ তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার উপর মরফূ সূত্রে সহিহ সুন্নাহ মজুদ আছে। উপরন্তু প্রমাণ রয়েছে, তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করা সম্পর্কিত হাদীসে আয়েশা রাঃ ফাতেমা বিনতে কায়সের হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[২৯০]

আপত্তি ১৭ ঃ বুখারীতেও একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার হাদীস বর্ণিত আছে।

وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فأن

النبي صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك

'হযরত নাফে' রহঃ বলেন, যখন হযরত ইবনে ওমর রাঃ এর কাছে 'তিন তালাক' এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বলেন, তুমি যদি এক বা দুই তালাক দিয়ে

---

[২৮৬] ইবনে মাজাহ- ২০২৪।
[২৮৭] তাহযীবুল কামাল- রাবী নং ৩৬৭, পৃঃ ২/৪৪৬।
[২৮৮] আল যারহু ওয়াত তা'দীল- ২/২২৮।
[২৮৯] তাহযীবুল কামাল- রাবী নং ৩৬৭, পৃঃ ২/৪৪৬, আল যারহু ওয়াত তা'দীল- ২/২২৮।
[২৯০] বুখারী- হাঃ ৫০১৮, মুসলিম- হাঃ ৩৭৭৫।

থাকো, তাহলে রুজু করতে পাববে। কারন রাসুলুল্লাহ সাঃ আমাকে এরূপ অবস্থায় রুজু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তিন তালাক দিয়ে দাও, তাহলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহন করে।'[২৯১]

জবাব ঃ এই হাদীসেও এক মজলিসে বা একত্রিত তিন তালাকের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া, এই হাদীসটি তালাক পতিত হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত নয়, বরং পন্থা মোতাবেক তৃতীয় তালাক প্রদানের পর রজআত করা যাবে কিনা এ সংক্রান্ত। কাজেই এ দাবিটিও ভিত্তিহীন।

আপত্তি ১৮ ঃ مجاهد قال : كنت عند بن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناؤه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك

'মুজাহিদ রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের পাশে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। ইবনে আব্বাস রাঃ চুপ করে রইলেন। আমার মনে হলো তিনি লোকটিকে তার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিবেন। কিছুক্ষণ পর ইবনে আব্বাস রাঃ বললেন, তোমরা অনেকেই নির্বোধের মত কাজ কর, তারপর ইবনে আব্বাস! ইবনে আব্বাস! বলে চিৎকার করতে থাক। শুনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য আল্লাহ উপায় খুলে দেন। তুমি তো স্বীয় রবের নাফরমানি করেছ। এই কারনে তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।'[২৯২]

এখন একত্রিত তিন তালাকে যদি তিন তালাক গণ্য না হতো, তাহলে ইবনে আব্বাস রাঃ ঐ লোকটিকে নির্বোধ বলে তিরস্কার করলেন কেন?

জবাব ঃ তালাকের প্রকারভেদের মধ্যে 'তালাকে আহসান' বলে একটা প্রকার আছে। যেটি তালাক প্রদানের সর্বোত্তম পন্থা। এই তালাকের নিয়ম হলো, এক তালাক বা দুই তালাক রজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া। অর্থাৎ শেষ তালাকটিও খতম করে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ করে না দেয়া। এতে সুবিধা হলো, যদি কখনও স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিতে আবার দাম্পত্যজীবনে ফিরে আসতে চায়, তাহলে কোন প্রকার জট-ঝামেলা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারে। এই জন্য মহান

[২৯১] বুখারী- হাঃ ৫/২০১৫।

[২৯২] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৯, বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭২০।

আল্লাহ কুরআনে তৃতীয় তালাকটি উল্লেখ করেন নি, উহ্য রেখেছেন।[২৯৩] লোকটি এই সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করেছে বলেই ইবনে আব্বাস রাঃ এর এই ক্ষোভ।

লক্ষণীয় যে, এটি ইবনে আব্বাস রাঃ এর একটি নিজস্ব ফতোয়া মাত্র। এর বিপরীতে সহিহ মরফূ সূত্রে রেওয়ায়েত মজুদ আছে। আর স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো, রাবীর রেওয়ায়েতের বিপরীতে ফতোয়া অগ্রহনীয়। ১ নং আপত্তির জবাব দ্রষ্টব্য।

আপত্তি ১৯ ঃ ইমাম বায়হাক্বী রহঃ স্বীয় সুনানে হযরত হাবীব ইবনে আবি ছাবিতের বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন,

جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال طلقت امرأتي ألفا قال ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك

'এক ব্যক্তি হযরত আলী রাঃ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আমার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়েছি। হযরত আলী রাঃ বললেন, তিন তালাকের দ্বারাই সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। বাকী তালাক সমূহ তোমার অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে বন্টন করে দাও।'

অর্থাৎ এগুলো অর্থহীন। এখানে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, নিশ্চয় ঐ লোকটি হাজার তালাক হাজার মাসে দেয়নি। তাহলে তো ছিয়াশি বছর দু'মাস তালাকের জন্য অতিবাহিত হয়ে যেত। নিশ্চয় একসঙ্গে দিয়েছে এবং হযরত আলী রাঃ তিন তালাক কার্যকরী হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন। অতএব, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাকই পতিত হবে।

জবাব ঃ এটিও হযরত আলী রাঃ এর একটি নিজস্ব অভিমত। যা দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহ ও প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর রাঃ সহ সমকালীন লক্ষাধিক সাহাবীর সম্মিলিত আমল বাতিল হতে পারে না। এগুলো মূলত হযরত ওমর রাঃ এর শাসনামলে প্রচলিত আইনের আদলে সংকলিত হয়েছে। এরূপ কিছু কিছু 'আছার' ও 'মাকতু বর্ণনা' মুআত্বা মালেক, বায়হাক্বী, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, দারাকুতনী প্রভৃতিতে এসেছে। যার অধিকাংশই যঈফ, মুনকার, মওযু ও কয়েকটা সহিহ। কিন্তু এগুলি অগ্রহনযোগ্য। কেননা, (১) বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনু আব্বাস রাঃ থেকেই এর বিপরীতে বিশুদ্ধ মরফূ রেওয়ায়েত মজুদ রয়েছে। (২) আর উসূলে হাদীসের মুলনীতি হলো, মওকূফ, মাকতু ইত্যাদি হাদীসের বিপরীতে মরফূ হাদীস অধিক অগ্রগণ্য। (৩) তাছাড়া, মানুষ যখন সুন্নাতের প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই উপর্যোপরি বিদআতি পন্থায় তালাক দিতে আরম্ভ করেছে, তখন হক্কানী বিদ্বানগণ এভাবেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। এর অর্থ মোটেও তিন তালাক গণ্য হওয়া

[২৯৩] মা'রেফুল কুরআন- ১/৫২৯ (বাংলা), যালালাইন- (টীকা) ১/৫০১।

নয়। যেমন কখনো কখনো মায়ের চোখের সামনে সন্তান হোঁচট খেয়ে কোথাও চোট পেলে মা রেগেমেগে বলে উঠেন, 'খুব ভাল হয়েছে!' এখন ভাল হয়েছে বলে কি সে আবারও হোঁচট খাবে? প্রকৃতপক্ষে এই 'ভাল হয়েছে' কথার দ্বারা ব্যাপারটি মোটেও ভাল হয়েছে বুঝায় না।

এখন প্রশ্ন হলো, হাদীস সহিহ হওয়া সত্ত্বেও অগ্রহনযোগ্য হয় কিভাবে? বস্তুত, সহিহ হাদীস সমূহের সাথে বিরোধপূর্ণ কোন হাদীসের মান যঈফ বা মুনকার হলে সে হাদীস যে অগ্রহনযোগ্য হয় এ ব্যাপারে নতুন করে আলোচনার অবকাশ নেই। তবে বিরোধপূর্ণ উভয় হাদীসের মান সহিহ হলে কোন হাদীসটি অগ্রগণ্য হবে এ বিষয়ে একটি মুলনীতি স্থিরিকৃত হওয়া দরকার। যদিও এক এক করে এসবের প্রত্যেকটির জবাব দেওয়া দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, তা সত্ত্বেও হাদীস অগ্রগণ্য হওয়ার মুলনীতি তথা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতি প্রাসঙ্গিক কিছু নিয়ম-নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি, যাতে পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের ক্ষেত্রে সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায়।

বিরোধপূর্ণ দুটি গ্রহনযোগ্য হাদীসের কোনটি অগ্রগণ্য হবে?

গ্রহনযোগ্য[২৯৪] হাদীসের সাথে গ্রহনযোগ্য হাদীসের বিরোধ হওয়াটা মূলত অসম্ভব। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কোন বক্তব্যে বা কর্মে যেমন স্ববিরোধিতা থাকতে পারে না, তেমনি কোন সাহাবীরও এ শক্তি নেই যে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সিদ্ধান্তের বিপরীত মত ব্যক্ত করবেন। তা সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারনে কখনো কখনো গ্রহনযোগ্য হাদীসের সাথে গ্রহনযোগ্য হাদীসের বিরোধ সম্ভব বলে আপাত মনে হতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে তা হয়।

এমতাবস্থায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ (১) পরস্পর বিরোধী হাদীস দুটি মারফূ[২৯৫] হবে, এবং উভয় হাদীস সমগোত্রীয়[২৯৬] হবে। (২) উভয় হাদীস মারফূ হবে, তবে সমগোত্রীয় হবে না।[২৯৭] অথবা (৩) হাদীসদ্বয়ের একটি মারফূ, অপরটি মাওকূফ[২৯৮] হবে।

---

২৯৪ এখানে গ্রহনযোগ্য হাদীস বলতে সেসব হাদীসই উদ্দেশ্য যেগুলো উসূলে হাদীসের মানদন্ডে গ্রহনযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে।

২৯৫ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কথা, কাজ ও সম্মতিসূচক হাদীস যেগুলোর বর্ণনার পরম্পর সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাঃ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

২৯৬ অর্থাৎ উভয়টি কৃওলী (রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বক্তব্য) বা উভয়টি ফে'লী (রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কর্ম) অথবা উভয় হাদীস তাকৃরিরী (রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মৌনসম্মতি) হবে।

২৯৭ অর্থাৎ একটি কৃওলী, অপরটি ফে'লী বা তাকৃরিরী অথবা একটি ফে'লী, অপরটি তাকৃরিরী হবে।

২৯৮ সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সম্মতিসূচক হাদীস যেগুলোর বর্ণনার পরম্পর সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

(১) পরস্পর বিরোধী হাদীস দুটি সমগোত্রীয় মারফূ হলে, তখন কয়েকটি ধাপে এর সমাধান তালাশ করতে হয়। সমাধানের প্রথম ধাপ হলঃ উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধান করা। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে, প্রকৃতপক্ষে হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বরং হাদীসদ্বয়ের সমন্বিত অর্থই হবে শরীয়তের চূড়ান্ত বিধান। অর্থাৎ হাদীসদ্বয়ের মাঝে এমনভাবে সমন্বয় বিধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে উভয় হাদীসের দাবিই সঠিক থাকে। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্য করা যাক,

عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فَلْيَمْحُه وحَدِّثوا عني ولا حَرَج، ومن كذب عليَّ قال همام أحسبه قال مُتعمِّدا، فَلْيَتَبَوَّأْ مقعده من النار

'হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করো না। আর যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে কুরআন ব্যতীত কিছু লিখবে, সে যেন তা মুছে ফেলে। আমার বাণী বর্ণনা কর, এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, (হুম্মাম রহঃ বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে) সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল।'[২৯৯]

এই হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাঁর বাণী (হাদীস) লিখতে নিষেধ করেছেন। লিখলেও তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার অন্য এক হাদীসে এর বিপরীত নির্দেশনা রয়েছে। যেমন,

عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যা কিছু রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম, তা লিখে রাখতাম। আমি ইচ্ছা করতাম যে, আমি এর সবই সংরক্ষণ করি। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করল এবং বলল, তুমি যা কিছু শোন তার সবই লিখে রাখ? অথচ রাসুলুল্লাহ সাঃ একজন মানুষ। তিনি কোন সময় কথা বলেন রাগান্বিত অবস্থায় এবং কোন সময় খুশির অবস্থায়। এ কথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করি, আর বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে অবহিত করি। তখন তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে নিজের মুখের প্রতি ইশারা করেন আর বলেন, তুমি লিখতে

---

২৯৯ মুসলিম- হাঃ ৭৭০২।

থাক। ঐ সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, এই মুখ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না।'[৩০০]

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাঃ হাদীস লিখতে বলেছেন। দুটোই সমগোত্রীয় মারফূ হাদীস এবং এক হাদীসে নিষেধ, অন্য হাদীসে অনুমোদন। হাদীস দুটি বাহ্যত বিপরীতমুখী মনে হলেও বস্তুত হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। বরং উভয় হাদীসের সমন্বিত অর্থ হলো, হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য ছিল, যাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ছিল যে, তারা নির্বিচারে হাদীস লিখতে গিয়ে কুরআন এবং হাদীস মিশিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ছিল না, বরং নিশ্চিত ছিলেন যে তারা দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সতর্কতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিবেন, তাদেরকে নিষেধ করা হয় নি। বরং উৎসাহিত করেছেন। হাদীসদ্বয়ে আরো একটি চমৎকার শিক্ষার ইঙ্গিত রয়েছে, তা হল যাদের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় কিংবা নিজের মনগড়া কোন বক্তব্য হাদীসের সাথে যোগ করে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা থাকবে তাদের জন্যও হাদীস লিখা, বলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ও গুরুতর অপরাধ। এরূপ বুঝ নিলে উভয় হাদীসের মাঝে আর কোন বিরোধ থাকে না।

সমাধানের দ্বিতীয় ধাপ হলঃ যদি আপাত বিপরীতমুখী দুটি হাদীসের মাঝে উপরোক্ত উপায়ে সমন্বয় বিধান করা দুরূহ হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে করণীয় হল বিপরীতমুখী দুটি হাদীসের কোনটি কুরআনের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ তা নির্ণয় করা। যে হাদীসটি কুরআনের সাথে অথবা এক স্তর উঁচু পর্যায়ের হাদীসের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবে বা নিকটবর্তী হবে অথবা বর্ণনার দিক থেকে অধিক শক্তিশালী হবে, সেটি অগ্রগণ্য হবে। কেননা, সর্বদা মূলের প্রাধান্য পাওয়াটাই দলিলসম্মত ও যুক্তির দাবি। এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহঃ তাঁর 'আর রিসালা' গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দর ও সবিস্তার প্রভিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

قلت أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة قال هكذا

نقول قلت فإن لم يكن فيه نص في كتاب الله كان أولاهما بنا الأثبت منهما

'জনৈক প্রশ্নকারীর জবাবে ইমাম শাফেয়ী রহঃ বললেন, দুটি হাদীসের মাঝে একটির বক্তব্য যখন কুরআনের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, তখন অন্যটির উপর একে প্রাধান্য দেয়া হবে। যদি পবিত্র কুরআন থেকে এ ধরণের প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে হাদীস দুটির মাঝে যেটি (উঁচু পর্যায়ের হাদীস দ্বারা কিংবা রাবীর দিক থেকে) অধিক শক্তিশালী সাব্যস্ত হবে, সেটি অগ্রগণ্য হবে।'[৩০১]

[৩০০] আবু দাউদ- হাঃ ৩৬৪৮, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৬৫১০, দারেমী- হাঃ ৪৮৪।
[৩০১] আর রিসালা- পৃঃ ২৮৪।

ইমাম শাফেয়ী রহঃ আরো বলেন,

وذلك ان يكون من رواه أعرف إسنادا واشهر بالعلم وأحفظ له أو يكون روى الحديث الذي

ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر والذي تركنا من وجه فيكون الاكثر أولى بالحفظ من الاقل أو

يكون الذي ذهبنا إليه اشبه بمعنى كتاب الله أو اشبه بما سواهما من سنن رسول الله أو أولى بما

يعرف أهل العلم أو أصح في القياس والذي عليه الاكثر من أصحاب رسول الله

'হাদীস অধিক শক্তিশালী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উভয় হাদীসের বর্ণনাকারীগণ উসূলে হাদীসের মানদন্ডে গ্রহনযোগ্য হবে এবং ইলম ও স্মরণশক্তির দিক দিয়ে তাঁরা একে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হবে। সুতরাং বর্ণনাকারীর মুখস্থশক্তি প্রাধান্য পাওয়ার অন্যতম কারণ। একইভাবে ইলমের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়াটাও প্রাধান্য পাওয়ার একটা বিশেষ ভিত্তি। অনুরূপভাবে যে হাদীসটি দুই বা দু'য়ের অধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি এক সনদে বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে। আর অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কম সংখ্যকের উপর হেফজ বা মুখস্থের দিক থেকে প্রাধান্য পাবে। সারকথা, কুরআনের অর্থের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ও নিকটবর্তী হওয়ার কারনে হাদীস প্রাধান্য পাবে। অথবা বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলির যেটি এক স্তর উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বা সমগোত্রীয় অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সেটি প্রাধান্য পাবে। অথবা যে হাদীসটি অধিক যুক্তিযুক্ত বা যুক্তির নিকটবর্তী সেটি প্রাধান্য পাবে। তাতেও দুরূহ হলে, যে হাদীসটির উপর অধিকাংশ সাহাবীর আমল রয়েছে, সে হাদীসটি অপেক্ষাকৃত কম আমলের হাদীসটির উপর প্রাধান্য পাবে।'[৩০২]

ইমাম আযম আবু হানীফা রহঃ এর বিশিষ্ট ছাত্র হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুবী এ বিষয়ে ইমাম আযমের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন,

ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص عن كتاب الله أو سنة عن رسول الله أو إجماع عن الأمة

وإذا اختلف الصحابة على أقوال نختار منها ما هو أقرب الى الكتاب أو السنه ونجتنب عما

جاوز ذلك

'আল্লাহর কিতাবে অথবা রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাতে কোনো বক্তব্য থাকলে অথবা উম্মাতের ইজমা বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ দ্বারা কথা বলার অধিকার কারো নেই। আর যদি সাহাবীগণ মতভেদ করেন তবে আমরা তাঁদের মতগুলোর মধ্য থেকে কুরআন অথবা সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী বক্তব্যটি গ্রহণ করি এবং এর ব্যতিক্রম সব কিছু পরিত্যাগ করি।'[৩০৩]

[৩০২] আর রিসালা- পৃঃ ২৮৫।
[৩০৩] তাবাক্বাতিল হানাফিয়্যাহ- ২/৪৭৩।

তবে তার আগে দেখতে হবে, উভয় হাদীসের কোন একটি হাদীস কুরআন দ্বারা বা কোন উঁচু মানের হাদীস দ্বারা অথবা সমগোত্রীয় অন্য হাদীস দ্বারা রহিত (মানসূখ) হয়েছে কি'না। যদি রহিত হয়ে থাকে তাহলে রহিত হাদীসটির আমল বাতিল গণ্য হবে। এবং রহিতকারী (নাসেখ) হাদীসটি এককভাবে গ্রহনযোগ্যতা লাভ করবে।

عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق

'হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি সালাত আদায় করছেন। আমি তাঁকে (ঐ অবস্থায়) সালাম দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি এক্ষুণে আমাকে সালাম দিয়েছিলে, অথচ আমি সালাত-রত ছিলাম। এই সময় তিনি পূর্বমুখী ছিলেন।'[৩০৪]

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাঃ সালাত-রত অবস্থায় ইশারায় কথা বলেছেন। এ থেকে এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, সালাতে ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলা বা অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করা বৈধ। কেননা, উদ্ধৃত হাদীসের আমল প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

'সব ধরণের নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও।'[৩০৫]

তারপর এই হাদীস দ্বারা একেবারে রহিত হয়ে গেছে।

عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

'যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালাতে কথাবার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে আলাপ করত। অতঃপর যখন 'সব ধরণের নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও' (২:২৩৮) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো,

[৩০৪] মুসলিম- হাঃ ১২৩৩, নাসাঈ- হাঃ ১১৮৯, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১০১৮, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ১৪৫৮৮।

[৩০৫] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩৮।

তখন (রাসুলুল্লাহ সাঃ) আমাদেরকে সালাতে চুপ থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং পরস্পরে আলাপ করতে নিষেধ করলেন।'[৩০৬]

এরূপ রহিতকরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা নবীযুগের প্রথমদিকে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সালাত-রত অবস্থায় থুথু ফেলা। প্রথমদিকে সালাত-রত অবস্থায় বামদিকে থুথু ফেলা যেত। অনুরূপভাবে, প্রথমদিকে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কবর যিয়ারতের উপর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ জারী হয়। আবার রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগের প্রথম দিকে নিকাহে মুতা'র অনুমোদন ছিল কিন্তু তা পরবর্তীতে নিষিদ্ধ হয়। অতএব, বিপরীতমূখী হাদীস দুটি সমগোত্রীয় মারফূ হলে, আর যদি কোনটির হুকুম অন্য উত্তম নস দ্বারা মানসূখ না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে প্রথমে উভয় হাদীসের সমন্বিত অর্থ নির্ণয় করতে হবে। তা সম্ভব না হলে যেটি কুরআন বা অধিক শক্তিশালী অন্য সুন্নাহর কাছাকাছি হবে সেটি প্রাধান্য পাবে।

(২) ক্বওলী হাদীসের সাথে ফে'লী বা তাক্বরিরী হাদীসের, অথবা ফে'লী হাদীসের সাথে তাক্বরিরী হাদীসের বিরোধ রয়েছে মনে হলে, সেক্ষেত্রেও প্রথম করণীয় হলো উভয় হাদীসের মাঝে এমনভাবে সমন্বয় বিধান করা, যাতে উভয় হাদীসের দাবিই অটুট থাকে। যেমন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বাণী,

أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ

'হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। আর কেউ ভুলবশতঃ পান করে ফেললে, সে যেন বমি করে ফেলে দেয়।'[৩০৭]

এই হাদীসটি ক্বওলী মারফূ, এবং এই হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করতে কড়াভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবার অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام

'ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাঃ যুগে চলতে চলতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পান করতাম।'[৩০৮]

[৩০৬] বুখারী- হাঃ ৪২৬০, মুসলিম- হাঃ ১২৩১, তিরমিযী- হাঃ ৪০৫, নাসাঈ- হাঃ ১১৪২, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ১৯২৭৮।

[৩০৭] মুসলিম- হাঃ ৫৩৯৮।

[৩০৮] তিরমিযী- হাঃ ১৮৮০, ইবনে মাজাহ- হাঃ ৩৩০১।

এই হাদীসটি তাক্বরিরী মারফূ, এবং এই হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাঃ মৌনতা অবলম্বন করেছেন। প্রথম হাদীসে নিষেধ, দ্বিতীয় হাদীসে মৌনতা। এখানে মূলত দুটি হাদীসের মাঝে বাহ্যিক বিরোধ রয়েছে মনে হলেও আসলে হাদীস দুটির মাঝে কোনরূপ বিরোধ নেই। এ দুটি হাদীসের সমন্বিত অর্থ বিচার করলেই সহজ সমাধানটি বেরিয়ে আসে। তা হল দাঁড়িয়ে পান করা হারাম নয়, বরং অপছন্দনীয়। যদি দাঁড়িয়ে পান করা একেবারে হারাম হতো, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাঃ অবশ্যই সাহাবীগণকে সতর্ক করতেন। সুতরাং, এরূপ বুঝ নিলে এই হাদীসদ্বয়ের মাঝেও আর কোন বিরোধ থাকে না।

আর যদি অ-সমগোত্রীয় পরস্পর বিরোধী দুটি মারফূ হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয়, তখন বুঝতে হবে ক্বওলী হাদীসটি আমলযোগ্য এবং সার্বজনীন। আর ক্বওলী হাদীসের বিপরীত হাদীসটি সুনির্দিষ্ট পটভিত্তিক অথবা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্য খাস (নির্দিষ্ট)। যা দ্বারা তিনি অপারগ অবস্থায় মানুষের করণীয় বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন। লক্ষ্য করা যাক,

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

'হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করতে বসলে সে যেন কখনো ক্বিবলার দিকে পিঠ বা মুখ করে না বসে।'[৩০৯]

এই হাদীসে বলা হচ্ছে আমরা যেন ক্বিবলার দিকে পিঠ বা মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে না বসি। অথচ অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة

'ইবনে ওমার রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন আমার বোন হাফসা রাঃ এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ কে হাজত পূরণ-রত অবস্থায় দেখলাম, তিনি শামের দিকে মুখ করে এবং ক্বিবলার দিকে পিঠ করে বসেছিলেন।'[৩১০]

এই হাদীস বলছে, রাসুলুল্লাহ সাঃ নিজেই একবার ক্বিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, ক্বওলী হাদীস দ্বারা ক্বিবলার দিকে পিঠ করে জরুরত সারানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, আবার ফে'লী হাদীস দ্বারা তা বৈধ

[৩০৯] মুসলিম- হাঃ ৬৩৩।
[৩১০] তিরমিযী- হাঃ ১১।

হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় সমাধান হলো ক্বওলী হাদীসের বিপরীতে ফে'লী হাদীসের উপর আমল করা ঠিক হবে না যতক্ষণ না মানুষ নিরুপায় হয়। কেননা, ফে'লী হাদীসের চেয়ে ক্বওলী হাদীস উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং বুঝতে হবে এখানে ফে'লী হাদীসটি রাসুলুল্লাহ সাঃ অপারগ অবস্থায় নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন এবং তা দ্বারা জনসাধারণের জন্য অপারগ অবস্থায় করণীয় বিষয়ের উপর শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং, পরস্পর বিরোধী হাদীস দুটি অ-সমগোত্রীয় মারফূ হলে, সেক্ষেত্রেও প্রথমত উভয় হাদীসের সমন্বিত অর্থ নির্ণয় করতে হবে। তা সম্ভব না হলে ক্বওলী মারফূর উপর আমল করা হবে এবং ফে'লী মারফূ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্য অপারগ অবস্থায় খাস ও তাক্বরিরী মারফূ নির্দিষ্ট পটভিত্তিক বলে বুঝ নিতে হবে।

(৩) পরস্পর বিরোধী হাদীস দুটির একটি মারফূ, অপরটি মাওকূফ হলে, সেক্ষেত্রে মারফু হাদীসের হুকুম অপরিবর্তিত রেখে মারফু হাদীস ও মাওকূফ হাদীসের মাঝে সমন্বয় বিধান করা যদি সম্ভব হয় তাহলে তাই করণীয় হবে। যেমন,

حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك

'মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল... সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ, হযরত আবু বকর রাঃ এবং হযরত ওমর রাঃ এর পবিত্র যুগে জুম'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হতো। এরপর যখন হযরত উসমান রাঃ এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক সমাগম বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান রাঃ জুম'আর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান প্রথম দেওয়া হয় এবং পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।'[৩১১]

এখানে হযরত উসমান রাঃ কর্তৃক চালুকৃত তৃতীয় আযানের আমলের কারনে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হুকুম বা আমলে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নি।

আর যদি এরূপ সমন্বয় বিধানের কোন পথ খোলা না থাকে, সেক্ষেত্রে মারফূ হাদীস অগ্রগণ্য হবে এবং মাওকূফ হাদীসের আমল অস্থায়ী বা নির্দিষ্ট পটভিত্তিক কিংবা বিশেষ কারনে প্রণীত বলেই জানতে হবে। যেমন,

[৩১১] বুখারী- হাঃ ৮৭৪, তিরমিযী- হাঃ ৫১৬, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১১৩৫।

أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلان من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم

'হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ শামের এক লোক থেকে শুনেছেন, সে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার রাঃ কে প্রশ্ন করেছিলেন তামাত্তু হজ্ব জায়েয নাকি না জায়েয? তিনি বললেন জায়েয। প্রশ্নকারী বললেন, আপনার পিতাতো (ওমার রাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাঃ বললেন, আমাকে বল আমার পিতা নিষেধ করেছেন আর রাসুলুল্লাহ সাঃ তা করেছেন, এখন আমার পিতার নির্দেশ মানবো নাকি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ মানবো? প্রশ্নকারী বললেন, বরং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হুকুম-ই মানতে হবে। তারপর ইবনে ওমার রাঃ বললেন, আসল বিষয় হলো রাসুলুল্লাহ সাঃ তামাত্তু হজ্ব করেছেন।'[৩১২]

এই হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিপরীতে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ স্থায়ী ও সার্বজনীন শরয়ী আইন নয়। আর স্থায়ী ও সার্বজনীন শরয়ী আইন নয় বলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাঃ তাঁর পিতার কথা প্রত্যাখ্যান করে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সিদ্ধান্তকে গ্রহন করেছেন এবং অন্যকেও তা গ্রহনে উৎসাহিত করেছেন।

ফলকথা এই যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন সিদ্ধান্তই স্থায়ী ও সার্বজনীন শরয়ী আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। হোক তা যতবড় জগৎশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব্যের অভিমত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'[৩১৩]

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'রাসুলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।'[৩১৪]

[৩১২] তিরমিযী- হাঃ ৮২৪।
[৩১৩] সুরা হাশর ঃ ৭।
[৩১৪] সুরা আহযাব ঃ ২১, মুমতাহিনাহ ঃ ৬।

অতএব, মারফূ হাদীসের বিপরীতে মাওকূফ হাদীস (স্থায়ী ও সার্বজনীন শরয়ী আইন হিসেবে) গ্রহনযোগ্য নয় প্রমাণিত হল। তবে হ্যাঁ, আমলের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ মাওকূফ হাদীস তথা সম্মানিত সাহাবাগণের কথা, কাজ ও সমর্থন যদি কুরআনের কোন আয়াত বা অন্য কোন বিশুদ্ধ মারফূ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, সেক্ষেত্রে মাওকূফ হাদীসের উপরও আমল ওয়াজীব। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং মুমিনগণের বিপরীত পথে অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট, আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।'[৩১৫]

এখানে মুমিন বলতে সাহাবায়ে কেরামগণকে বুঝানো হয়েছে। তৎকালে সাহাবায়ে কেরামগণই মুমিন বলে সম্বোধিত হতো। যার ইঙ্গিত রয়েছে এই আয়াতে,

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করল।'[৩১৬]

এছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي

'আমার সুন্নাতের অনুসরণ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। আর আমার পরে সৎপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত পথ।'[৩১৭]

উল্লেখ্য, মাওকূফ হাদীসকে আছারে সাহাবাও বলা হয়। আছারে সাহাবা জানা, মানা ও তার উপর আমল করা তখনই আবশ্যক হবে, যখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন দ্বারা বা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস দ্বারা নিষ্পত্তি করা যাবে না। অতএব, যেসব হাদীসে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেসব হাদীস উপরোদ্ধৃত মুলনীতির মানদন্ডে বিচার্য হওয়া জরুরী।

আপত্তি ২০ ঃ পবিত্র কুরআন স্পষ্ট বলছে,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

[৩১৫] সুরা নিসা ঃ ১১৫।
[৩১৬] সুরা আল ফাতহ ঃ ১৮।
[৩১৭] শরহু মা'আনীল আছার- হাঃ ৪৬৮।

'অতঃপর যদি সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তার জন্য সে স্ত্রী আর হালাল হবে না, যতক্ষণ না স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহন করে।'[৩১৮]

এখানে যে তালাকের আলোচনা করা হয়েছে তা একত্রিত তিন তালাক নাকি পৃথক পৃথক তিন তালাক, এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তাছাড়া উক্ত আয়াতের পূর্বোক্ত আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে, তারা যালেম।'[৩১৯]

এখানেও একত্রিত ভাবে তিন তালাক দেওয়াকে 'হারাম' বলা হয়নি। অতএব, এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে।

জবাব ঃ সমস্ত মুফাচ্ছিরীনে কেরামগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, এই আয়াতে তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয়েছে। কোনভাবেই একত্রিত তিন তালাক নয়। কারন একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করা সর্বসম্মতিতে বিদআত, আর কুরআন কোনভাবেই বিদআত শিক্ষা দিতে পারে না। দুঃখের ব্যাপার হলো অজ্ঞতার কারনে নাকি অন্তরে বক্রতার কারনে জানিনা, আপত্তিকারীরা এই 'তিন' আর 'তৃতীয়'র মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করতে চান না। মুলত 'তিন' আর 'তৃতীয়'র মাঝে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। যেমন কেউ বলল, 'আমি এই মাসে তিনবার সিঙ্গাপুর সফর করেছি'। এই কথা দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, লোকটি একমাসের মধ্যেই তিনবার সিঙ্গাপুর সফর করেছে। আবার যদি বলে, 'আমি এই মাসে তৃতীয়বার সিঙ্গাপুর সফর করেছি'। এই কথা দ্বারা কিন্তু এটা বুঝা যায় না যে, লোকটি একমাসের মধ্যেই তিনবার সিঙ্গাপুর সফর করেছে, বরং বুঝা যায় লোকটি একমাসের মধ্যে কেবল একবার সিঙ্গাপুর সফর করেছে আর এটি তার তৃতীয় সফর। অনুরূপ একমাসে তিনবার রক্তদান করা আর তৃতীয়বার রক্তদান করা কিংবা একবছরে তিন জমাত সম্পন্ন করা আর তৃতীয় জমাত সম্পন্ন করা কিন্তু এক নয়। তালাক সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত আয়াতেও এরূপই বলা হয়েছে যে, এই বিধান তৃতীয় তালাক প্রদানের পরে প্রযোজ্য। এক তুহরে তিন তালাক প্রদানের পরে নয়। আর পূর্বের আয়াত দ্বারাও একত্রিত তিন তালাক যে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে, এ বিষয়েও কোন ইমামে মুজতাহিদ, মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস, মুফতি আজ অবধি কোন প্রকার দ্বিমত ব্যক্ত করেন নি।

তাছাড়া, এই আয়াতটি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত। কেমন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ তা একটু স্পষ্ট করা দরকার। পবিত্র কুরআনের সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে (প্রচলিত অনুবাদ

[৩১৮] সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৩০।
[৩১৯] সূরা বাক্বারাহ ঃ ২২৯।

অনুযায়ী) স্ত্রীদের প্রহার করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ, কি দ্বারা, কিভাবে, কোথায় কোথায় এবং কতক্ষণ ধরে প্রহার করবে তা বলা হয়নি। এখন যদি কেউ তার স্ত্রীকে দিনে রাতে বেদম প্রহার করতে থাকে আর বলে কুরআনে শুধু মারতে বলা হয়েছে। কতক্ষণ, কি পরিমাণ, কিভাবে, কি দ্বারা এবং কোথায় কোথায় মারা নিষেধ তা বলা হয়নি। তাই অবিরাম মারতে হবে। এটি যেমন ভুল, তালাক সংশ্লিষ্ট এই আপত্তিটিও তেমনি অনুর্বর ও পশ্চাৎমুখী সিদ্ধান্ত। নিঃসন্দেহে আয়াতের অপব্যবহার।

এছাড়াও, (১) সূরা বাক্বারার ২২৯-২৩০ নং আয়াতের প্রকৃত তাফসীর ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি। (২) উক্ত সূরার ২৩০ নং আয়াতের শুরুতে 'فَ–অতঃপর' দ্বারা তালাক একের পর এক এভাবে পর পর হওয়া ও সূরা আত-তালাকের ১-২ নং আয়াতের তাৎপর্য দ্বারা তালাক ইদ্দত অনুযায়ী ও পৃথক পৃথকভাবে হওয়া দলিল হিসাবে যেমন বলিষ্ঠ, তেমন যথেষ্টও। (৩) তালাক পৃথক পৃথক তিন তুহরে হওয়ার বিধান সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যা শরয়ী তালাকের বর্ণনায় উল্লেখ করেছি। (৪) সীমা লঙ্ঘন করাটাই হল একত্রিত তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার বড় দলিল। যেমন বলা হয়েছে, 'যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্য নারী কামনা করে, তারা সীমা লঙ্ঘনকারী।'[৩২০] এর অর্থ এই নয় যে, অন্য নারীর সঙ্গে যেনা করা হালাল হবে (নাউযুবিল্লাহ)? (৫) একত্রিত তিন তালাক রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ক্রোধের কারন যা উম্মতের জন্য মস্তবড় গযবের ব্যাপার। (৬) সর্বোপরি, এই প্রকারের তালাক যে 'বিদআত' এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন বিদ্বান দ্বিমত করেন নি। এখন যদি এই আপত্তি মেনেও নিই তাহলে কি পরোক্ষভাবে এ কথার সমর্থন করা হচ্ছে না যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 'বিদআত তালাক' এর শিক্ষা দিয়েছেন? আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন। (এই আয়াত সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের হিল্লা সংক্রান্ত 'আপত্তি ও জবাব' পরিচ্ছেদে দেখুন।)

আপত্তি ২১ ঃ এ কাজ হারাম হলেও তা মোটেও নিষ্ফল নয়। কেননা, হারাম কাজের দ্বারা কাজের ধরণ পরিবর্তিত হয়, কানুন পরিবর্তিত হয় না। একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া অবশ্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু স্বামী যখন তার অধিকারে থাকা তিন তালাক একবারে দিয়ে ফেলেছে, তাহলে তিন তালাক কার্যকরী হবে না কেন? ধরুন, কোন ব্যাংক থেকে আপনি তিন হাজার টাকা লোন নিলেন, আর পাশবইতে উক্ত তিন হাজার টাকা তিন মাসে আদায় করার নিয়ম লিখিত আছে। কিন্তু আপনি তিন হাজার টাকা তিন মাসে না দিয়ে একবারে পরিশোধ করে দিলেন। এখন নিয়ম বহিঃর্ভূত বলে কি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এ কথা বলার সুযোগ আছে যে, তিন হাজার টাকাকে আমরা এক হাজার টাকাই হিসাব করবো?

[৩২০] সুরা মু'মিনুন ঃ ৬-৭, সুরা মা'আরিজ ঃ ৩০-৩১।

জবাব ঃ ধরুন, আসরের সালাতের আগে আগে ধর্মপ্রাণ কিছুলোক একটি জরুরী বৈঠকে জড়ো হলেন। তারা চিন্তা করলেন যে, বৈঠক থেকে বারবার উঠে সালাত আদায় করতে গেলে বৈঠকের ক্ষতি হতে পারে। তাই তারা বৈঠক আরম্ভ করার পূর্বেই আসর, মাগরীব ও ইশা এই তিন ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করে নিলেন। এমতাবস্থায় সালাত তিন ওয়াক্ত আদায় হবে নাকি এক ওয়াক্ত? ইসলামে কোন কিছু যোগ করতে হলে যেমন দলিলের প্রয়োজন, তেমনি বাদ দিতে গেলেও দলিল প্রয়োজন। তাছাড়া, ক্ষণস্থায়ী নিছক একটি লোনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মত একটি দীর্ঘস্থায়ী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে বিনা দলিলে বিচার করা কতটা যৌক্তিক হবে বিচারের ভার পাঠকগণের হাতে ন্যস্ত রইল। ঋণের টাকা আদান-প্রদানের নিয়মের উপর ভিত্তি করে যদি তালাক প্রদানের নিয়ম নির্ধারিত হয়, তাহলে কুরআন, সুন্নাহ, শরীয়ত এসবের কি দরকার? আর আপত্তিকারীরা পবিত্র কুরআন-সুন্নাহকে ব্যাংকের পাশবই ভাবতে শুরু করেছেন কোন দুঃসাহসে?

মাওলানা মওদুদীও স্বীয় তাফহীমে এরূপ একটি উপমা পেশ করতে গিয়ে কুরআনের সাথে নির্লজ্জ মশকরায় মেতে উঠেছেন। তিনি বলেন, 'কোন এক পিতা নাকি তার সন্তানকে তিনশত টাকা দিয়ে বললেন, তুমিই এ টাকার মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পারো। এরপর পিতা ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন, যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পারো। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ করো কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেলো তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বেরই হচ্ছে না, অথবা পুরো তিনশত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বের হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে তাহলে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে কি?'[৩২১]

আমাদের প্রথমে একটা বিষয় স্থির করতে হবে যে পবিত্র কুরআনে তালাক সম্পর্কিত যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে তা কি উপদেশ নাকি শরয়ী নির্দেশ। একটি সংসারের সাথে বহু নিস্পাপ জীবন জড়িয়ে থাকে । তালাকের কারনে পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যে ধাক্কা লাগে তা মোটেও হালকা নয়। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে মাওলানা মওদুদী সাধারণ উপদেশ বলে পরোক্ষভাবে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, এসব বিধি-বিধান তুমি চাইলে মানতেও পারো আবার নাও মানতে পারো। এটি তোমার ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন মওদুদীর ভাষায় 'যেভাবে ইচ্ছা

[৩২১] তাফহীমুল কুরআন, কৃত মাওলানা আবুল আলা মওদুদী- শেষ খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২১০।

তুমি এ টাকা খরচ করতে পারো'। তিনি আরও বলেন, 'যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে' আমাদের প্রশ্ন হলো মহান আল্লাহ যেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া কোন অন্যায় ক্ষেত্রে খরচ করার অধিকার দিচ্ছেন না, সরাসরি সীমালঙ্ঘন বলে নিষেধ করে দিয়েছেন সেখানে আপনি কোথাকার কে যে অন্যায় ক্ষেত্রেও খরচ করার এখতিয়ার দিয়ে দিবেন? সবশেষে বলছেন 'এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে কি?' এটিকে উপদেশ মনে না করে নির্দেশ মনে করুন, তারপর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন। দুঃখ হয়, কোথায় তালাক আর কোথায় টাকা! কিসের সাথে কিসের উপমা! আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

আপত্তির যে আওয়াজগুলো সবচেয়ে জোরালো ঃ

আপত্তি ২২ ঃ একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গন্য করার সিদ্ধান্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর ইজতিহাদ বিরোধী। আর খুলাফায়ে রাশেদীনের ইজতিহাদের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজীব। যেমন হাদীসে এসেছে,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي

'আমার ও আমার পরে সৎপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক।'[৩২২]

কাজেই হযরত ওমর রাঃ এর নির্দেশকে উপেক্ষা করা বস্তুতঃপক্ষে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশকেই উপেক্ষা করার শামিল।

জবাব ঃ (১) প্রশ্নোত্থাপিত হাদীসে নিশ্চয় এ কথা বলা হয়নি যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্দেশ রক্ষা করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নতকে উড়িয়ে দিতে হবে। তদুপরি কোন ইমাম, তাবেয়ী, সাহাবী, খলিফা, যতবড় জগৎশ্রুদ্ধ ব্যক্তিত্বই হোক না কেন, কারো ইজতিহাদ দ্বারা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত আমল কস্মিনকালেও বাতিল হতে পারে না। পক্ষান্তরে উক্ত আমল দ্বারা যে কারো ইজতিহাদ বাতিলযোগ্য। ৮ নং আপত্তির জবাব দ্রষ্টব্য।

(২) এখানে سنة الخلفاء তথা 'খলিফা' এর বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্ত। এখন যদি এককভাবে হযরত ওমর রাঃ এর সিদ্ধান্ত গ্রহন করি, তাহলে ইসলামের প্রথম ও প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করা হয়। আর যদি হযরত আবু বকর রাঃ এর সিদ্ধান্তকে গ্রহন করি,

[৩২২] মুয়াত্তা- হাঃ ৭০৯, শরহু মা'আনীল আছার- হাঃ ৪৬৮।

তাহলে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সিদ্ধান্তকেও গ্রহন করা হয়। এমতাবস্থায় হাদীসের স্বকীয়তা বজায় রাখতে হলে কোনটি গ্রহনীয় হবে? আবু বকর রাঃ এর সিদ্ধান্ত নাকি ওমর রাঃ এর? আমাদের বুঝতে হবে, এখানে মুলত যে সুন্নতের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তা রাসুলুল্লাহ সাঃ এরই সুন্নত। কেননা, সুন্নাহ'র মালিকানা শুধুই রাসুলুল্লাহ'র। এতে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী, إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ 'তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা না করো, সেজন্য আমি আমার রব ও তোমাদের রবের শরণাপন্ন হয়েছি।'[৩২৩] এখানে আমার রব ও তোমাদের রব মিলে যেমন রব একজনই, তেমনি উদ্ধৃত বাক্যেও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নত ও খলিফায়ে রাশেদের সুন্নত বলতে মুলত রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নতকেই বুঝানো হয়েছে। যেগুলো খলিফাগণ অনুসরণ করেছেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছনআনী রহঃ বলেন,

ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত বলতে তাঁদের সে সমস্ত আদেশ-নিষেধকেই বুঝানো হয়েছে যেগুলো রাসুলুল্লাহ সাঃ এর আদেশ-নিষেধের সাথে মিলে যায়।'[৩২৪]

কাজেই ঈমানের দাবি হলো, একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নতের উপরই অটল থাকা। কোনভাবেই নির্দিষ্ট একজন খলিফার সিদ্ধান্তকে এককভাবে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আরেক প্রধান খলিফার সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা নয়।

(৩) প্রশ্নোল্লেখিত হাদীসে মুলত দু'টো মূলনীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই মুলনীতির ভিত্তিতেই গৃহীত হবে কোন সাহাবীর কথা কিভাবে অনুসরণীয়। যথাঃ

(এক) কোন নবোদ্ভূত সমস্যা সরাসরি কালামুল্লাহ অথবা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস দ্বারা মীমাংসিত নয়, তবে সাহাবাগণ বিষয়টি নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান করেছেন, যেমন হযরত আলী রাঃ এর পেশকৃত ফরায়েযে আউল সংক্রান্ত ফতোয়ায়ে মিম্বরিয়্যাহ। এক্ষেত্রে সাহাবাগণের উক্ত ইজতেহাদকে শরয়ী আইন হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক। যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী দ্বারা শিকার আহারের হুকুম কি তা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস দ্বারা পুরোপুরি মীমাংসিত নয়, কিন্তু এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে সুরাহা পেশ করেছেন। যেমন,

عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل

[৩২৩] সুরা দুখান ঃ ২০।
[৩২৪] সুবুলুস সালাম- ২/১১ পৃঃ, তুহফাতুল আহওয়াযী- ৩/৪০ পৃঃ।

'নাফে' হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ বলতেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যদি (আল্লাহর নামে ছেড়ে দেওয়ার পর) কোন হালাল প্রাণী শিকার করে তবে তা ধরে মেরে ফেলুক কিংবা জীবিত ধরুক সর্বাবস্থায় তা খাওয়া বৈধ।'[৩২৫]

এরূপ কালের পরিক্রমার সাথে সাথে বহু নতুন সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে, যেগুলির সমাধান সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবাগণের সম্মিলিত আমল হতেও পাওয়া যায় না।[৩২৬] এক্ষেত্রে সমসাময়িক মুহাক্কিক ইসলামী আইনজ্ঞগণ নিজেদের গবেষণালব্ধ ইজতিহাদ ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে সমাধান পেশ করবেন তাও সকল উম্মতে মুসলিমার জন্য শিরোধার্য। যদি তাতে দুটি বিষয়ের নিশ্চিত প্রতিফলন থাকেঃ ১. কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণানুকূল্য ও ২. ইসতিহসানের প্রাধান্য। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ রয়েছে,

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

'শ্রবণ করা ও মান্য করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, তা তার নিকট পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয়ই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না (আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখনই অবাধ্যতার নির্দেশ আসবে তখন তা আর শুনবেও না, মানবেও না।'[৩২৭]

হযরত উম্মে হুসাইন রাঃ হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলতে শুনেছেন,

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا له وأطيعوا

'(রাসুলুল্লাহ সাঃ সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন), যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও আমেল (কর্তা) বানিয়ে দেওয়া হয়, এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তোমরা তার কথা মনযোগ সহকারে শুনবে ও মান্য করবে।'[৩২৮]

[৩২৫] মুআত্তা- হাঃ ১৮০৫।
[৩২৬] এটি আমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারনে আপাত মনে হয় কিংবা আমরা সমাধান খুঁজে বের করার যোগ্যতা রাখি না। মূলত ওহী থেকে আসমান জমিনের কোন কিছুই বাদ পড়ে নি। যেমন, مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ "এই কিতাব হতে কোন কিছুই বাদ পড়েনি (সুরা আনআম ঃ ৩৮)।"
[৩২৭] বুখারী- হাঃ ৬৭২৫, মুসলিম- হাঃ ৪৮৬৯, আবু দাউদ- হঃ ২৬২৮, নাসাঈ- হাঃ ৭৮২৯, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৪৬৬৮।
[৩২৮] মুসলিম- হাঃ ৪৮৬৪, নাসাঈ- হাঃ ৪১৯২, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৭২৬৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর- ২/৩৪২পৃঃ।

لا طاعة لمخلوق في معصية الله

'স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণে যেকোন সৃষ্টির আনুগত্য প্রত্যাখ্যাত।'[৩২৯]

অতএব, যতক্ষণ কুরআন সুন্নাহ ও মানবতার প্রতিকূল্য প্রমাণিত হবে না, ততক্ষণ সম্মানিত মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও ইজমা অনুসরণীয়। অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত।

(দুই) কোন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, কিন্তু কালের আবর্তনে জনকল্যাণের কথা চিন্তা করে ও সমসাময়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে ইসলামী শাসনকর্তাগণ যদি প্রচলিত আইনকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন কিছু সংযোজন করে থাকেন, এক্ষেত্রে উম্মতের উপর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নত অগ্রগণ্য ওয়াজীব, এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র সুন্নতকে অক্ষুন্ন রেখে ও সুন্নতের সাথে সমন্বয় বিধান করে ইসলামী শাসনকর্তাগণ জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে যা কিছু সংযোজন করেন তাও উম্মতের জন্য পালনীয়, যদি এতদুভয়ের মাঝে কোনরূপ বিরোধ না থাকে। যেমন,

حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك

'মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল.... সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ, হযরত আবু বকর রাঃ এবং হযরত ওমর রাঃ এর পবিত্র যুগে জুম'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হতো। এরপর যখন হযরত উসমান রাঃ এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক সমাগম বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান রাঃ জুম'আর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান প্রথম দেওয়া হয় এবং পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।'[৩৩০]

এখানে হযরত উসমান রাঃ কর্তৃক চালুকৃত নতুন নিয়মে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও সাবেক খলিফাগণের নির্দেশনা অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু একত্রিত তিন তালাকের ক্ষেত্রে হযরত ওমর রাঃ এর সিদ্ধান্তকে এককভাবে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দিতে গেলে হযরত আবু বকর রাঃ এর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা হয়। পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের তাৎপর্য ও রাসুলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক এক তালাক গণ্য করার যে রীতি তারও কোনটি অক্ষুন্ন থাকে না।

[৩২৯] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ১০৯৫।

[৩৩০] বুখারী- হাঃ ৮৭৪, তিরমিযী- হাঃ ৫১৬, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১১৩৫।

অর্থাৎ তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ইদ্দত গণনা করা, প্রথম তালাক ও দ্বিতীয় তালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে কি নেবে না, ইদ্দতের পূর্বে বিনা বিবাহে নেবে নাকি ইদ্দত পরবর্তী বিবাহ নবায়নের মাধ্যমে নেবে, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্বামীকে পূর্ণর্বিবেচনার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা নিমিষেই খতম হয়ে যায়। এজন্য আমরা হযরত ওমর রাঃ এর ইজতিহাদকে অস্থায়ী আইনের মর্যাদা দিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আইনকে বুলন্দ রাখার চেষ্টা করি আর হযরত ওমর রাঃ এর নির্দেশনাকেও একেবারে অস্বীকার করি না। প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসে بعدي 'আমার পরে' বাক্যাংশটি এ কথাই নির্দেশ করে।

(৪) সর্বশেষ জবাব এই যে, উসূলে হাদীসের দাবি হল, বিপরীতমুখী দুটি হাদীসের একটি মরফু ও অন্যটি মওকূফ হলে, সেক্ষেত্রে উভয় হাদীসের মাঝে এমনভাবে সমন্বয় বিধান করতে হয় যাতে মরফু হাদীসের হুকুমে কোনরূপ রদবদল না ঘটে। যদি এরূপ সমন্বয় সাধন দূরূহ হয়, সেক্ষেত্রে মওকূপ হাদীসের উপর মরফু হাদীস প্রাধান্য পাবে।

আপত্তি ২৩ ঃ তাহলে কি খুলাফাদের নির্দেশ অমান্য করবো?

জবাব ঃ এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমরাও পাল্টা প্রশ্ন করি যে, খুলাফাদের নির্দেশ মানতে গিয়ে কি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ অমান্য করবো? হ্যাঁ, অবশ্যই খুলাফাদের নির্দেশ মান্য করবো যতক্ষণ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক না হবে। নিচের হাদীসগুলো এই সমস্যা নিরসনে যথেষ্ট হতে পারে।

أن سالم بن عبد الله حدثه : أنه سمع رجلان من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنه فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم

'হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ শামের এক লোক থেকে শুনেছেন, সে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার রাঃ কে প্রশ্ন করেছিলেন তামাত্তু হজ্ব জায়েয নাকি না জায়েয? তিনি বললেন জায়েয। প্রশ্নকারী বললেন, আপনার পিতা তো (ওমার রাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার রাঃ বললেন, আমাকে বল আমার পিতা নিষেধ করেছেন আর রাসুলুল্লাহ সাঃ তা করেছেন, এখন আমার পিতার নির্দেশ মানবো নাকি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ মানবো? প্রশ্নকারী বললেন, বরং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হুকুম-ই

মানতে হবে। তারপর ইবনে ওমার রাঃ বললেন, আসল বিষয় হলো রাসুলুল্লাহ সাঃ তামাত্তু হজ্ব করেছেন।'[৩৩১]

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه و سلم لقول أحد

'মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহঃ... মারওয়ান ইবনে হাকাম রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ও আলী রাঃ কে (উসফান নামক স্থানে) দেখেছি, উসমান রাঃ তামাত্তু হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে আদায় করতে নিষেধ করছেন। আলী রাঃ এ অবস্থা দেখে হজ্জ ও ওমরাহর ইহরাম একত্রে বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন- لبيك بعمرة وحجة (হে আল্লাহ, আমি ওমরাহ ও হজ্জের ইহরাম বেঁধে হাজির হলাম) এবং বললেন, কারো কথায় আমি নবী সাঃ এর সুন্নত বর্জন করতে পারবো না।'[৩৩২]

عبد الرحمن بن يزيد يقول : صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان

'আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান রাঃ মিনায় আমাদের নিয়ে চার রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। এই কথাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ এর নিকট বলা হলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সঙ্গে মিনায় দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছি, আবু বকর রাঃ এর সঙ্গে মিনায় দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছি, ওমর রাঃ এর সঙ্গেও মিনায় দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছি। কাজেই চার রাকাআতের স্থলে আমার ভাগ্যে দু' রাকাআতই থাকুক।'[৩৩৩]

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

[৩৩১] তিরমিযী- হাঃ ৮২৪, মুসনাদ আস সাহাবা- ১৭/৪৭পৃঃ।
[৩৩২] বুখারী- হাঃ ১৪৮৮, মুসলিম- হাঃ ১২২৩, জামেউল আহাদীস- হাঃ ৩৩৬০৭।
[৩৩৩] মুসলিম- হাঃ ১৬২৮, বায়হাক্বী- হাঃ ৫২১৮, দারেমী- হাঃ ১৮৭৪।

'হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জন্নাতে প্রবেশ করবে। শুধু সেই ব্যক্তি নয়, যে জন্নাতে যেতে অস্বীকার করে। সাহাবীগণ বললেন, কে এমন আছে যে জন্নাতে যেতে অস্বীকার করে? রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে জন্নাতে প্রবেশ করবে আর অবাধ্য হয় সেই জন্নাতে যেতে অস্বীকার করে।'[৩৩৪]

عن ابن عباس أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال فلان

'ইবনে আব্বাস রাঃ তাঁর এক ভাষনে লোকদের সতর্ক করতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা যে বলো রাসুলুল্লাহ সাঃ এ কথা বলেছেন আর অমুক এ কথা বলেছেন, এ ব্যাপারে তোমাদের কি এই ভয় নেই যে, তোমাদের কঠিন আযাব গ্রাস করবে কিংবা জমিন তলিয়ে নেবে।'[৩৩৫]

وعن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال الرجل قال فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه و سلم وتقول قال فلان كذا وكذا

'কাতাদাহ হতে বর্ণিত, ইবনে শিরিন কোন এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস শুনালে সে বললো, এই মাসআলাটি সম্বন্ধে অমুক ব্যক্তি এরূপ বলেছে। ইবনে শিরিন ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিলেন, আমি তোমাকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস শুনালাম আর তুমি বলছো, অমুক ব্যক্তি এরূপ বলেছে?'[৩৩৬]

স্বয়ং ফারুকে আযম রাঃ একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষনা করলেন,

يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم مصيبا لأن الله عز و جل كان يريه إنما هو منا الظن والتكلف

'হে লোক সকল! রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। কারন আল্লাহ তাঁকে বাতলে দেন। আর আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল অনুমাণ ও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।'[৩৩৭]

তদুপরি, প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর রাঃ এর নির্দেশ লঙ্ঘন করে কোন খুলাফার নির্দেশ মান্য করার কথা বলছেন? হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর খেলাফতের

[৩৩৪] বুখারী- হাঃ ৬৮৫১।
[৩৩৫] আল ইনসাফ- ৫২ পৃঃ, মিফতাহুল জান্নাহ- ৬২ পৃঃ, ক্বাওয়ায়িদুত তাহদীস- ২৬৯ পৃঃ।
[৩৩৬] আল ইনসাফ- ৫২ পৃঃ, মিফতাহুল জান্নাহ- ৬২ পৃঃ, ক্বাওয়ায়িদুত তাহদীস- ২৬৯ পৃঃ।
[৩৩৭] আবু দাউদ- হাঃ ৩৫৮৮, বায়হাক্বী- হাঃ ২০১৪৫।

আগাগোড়ায় যে একত্রিত তিন তালাকে এক তালাক গণ্য করার বিধান নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু ছিল এবং সেই বিধানের উপর সমকালীন সমুদয় সাহাবীর ইজমাও ছিল তা অমান্য করবেন কোন অধিকারে? আর হযরত ফারুকে আযম রাঃও যে একসাথে তিন তালাক উচ্চারণকারীদের আশি বেত্রাঘাতের বিধান চালু করেছিলেন তা গ্রহন করলেন না কেন? এটি গ্রহন করলে বিদআতি পন্থায় তালাক প্রদানের প্রকোপ কমত না বাড়ত? তিনি মদ্যপায়ীদের মাথা মুড়িয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করতেন। এটি কেন গ্রহন করলেন না? তিনি সালাতে উঁচু আওয়াজে 'ছানা' পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি কেন পরিহার করলেন? তিনি হালালাকারীদের ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ প্রস্তারাঘাত করতেন। তাঁর এই বিধান পরিত্যাগ করে উল্টো অনুমোদন দেন কোন অধিকারে? তিনি হজ্বে তামাত্তু নিষেধ করতেন। এটিও কেন উপেক্ষা করলেন?

আপত্তি ২৪ ঃ প্রচলিত মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রবক্তাগণ একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্তে একমত, কাজেই সমস্ত মুকাল্লিদের উপর এ সিদ্ধান্ত অকপটে মেনে নেয়া ওয়াজীব। কেননা, মুকাল্লিদ ব্যক্তি মাত্রই স্বীয় মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করতে বাধ্য।

জবাব ঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক রূপেই গণ্য হতো। হযরত আবু বকর রাঃ এর শাসনামলের দীর্ঘ আড়াই বছর যাবৎ লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামও এই সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যমত ছিলেন। এমনকি হযরত ওমর রাঃ পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময় যাবৎ এ বিষয়ে তাঁদের সাথে একমত ছিলেন। এমতাবস্থায় ইমামগণের ঐক্যমত গ্রহনীয় হবে নাকি সাহাবাগণের ঐক্যমত গ্রহনীয় হবে? পূর্বোক্ত প্রশ্নের জবাবেও দলিলসমেত উল্লেখ করেছি, সম্মানিত মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ ও ইজমা ততক্ষণ অনুসরণীয়, যতক্ষণ কুরআন সুন্নাহ ও মানবতার প্রতিকূল্য প্রমাণিত হবে না। আর যখনই কুরআন সুন্নাহর সাথে বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাজ্য। কুরআন সুন্নাহ'য় এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। ৮ নং আপত্তির জবাব দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন সুন্নাহ'র সাথে বিরোধপূর্ণ হলে নিজ মাযহাবীয় ইমামের মতকে পরিত্যাগ করাই যে মাযহাবের নিরেট অনুসরণ, তা সম্মানিত ইমামগণের পোষ্য মুলনীতি দ্বারাই সুসাব্যস্ত। এ ব্যাপারে সম্মানিত ইমাম চতুষ্টয়ের অসংখ্য সতর্কবাণী রয়েছে। তম্মধ্য থেকে অন্ততঃ দুটি করে সতর্কবাণী এক্ষণে অভিনিবেশ করছি,

- ইমাম আযম আবু হানিফা রহঃ বলেন,

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

'কারোর জন্য আমাদের কথা দলিলরূপে গ্রহন করা জায়েয নয় যতক্ষন না সে জানবে

আমাদের এই কথার উৎস কী।'[৩৩৮]

إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي

'যদি আমি এমন কোন কথা বলি যা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হাদীসের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তোমরা আমার কথাকে পরিত্যাগ করবে।'[৩৩৯]

- ইমাম মালেক রহঃ বলেন,

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

'আমি নিছক একজন মানুষ। ভুলও বলি, শুদ্ধও বলি। তাই তোমরা আমার মতামতের প্রতি গভীর খেয়াল রেখো। এগুলোর যতটুকু কুরআন এবং হাদীসের সাথে মিলে তা গ্রহন করো আর যা কিছু গরমিল দেখবে তা পরিহার করো।'[৩৪০]

ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم

'রাসুল সাঃ এর পরে যেকোন ব্যক্তির কথা কিছু গ্রহনীয় আর কিছু বর্জনীয় হতে পারে। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সব কথাই গ্রহনীয়।'[৩৪১]

- ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন,

كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني

'আমি যা কিছুই বলেছি, তার বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীস এসে গেলে, তখন রাসুল সাঃ এর হাদীসই হবে অগ্রগণ্য। অতএব, কেউ আমার অন্ধ অনুসরণ করো না।'[৩৪২]

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت

---

[৩৩৮] টীকা-আল বাহরুর রায়েক্ব, কৃত ইবনে আবেদীন- ৬/২৯৩পৃঃ।
[৩৩৯] আল ইকায, কৃত ফাল্লানী- পৃঃ ৫০।
[৩৪০] জামেউস সগীর, কৃত ইবনে আব্দিল বার- ২/৩২পৃঃ।
[৩৪১] জামেউস সগীর, কৃত ইবনে আব্দিল বার- ২/৯১পৃঃ।
[৩৪২] ইবনে আসাকীর (বিশুদ্ধ সনদে)।

‘যখন তোমরা আমার কিতাবে রাসুল সাঃ এর সুন্নাহ বিরোধী কোন কিছু পাবে, তখন তোমরা রাসুল সাঃ এর সুন্নাহ অনুসারে কথা বলবে আর আমি যা বলেছি তা বর্জন করবে।’[৩৪৩]

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ যিনি ইমামগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস সংকলনকারী ছিলেন, তিনি বলেন,

لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا

‘তোমরা আমার অন্ধ অনুসরণ করো না এবং মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, ছাওরী এঁদেরও কারো অন্ধ অনুসরণ করো না, বরং তাঁরা যেখান থেকে (সিদ্ধান্ত) গ্রহন করেন তোমরাও সেখান থেকে গ্রহন করো।’[৩৪৪]

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

‘যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের তীরে উপণীত হলো।’[৩৪৫]

এছাড়াও, হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রতাপশালী ফক্বীহ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে ইবনে হাযম রহঃ এর উক্তি নকল করছেন,

التقليد حرام لا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان

‘অন্ধ অনুসরণ হারাম। রাসুলুল্লাহ সাঃ ছাড়া অন্য কারো কথা বিনা দলিলে (শরিয়ত হিসেবে) গ্রহন করা বৈধ নয়।’[৩৪৬]

আর ইবনে হাযম রহঃ এর এই বক্তব্য কাদের জন্য প্রযোজ্য তাও তিনি স্পষ্ট করেছেন,

وفيمن يكون عامياً ، ويقلد رجلاً من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ ، وأن ما قاله هو الصواب ألبتة ، وأضمر في قلبه ألا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه

‘এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য, যে লোক সাধারণ পর্যায়ের এবং কোন ইমামের তাকলীদ করে আর মনে করে, ইমাম কোন ভুল করতে পারেন না। আরও বলে যে, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ মত পেশ করেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তার মতের বিরুদ্ধে যত দলিলই আসুক, তাকলীদ আমি ছাড়ব না।’[৩৪৭]

---

[৩৪৩] আল মাজমু’, কৃত ইমাম নববী রহঃ- ১/৬৩পৃঃ।
[৩৪৪] ই’লামুল মুয়াক্কিয়ীন- ২/৩০২পৃঃ।
[৩৪৫] আল মানাক্বীব- পৃঃ ১৮২।
[৩৪৬] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩২৫ পৃঃ।
[৩৪৭] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩২৮ পৃঃ।

‘হুজ্জাহ’ গ্রন্থকার আরও বলেন,

فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة ، أو جميع أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه – أنه قد خالف إجماع الأمة كلها

‘জেনে রেখো! যে ব্যক্তি আবু হানিফা রহঃ, মালেক রহঃ, শাফেয়ী রহঃ অথবা আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ এর মধ্য হতে যে কারো সব কথা মেনে নেয় ও অনুসরণ করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-সুন্নাহর বাণী গ্রহন করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সেই ব্যক্তি বিশেষের ভাষ্যের অনুকূল না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা উম্মতের বিরোধিতা করল।’[৩৪৮]

তিনি আরও বলেন,

فإن بلغنا حديث عن الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه ، وتركنا حديثه ، واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا ، وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين

‘যখন রাসূলে মা’ছুমের কোন সহিহ সনদের হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছে যায়, যার আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয এবং তা হয় মাযহাবী ইমামের মতের পরিপন্থী, এমতাবস্থায় রাসূলের হাদীস বর্জন করে আমরা যদি ইমামের মত অনুসরণ করি তাহলে আমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের দিন আমরা কি অজুহাত পেশ করবো?[৩৪৯]

আল্লামা আবু বকর সুয়ুতী রহঃ স্বীয় ‘মিফতাহ’তে এ প্রসঙ্গে ইমাম আওযায়ী’র উক্তি নকল করেছেন,

وعن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأي لأحد في كتاب الله وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم

‘ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয লিখিত ফরমান জারি করেন যে, কিতাবুল্লাহর হুকুমের সামনে কোন ব্যক্তির রায়ের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। আইম্মায়ে মুজতাহদীনের রায় কেবলমাত্র ঐসব ক্ষেত্রেই বিবেচ্য হবে, যেসব ক্ষেত্রে

---

[৩৪৮] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩২৬ পৃঃ।
[৩৪৯] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩২৯ পৃঃ।

আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূলের বিধান অনুপস্থিত। আর যেক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কোন সুন্নাহ রয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কারো রায় প্রদানের কোন অধিকার নেই।'[৩৫০]

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে, 'বর্তমান যুগে এই মাযহাব অনুসারীদের মধ্যেও এমন একদল সংকীর্ণমনা আলেম রয়েছেন যারা বলে বেড়ান, কোন মুকাল্লিদের সামনে নিজ মাযহাবের ইমামের বক্তব্যের বিপরীতে যদি কোন কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ হাদীসও দলিল হিসেবে চলে আসে, তাহলেও মুকাল্লিদ কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ হাদীস পরিত্যাগ করবে এবং স্বীয় ইমামের মতের উপর অবিচল থাকবে।' অথচ এ ব্যাপারে খোদ ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর একটি মূল্যবান অভিমত প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বান আল্লামা ইবনুশ শিহনা যিনি শায়খ ইবনুল হুম্মামের উস্তাদ ছিলেন, তিনি 'হেদায়াহ'র ভাষ্যগ্রন্থের শুরুতে লিখেন,

إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به،

'হাদীস সহিহ হলে তা মাযহাবের বিরুদ্ধে হলেও হাদীসের উপর আমল করা হবে। আর এটিই হবে তার মাযহাব। মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি উক্ত হাদীস মতে আমল করার কারনে হানাফী মাযহাব থেকে খারিজ হয়ে যাবে না।'[৩৫১]

ইমামগণ কি বলে গেলেন, আর নামধারী অনুসারীরা কি বলে বেড়াচ্ছেন? এজন্য কোন কোন বিদ্বান দাবি করেছেন, বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে ইমামের বক্তব্য পরিহার করাই হল প্রকৃত এবং পূর্ণ তাকলীদ। যেমন প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহঃ তাকলীদের স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

فطائفة قد تعصبوا في الحنفية تعصبا شديدا والتزموا بما في الفتاوى التزاما سديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا أو أثرا صريحا على خلافه وزعموا أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة فترك ما خالف الحديث الصحيح رأي سديد وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد

'একদল মানুষ হানাফী হওয়ার বিষয়ে প্রচণ্ড গোঁড়ামীতে লিপ্ত হয়েছেন। বিশুদ্ধ কোন হাদীস বা সাহাবী-তাবেয়ীর মত পেলেও তার বিপরীতে ফতাওয়া-মাসাইলে যা পেয়েছেন তা হুবহু অনুসরণ করছেন। তারা ধারণা করেন যে, এ হাদীস যদি বিশুদ্ধ হতো তবে মাযহাবের সম্মানিত ইমাম তা গ্রহন করতেন এবং এর বিপরীতে মত

[৩৫০] মিফতাহুল জান্নাহ- ৬২ পৃঃ, আল ইনসাফ- ৫২ পৃঃ, ক্বাওয়ায়িদুত তাহদীস- ২৬৯ পৃঃ।
[৩৫১] রদ্দুল মুহতার- পৃঃ ১৬৬।

দিতেন না। এটি তাদের অজ্ঞতার কারনে। ইমামের কথার উপরে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইমামের নিজের বক্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারনেই তারা এরূপ করছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ ইমাম আবু হানীফা রহঃ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সহিহ হাদীস ও আছারকে তাঁর বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য সহিহ হাদীসের বিপরীত সবকিছু পরিত্যাগ করা সঠিক ও যথাযথ মত। আর হাদীসের কারনে ইমামের মত পরিত্যাগ করলে কোনভাবেই তাকলীদ পরিত্যাগ করা হয় না, বরং এরূপ করাই ইমামের প্রকৃত তাকলীদ।[৩৫২]

আর কোন ইমাম কোন কালে এ কথাও বলে যাননি যে, মুকাল্লিদ ব্যক্তি মাত্রই স্বীয় মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করতে বাধ্য। বরং তার উল্টোটাই বলা হয়েছে। এমনকি নির্বিচারে তাক্বলীদ করার ব্যাপারে খোদ ইমাম আবু হানিফা রহঃ ও ঘোর আপত্তি করতেন। ইমাম আবু ইফসূফ যিনি ইমাম আযমের অন্যতম যোগ্য ছাত্র, তাঁর প্রতি ইমাম আযমের একটি উপদেশ নিম্নরূপে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (১৫৮-২৩৩ হিঃ) স্বীয় 'তারীখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

يا يعقوبُ ! لا تكتب كل ما تسمع منّي فإنّي قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غدٍ

'ওহে ইয়াকূব (আবূ ইউসূফ)! আমার কাছ থেকে যা কিছু শুনতে পাও তা সবকিছু লিখো না। কারন, আমি আজ একটা বিষয় সঠিক মনে করি, তা আবার আগামীকাল (প্রয়োজনবোধে) পরিত্যাগ করি। আবার আগামীকাল যে মত গ্রহন করবো তা (হয়ত) পরশু পরিত্যাগ করবো।'

কাজেই, অন্ধ অনুসরণের দোহাই দিয়ে কুরআন সুন্নাহ প্রবর্তিত বিধানের প্রতি জেনে বুঝে কোনরূপ অনাস্থা বা অবজ্ঞা জ্ঞাপন করা স্বয়ং ইমামগণের দৃষ্টিতেও যে মস্তবড় ভ্রষ্টতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং মাযহাবের প্রকৃত দাবি হলো, সব কথাই মনযোগ সহকারে শুনা এবং বিবেক খরচ করে দেখা যে তম্মধ্যে কোন কথাটি উত্তম ও দলিল সম্মত। তারপর সেই কথার উপর আমল করা। একদল লোকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন,

فَبَشِّرْ عِبَادِ ○ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ○ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ○ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

'অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম (দলিল সম্মত), তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ

[৩৫২] জামেউস সগীর- পৃঃ ৩৪।

প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।'[৩৫৩]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহঃ বলেন, এই আয়াত দ্বারা যারা অন্ধ অনুসরণ করে না তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন, وقال مادحا لمن لم يقلد 'তিনি বলেন, এই আয়াতে যারা অন্ধ অনুসরণ করে না তাদেরই প্রশংসা করা হয়েছে।'[৩৫৪]

সুতরাং বুঝা গেল, কুরআন-সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ সমস্ত মাযহাবী মত পরিহার করাই হলো প্রকৃত মাযহাবের দাবি। এতে করে কেউ মাযহাব থেকে খারিজ হয়ে যাবে তো দূরের কথা, বরং মাযহাবকে পরিপূর্ণ আঁকড়ে ধরাই প্রমাণিত হয়।

আপত্তি ২৫ ঃ এই প্রসঙ্গে আপত্তির যে আওয়াজটি সবচেয়ে গুরুতর তা হল, যাই বলুন না কেন, এ বিষয়ে হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর শাসনামলে ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে এবং এ সিদ্ধান্তের উপর যে, একত্রিতভাবে তিন তালাক প্রদান করলে তা তিন তালাক হিসেবেই গণ্য হবে, আর তালাকদত্তা নারীটি অপর স্বামীর সাথে বিবাহিতা ও সহবাসিতা না হওয়া পর্যন্ত পূর্বস্বামী তাকে কিছুতেই পূণঃগ্রহন করতে পারবে না। সুতরাং একত্রিতভাবে তিন তালাককে যারা এক তালাক সাব্যস্ত করে থাকে, তারা মূলত ইজমার বিরোধিতা করে। আর ইজমার বিরোধিতা মহাপাপ।

জবাব ঃ ইজমা কখন অনুসরণীয় তা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। আমরা সবাই অবগত আছি যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় সহ বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রনেতা বিবাহিত নর-নারীর ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে কুরআন নির্দেশিত শাস্তিকে বাড়াবাড়ি আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং গুটিকয়েক রাষ্ট্র ব্যতীত সব দেশেই এ বিষয়ে কুরআনী আইন অচল। পৃথিবীর দেড়'শ কোটিরও বেশি মুসলমানের অধিকাংশই এর কোন প্রতিবাদ করছে না। বরং কুরআন বিরোধী আইনের প্রয়োগের বিষয়ে মৌন সমর্থনের পাশাপাশি মুসলমানদের একটি বড় অংশ তা মেনেও নিচ্ছে। এখন, গোটা পৃথিবীর সবাই মিলে কুরআন বিরোধীতায় একমত হয়েছে বলে কি আমরাও কুরআন বিরোধিতায় লিপ্ত হবো? অধিকাংশের মতের চেয়ে আমাদের দেখা উচিৎ কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত নির্দেশ কী?

বস্তুতঃ এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ অমূলক, অনুর্বর এবং ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিদ্বান এর বিপরীত ইজমা সংঘটিত হয়েছে বলেও দাবি করেছেন। তারা বলেন, একত্রিত তিন তালাকে এক তালাক পরিগণ্য হওয়ার উপরই বিদ্বানগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওজী রহঃ বলেন,

[৩৫৩] সুরা যুমার ঃ ১৭-১৮।
[৩৫৪] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/৩২৫।

وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث

واحدة فتوى أو إقرارا أو سكوتا ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم

'হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর খিলাফতের যুগ হতে হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর খিলাফতের তিন বৎসর কাল পর্যন্ত (সাড়ে পাঁচ বছর) সমুদয় সাহাবীগণই ফতওয়া বা স্বীকৃতি অথবা মৌনসমর্থন দ্বারা এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, একত্রিত তিন তালাক প্রকৃতপক্ষে এক তালাকই। তাই কোন কোন বিদ্বান দাবি করেছেন যে, এটিই শাশ্বত ইজমা।'[৩৫৫]

আর ফারুকী খিলাফতের যুগে বা তারপরে ইজমা সংঘটিত হওয়ার দাবিও সঠিক নয়। কারন, সকল যুগেই এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদ রয়ে গেছে।[৩৫৬] সুতরাং ইজমার দাবি অবান্তর। যে সকল গ্রন্থকার উল্লেখিত বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদের সন্ধান স্ব স্ব গ্রন্থে চয়ণ করেছেন, তাদের নামের একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

- হাফেজ ইবনুল মুনযির রহঃ স্বীয় 'আওসাৎ' গ্রন্থে।
- ইমাম মুয়াররজ সাদ্দোসী রহঃ স্বীয় তাফসীরে।
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নসর মরওয়াযী রহঃ স্বীয় 'ইখতিলাফুল উলামা' গ্রন্থে।
- ইমাম ইবনে মুগীছ মালেকী 'কিতাবুল ওছায়েক' গ্রন্থে।
- ইমাম ইবনে হিশাম কর্তবী রহঃ 'মুফিদুল হুক্কাম' গ্রন্থে।
- ইমাম তাহাবী রহঃ স্বীয় 'ইখতিলাফুল উলামা', 'শরহে মা'আনিল আছার' ও 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থগুলিতে।
- ইমাম আবু বকর রাযী জস্সাস রহঃ স্বীয় 'আহকামুল কুরআনে'।
- আল্লামা মাযেরী রহঃ 'মু'লিম বিফাওয়ায়েদে মুসলিম' গ্রন্থে।
- হাফেজ ইবনে হজম রহঃ তাঁর 'আল মুহাল্লা'তে।
- ইমাম তলামসানী রহঃ 'তফরীয়ে ইবনুল হাল্লাব' এর টীকায়।
- হাফেজুল ইসলাম আল্লামা ইবনে হাজর আল আসক্বালানী রহঃ সহিহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফতহুল বারী'তে।
- ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহঃ স্বীয় 'মাফাতীহুল গায়েব' নামক তাফসীর গ্রন্থে।
- আল্লামা আব্দুস সালাম ইবনে তায়মিয়্যাহ রহঃ 'মুনতাক্বাল আখবার' গ্রন্থে।
- ইমাম নববী রহঃ সহিহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে।
- আল্লামা কসতালানী রহঃ সহিহ বুখারীর টীকা 'ইরশাদুস সারী' গ্রন্থে।
- আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহঃ সহিহ বুখারীর টীকাগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী'তে।

[৩৫৫] ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন- ৩/৩৪পৃঃ।
[৩৫৬] পঞ্চম অধ্যায়ে 'বিদ্বানগণের মতভেদ' দ্রষ্টব্য।

- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহঃ 'দুর্‌রুল মুখতার' এর টীকাগ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতারে'।
- আল্লামা কহস্তানী রহঃ 'জামেউর রমুয' গ্রন্থে।
- আল্লামা শাইখজাদা রহঃ 'মুনতাক্বাল আবহুর' নামক ফিকহ পুস্তকের টীকা 'মাজমুউল আনহার' গ্রন্থে।
- আল্লামা মাহমুদ আলুসী রহঃ স্বীয় তাফসীর 'রুহুল মা'আনী'তে।
- আল্লামা ইবনে আলুসী রহঃ স্বীয় 'জালাউল আইনাইন' গ্রন্থে।
- আল্লামা সৈয়দ আহমদ তাহতাবী 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের টীকায়।
- আল্লামা নিশাপুরী রহঃ স্বীয় তাফসীর 'গরায়েবুল কুরআন' গ্রন্থে।
- আল্লামা ইবনুত তামযীদ রহঃ 'তাফসীরে বায়যাবী'র টীকায়।
- শায়খুল ইসলাম ইমাম তক্বীউদ্দিন ইবনে তায়মিয়্যাহ রহঃ স্বীয় 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে।
- হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী রহঃ স্বীয় 'ই'লাম, 'ইগাছা' ও 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থসমূহে।
- আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীরে ইয়ামানী রহঃ 'বুলুগুল মারাম' এর টীকা 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে।
- আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী শওকানী রহঃ 'মুনতাকা'র ভাষ্যগ্রন্থ 'নায়লুল আওত্বারে'।
- আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী রহঃ তদীয় 'তাফসীরে মাযহারী'তে।
- আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী রহঃ 'শরহে বিকায়া'র টীকাগ্রন্থ 'উমদাতুর রে'আয়া'তে।
- আল্লামা নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান রহঃ তদীয় 'রওযাতুন নাদিয়া' ও 'মিসকুল খিতাম' গ্রন্থদ্বয়ে।
- আল্লাম সৈয়দ আবু তৈয়ব শামসুল হক রহঃ 'দারাকুতনী'র টীকাগ্রন্থ 'মুগনী'তে ও 'আওনুল মা'বুদ' নামক সুনানে আবু দাউদের ভাষ্যগ্রন্থে।

এছাড়াও বহু গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা যায় যেখানে বিদ্বানগণের মতভেদ আলোচিত হয়েছে। এরপরেও কি ইজমার দাবি অসার নয়?

প্রকৃত প্রস্তাবে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর খিলাফতের আগাগোড়ায় সমুদয় সাহাবীগণই যে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করতেন, এতে যেমন কোন প্রকার শুবাহ সন্দেহের অবকাশ নেই তেমনি এটিই

সর্বজনবিদিত ইতিহাস। প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা কালয়ুবীসহ বহু জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তাগণ এর স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।[৩৫৭]

তবে, তাবেয়ী বিদ্বানগণের যুগে এসে একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কে মতভেদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে যুগেও তাঁদের মধ্যে বৃহৎ একটি দল ছিল, যাঁরা একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করেছেন। তাঁদের কতিপয় হল ঃ

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ এর প্রতিপালিত এবং বিশিষ্ট ছাত্র হযরত ইকরিমা রাঃ (২৫-১২৫ হিঃ) একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য হওয়ার ফতওয়া প্রদান করতেন।[৩৫৮]
- হযরত ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম রহঃ হযরত আইয়্যুব সখতিয়ানী রহঃ এর মাধ্যমে হযরত ইকরিমা রাঃ এর উল্লেখিত ফতওয়া বর্ণনা করেছেন।[৩৫৯]
- বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে আবি রিবাহও (২৭-১১৫ হিঃ) এই অভিমত পোষণ করতেন।[৩৬০]
- হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর অন্যতম ছাত্র হযরত ত্বাউস রহঃও (১৬০হিঃ) অনুরূপ ফতওয়া প্রদান করতেন।[৩৬১]
- হযরত আমর ইবনে দীনার রহঃও এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।[৩৬২]
- স্বনামধন্য তাবেয়ী ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ নখয়ী রহঃও (৪৬-৯৬ হিঃ) একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে গণ্য করতেন।[৩৬৩]
- হযরত যাবের ইবনে যায়েদ রহঃও (২১-৯৬ হিঃ) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।[৩৬৪]
- আহলে বায়তগণের মধ্যে হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন এর দুই পুত্র ইমাম যায়েদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন যিনি ইমাম বাকের নামে প্রসিদ্ধ এবং তদীয় পুত্র ইমাম জাফর সাদিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী এবং ইমাম হাসান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী এবং রেজা ইবনে জাফর সাদিক এবং ইমাম কাসেম,

---

[৩৫৭] তাহতাবীর হাশিয়া- ২/১৬৬পৃঃ, জামেউর রমুয- পৃঃ ২৭৭, মাজমাউল আনহার- পৃঃ ৩২৬।
[৩৫৮] ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৯পৃঃ, রদ্দুল মুহতার- ২/৪১৯পৃঃ, ফতহুল কদীর- ৩/২৬পৃঃ, রুহুল মা'আনী- ১/৪৩০পৃঃ, তাফসীরে মাযহারী- ১/২৩৫পৃঃ।
[৩৫৯] ঐ।
[৩৬০] ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, নায়লুল আওত্বার- ৬/১৯৭পৃঃ, ইগাছাতুল লাহফান- ১/৩২৪পৃঃ।
[৩৬১] উমদাতুল ক্বারী- ২০/২৩৩পৃঃ, ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, তাফসীরে মাযহারী- ১/২৩৫পৃঃ, শরহে মুসলিম নববী- ১/৪৭৭পৃঃ, ই'লাম- ৩/৪৯পৃঃ, ফতহুল কদীর- ৩/২৬পৃঃ, রদ্দুল মুহতার- ২/৪১৯পৃঃ।
[৩৬২] ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, নায়লুল আওত্বার- ৬/১৯৭পৃঃ।
[৩৬৩] উমদাতুল কারী- ২০/২৩৩পৃঃ।
[৩৬৪] নায়লুল আওত্বার- ৬/১৯৭পৃঃ।

ইমাম নাসের, ইমাম আহমদ ইবনে ঈসা, যায়েদ ইবনে আলী, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুসা এবং আরও বহু গণ্যমান্য তাবেয়ী বিদ্বান একত্রিতভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতওয়া দিতেন।[৩৬৫]

তাবে' তাবেয়ী বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁরা একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন তাঁদের কতিপয় ঃ

- হাজ্জাজ ইবনে আরতাত রহঃ। ইমাম নববী ও আল্লামা আইনী স্ব স্ব গ্রন্থে উনার নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৬৬]
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহঃ। ইমাম আহমদ রহঃ স্বীয় মুসনাদে এ সম্পর্কে উনার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন।[৩৬৭]
- খাল্লাস ইবনে আমর বসরী ও হারিস ইবনে ইয়াযীদ ইকলীও একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করতেন।[৩৬৮]
- মদীনা তৈয়বার সুযোগ্য ইমাম হযরত মালিক ইবনে আনাস রহঃ এর দ্বিবিধ ফতওয়ার মধ্যেও এটি অন্যতম। শায়খ খলিল রহঃ তাঁর 'তাওযীহ' গ্রন্থে তিলিমসানীর মাধ্যমে আর ইবনে আবি যায়েদ প্রত্যক্ষভাবে ইমাম মালিকের বাচনিক একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতওয়া বর্ণনা করেছেন।[৩৬৯]
- ইমাম মালিক রহঃ এর কতিপয় ছাত্রের বাচনিক একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার উক্তি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ তদীয় ফতাওয়া'য় সংকলিত করেছেন।[৩৭০]
- ইমাম তিলিমসানীও ইবনুল হাল্লাবের 'তফরী' নামক গ্রন্থের টীকায় উল্লেখিত বিদ্বানগণের ফতওয়া উল্লেখ করেছেন।[৩৭১]
- আমাদের হানাফী মাযহাবেও একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার অভিমত রয়েছে। প্রখ্যাত হানাফী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রাযী রহঃও একত্রিত তিন তালাকের ক্ষেত্রে এক তালাক গণ্য হওয়ার ফতওয়া

[৩৬৫] ফতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ- ৩/৩৭পৃঃ, সুবুলুস সালাম- ২/৯৮পৃঃ, নায়লুল আওত্বার- ৬/১৯৭পৃঃ, তাফসীরে নিশাপুরী- ২/১৬১পৃঃ।
[৩৬৬] শরহে মুসলিম নববী- ১/৪৭৭পৃঃ, উমদাতুল কারী- ২০/২৩৩পৃঃ।
[৩৬৭] ফতহুল বারী- ৯/২৯০পৃঃ, শরহে মুসলিম নববী- ১/৪৭৭পৃঃ, রদ্দুল মুহতার- ২/৪১৯পৃঃ, ফতহুল কদীর- ৩/২৬পৃঃ, উমদাতুল কারী- ২০/২৩৩পৃঃ।
[৩৬৮] ই'লাম- ৩/৪৯পৃঃ, মিসকুল খিতাম- ২/২৫পৃঃ।
[৩৬৯] ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, উমদাতুর রিআয়া- ২/৬৭পৃঃ, ইগাছা- ১/৩২৬পৃঃ।
[৩৭০] ফতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ- ৩/৩৭পৃঃ।
[৩৭১] ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৯পৃঃ।

প্রদান করতেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত ফতওয়াসমূহ আল্লামা মাযেরী রহঃ স্বীয় 'মু'লিম বিফাওয়ায়েদে মুসলিম' গ্রন্থে এবং ইমাম আবু বকর রাযী বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহঃ হানাফী মাযহাবের প্রথম সারির ইমামগণের অন্যতম এবং ইমাম আ'যম রহঃ এর দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহঃ এর বিশিষ্ট ছাত্র।

- স্বয়ং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান রহঃ এর বাচনিকও এই ধরনের একটি ফতওয়া আলমগীরীতে বর্ণিত আছে। যেমন, ইব্রাহীম রহঃ ইমাম মুহাম্মদ রহঃ এর ফতওয়া নকল করেছেন,

رَوَى إِبْرَاهِيمُ عن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قِيلَ لِرَجُلٍ أَطَلَّقْت امْرَأَتَك ثَلَاثًا قال نعم وَاحِدَةً

قال الْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ عليها ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَجْعَلُهَا وَاحِدَة

'ইব্রাহীম রহঃ ইমাম মুহাম্মদ রহঃ এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছ? সে বলল, হ্যাঁ। একত্রে দিয়েছি। ইমাম মুহাম্মদ রহঃ বললেন, ক্বিয়াস সূত্রে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হয়েছে, কিন্তু আমরা ইসতিহসানের সাহায্য নিব এবং উক্ত তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করব।'[৩৭২]

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ এরও বহু ছাত্র একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।[৩৭৩]
- ইমাম দাউদ ইবনে আলী রহঃ এবং তাঁর অধিকাংশ অনুগামীগণ একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করতেন। আল্লামা আবুল মুফলিস রহঃ ও হাফেজ ইবনে হাজম রহঃ স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁদের এই অভিমত সংকলন করেছেন।[৩৭৪]

আর সমুদয় যুগে ইসলামী জগতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল বিদ্বান সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা এতবেশি যে তা নিঃশেষে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। নিম্নে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই শ্রেণীর কতিপয় বিদ্বানের নামও লিপিবদ্ধ করা হল।

- ইমাম আবুল বারাকাত আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ যিনি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 'মুনতাকাল আখবার' এর সংকলয়িতা, তাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ ও নওয়াব সৈয়দ সিদ্দীক হাসান রহঃ তাঁদের গ্রন্থে

[৩৭২] ফতোয়ায়ে হিনদিয়্যাহ- ১/৩৫৬ পৃঃ।
[৩৭৩] উমদাতুর রিআয়া- ২/৬২ পৃঃ, তাফসীরে মাযহারী- ১/২৩৫ পৃঃ।
[৩৭৪] উমদাতুর রিআয়া- ২/৬৭ পৃঃ, ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৯ পৃঃ।

উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতওয়া প্রদান করতেন।[৩৭৫]

- শায়খুল ইসলাম তক্বীউদ্দিন আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ, যিনি সপ্তম শতকের মুজাদ্দিদ রূপে বিবেচিত, তিনিও উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন এবং একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার বিপক্ষে যে সকল আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে তিনি স্বীয় ফাতাওয়ার তৃতীয় খন্ডে সেগুলির জবাব এবং তাঁর দাবির পোষকতায় বিস্তৃত দলিল প্রমাণাদির অবতারণা করেছেন। এই মাসআলার জন্য তাঁর কারাদন্ড ভোগের কথাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ।[৩৭৬]
- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ এর প্রিয়তম ছাত্র হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ উপরিউক্ত মাসআলায় স্বীয় উস্তাদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মাআদ', 'ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন' ও 'ইগাছাতুল লাহফান' প্রভৃতিতে একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক প্রমাণিত করার স্বপক্ষে বহুবিস্তৃত আলোচনা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা করেছেন।[৩৭৭]
- স্পেনের কর্ডোভা নগরীর তৃতীয় শতকের বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে তক্বী ইবনে মখলদ এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালাম খশনী প্রভৃতি একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন। উনাদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত আল্লামা আবুল হাসান নসফী 'কিতাবুল ওসায়েক' গ্রন্থে আর ইমাম আযদী 'মুফিদুল হুক্কাম' গ্রন্থে এবং গানাভী স্বীয় পুস্তকে উদ্ধৃত করেছেন।[৩৭৮]
- উন্দুলুসের মুফতীগনের অন্যতম আসবাগ ইবনুল হুবার এবং কর্ডোভার শায়েখ ইবনে যম্বাগ ও শায়খুল হুদাও এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন। 'মুফিদুল হুক্কাম' ও 'কিতাবুল ওসায়েক' গ্রন্থে তাঁদের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। স্পেনের তলীতলা অঞ্চলের প্রায় উনিশ জন বিদগ্ধ ফকীহ'র সমষ্টিগত প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতওয়া হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ তদীয় গ্রন্থ 'ইগাছাতুল লাহফান' এ উল্লেখ করেছেন।
- ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহঃ ও আল্লামা নিশাপুরী রহঃ স্ব স্ব তাফসীরে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করার উক্তি সমর্থন করেছেন।

[৩৭৫] ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৯পৃঃ, মিসকুল খিতাম- ২/২১৫পৃঃ।

[৩৭৬] রুহুল মা'আনী- ১/৪৩০পৃঃ, উমদাতুর রিআয়া- ২/৬৭পৃঃ, সুবুলুস সালাম- ২/৯৮পৃঃ, নায়লুল আওত্বর- ৬/১৯৭পৃঃ, ই'লাম- ৩/৪৯পৃঃ, ইগাছা- ১/২৯০পৃঃ।

[৩৭৭] যাদুল মাআদ- ৪/৬-৮৯পৃঃ, ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন- ৩/৪৬-৫৩পৃঃ, ইগাছা- ২/২৯৩-৩৩৮পৃঃ।

[৩৭৮] ফতহুল বারী- ৯/২৯০পৃঃ, ইরশাদুস সারী- ৮/১২৭পৃঃ, নায়লুল আওত্বর- ৬/১৯৭পৃঃ।

- আল্লামা মুসলিহুদ্দীন মুসতফা রহঃ যিনি ইবনুত তামজীদ নামে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং তুরস্ক বিজয়ী খলিফা সুলতান মুহাম্মদের সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন, তাঁর স্বরচিত 'তাফসীরে বায়যাভী'র টীকাগ্রন্থে সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।
- বিগত শতাব্দীর প্রথিতযশা বিদ্বানগণের মধ্যে ইয়ামানের আল্লামা ইব্রাহীম ওযীর 'রওযুল বাসিম' গ্রন্থে, আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইয়ামানী 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে আর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী শওকানী তাঁর 'নায়লুল আওত্বর' নামক হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থে উদ্দিষ্ট মাসআলার সবিস্তার আলোচনার পর একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাকরূপেই সাব্যস্ত করেছেন।
- পাক ভারতের স্বনামধন্য বিদ্বানগণের মধ্যে মুহাদ্দিসকুলভূষণ শায়খুল কুল হযরত মিয়া সাহেব সৈয়দ নজীর হুসাইন দেহলভীও এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন। 'তা'লীকুল মুগনী'র রচয়িতা স্বীয় গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।
- ভুপালের নওয়াব সাহিত্য সম্রাট সৈয়দ সিদ্দীক হাসান খান তদীয় 'মিসকুল খিতাম' নামক 'বুলুগুল মারাম' হাদীস গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থে (ফার্সী) সুদীর্ঘ আলোচনার পর উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- পাটনার বিখ্যাত মুহাদ্দিস সৈয়দ শামসুল হক তাঁর সুনানে আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন।
- বহু গ্রন্থ প্রণেতা, হানাফী মাযহাবের প্রতাপশালী ফকীহ, কুলাগ্রগণ্য আল্লামা ও মুহাক্কিক শায়েখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই লক্ষৌভী রহঃ বিশেষ অসুবিধার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩৭৯]
- এছাড়াও আব্দুল আযীয বিন বায, ইবনে উসাইমিন, সালেহ আল মুনাজ্জিদ সহ বর্তমান যুগের অধিকাংশ উদারপন্থী ওলামাগণ এই মতের অনুসারী।

এমনকি চলতি যুগেও বিশ্বের বাইশটিরও অধিক মুসলিম রাষ্ট্রে একত্রিত বা তাৎক্ষণিক তিন তালাকে এক তালাক গণ্য করার আইন চালু আছে। এই বাইশটি রাষ্ট্রের মুসলিম জনসংখ্যা হিসাব করলেও দেখা যায়, অধিকাংশ মুসলিম বর্তমানেও একত্রিত তিন তালাকে এক তালাক গণ্য হওয়ার উপর ঐক্যমত আছে। অতএব, যাদের দাবি একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাক গণ্য করার উপর বিদ্বানগণের ইজমা সংঘটিত হয়ে গেছে, উপরিউক্ত মতভেদের তালিকা পাঠ করার পর তাদের দাবির অসারতা, আশা করি তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন যুগেই এ সম্পর্কে

[৩৭৯] মজমুআয়ে ফতাওয়া- ২/৫৩পৃঃ।

ইজমা সংঘটিত হয়নি। বরং বলা যায়, একত্রিত তিন তালাকে এক তালাক গণ্য করাতেই অধিকাংশ বিদ্বানগণ একমত হয়েছেন। আর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতিষ্ঠিত আমলের বিপরীতে ইজমা সংঘটিত হতে পারে এমন আক্বীদা পোষণ করাও ঈমানের জন্য মারাত্মক আশংকার। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ঃ

সকল প্রকার দলিল প্রমাণের অবতারণা ও উত্থাপিত আপত্তিসমূহের অপনোদন সত্ত্বেও একটি গুরুতর প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। সে প্রশ্নটি হল, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাঃ সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার প্রমাণসমূহ উপেক্ষা করলেন কেন? আর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে ও প্রধান খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ এর খিলাফতকালের আগাগোড়ায় যে আমল প্রচলিত ছিল, হযরত ওমর ফারুক রাঃ তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন কোন অধিকারে?

সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অবগত হওয়া আবশ্যক যে, হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর পবিত্র যুগে, হযরত আবু বকর রাঃ এর শাসনামলে এমন কি স্বয়ং হযরত ওমর রাঃ এর খিলাফতের প্রাথমিক বৎসরগুলিতে মুসলমানরা যে একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক হিসেবে গণ্য করতেন, তা হযরত ওমর রাঃ নিশ্চিত রূপেই অবগত ছিলেন। তিনি এটিও জানতেন যে, এই ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সহজ ছিল। হযরত ওমর রাঃ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা মোটেও সঠিক হবে না যে, তিনি যদৃচ্ছভাবে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করেছিলেন, আর যে বিষয়কে দয়ালু আল্লাহ মানুষের জন্য সহজসাধ্য ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তিনি অনর্থক তা দূরূহ ও সীমাবদ্ধ করার কারন হয়েছিলেন। সেই সাথে যাঁরা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে চলতেন এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পদাংক অনুসরণ করাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করতেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সেই মহিমান্বিত সাহাবাগণের পক্ষেও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশ অমান্য করে হযরত ওমর রাঃ এর পক্ষাবলম্বন করা মোটেও সম্ভব ছিল না। এই পিচ্ছিল সমস্যায় অনেকেরই পদস্খলন ঘটেছে। যেমন, (১) একদল উপরিউক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করে শরীয়তের নির্ধারিত আদেশ নিষেধকে যদৃচ্ছভাবে বিকৃত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত করার অধিকার স্বহস্তে গ্রহন করতে উদ্যত হয়েছেন। (২) আরেকদল হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর পক্ষ সমর্থন করতে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীসকেই উড়িয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তজ্জন্য নানারূপ অলীক ওযর-আপত্তির আশ্রয় গ্রহন করেছেন। (৩) আর তৃতীয় আরেকদল হযরত ওমর রাঃ কর্তৃক এহেন সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে অপরাধী ও গোনাহগার সাব্যস্ত করার মত প্রগলভতাও প্রদর্শন করেছেন। (৪) কিন্তু এরূপ একটি চতুর্থ দলও রয়েছে, যারা কুরআন ও সুন্নাহর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব কোন মূল্যেই ক্ষুন্ন করতে সম্মত নন। তারা হযরত ওমর

রাঃ এর এরূপ সিদ্ধান্তের কৈফিয়তও এভাবে দিতে প্রস্তুত যে, যার দরুন কুরআন ও সুন্নাতের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য স্বস্থানে বজায় থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমর রাঃ এর বিরুদ্ধেও কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার প্রতিকূল আচরণের কোনরূপ অভিযোগ টিকে থাকতে না পারে। এক্ষণে, হযরত ওমর ফারুক রাঃ সম্পর্কে আনীত শরীয়তের বিধান পরিবর্তনের অভিযোগ খণ্ডন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের বিধি-বিধানগুলি মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আইনগুলি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এবং ইজতেহাদের পরিবর্তনে কোন অবস্থাতেই কোনক্রমে এক চুল পরিমাণও বর্ধিত, হ্রাসপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হতে পারে না। যথা- ওয়াজিব আহকাম, হারাম বস্তুসমূহের নিষিদ্ধতা, সালাত, যাকাত ইত্যাদির ওয়াক্ত ও পরিমাণ এবং নির্ধারিত দণ্ডবিধি। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এবং ইজতেহাদের অনুবলে উল্লিখিত আইনগুলির পরিবর্তন সাধন করা অথবা এসব আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ইজতেহাদ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আইনগুলি জনকল্যাণের খাতিরে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এবং অবস্থাগত হেতুভেদে কিংবা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। যথা- শাস্তির পরিমাণ ও রকমারিত্ব। জনকল্যাণের স্বার্থে ও কালের চাহিদামতে সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুসারে এরূপ বহু আইন একই ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে নির্দেশিত হয়েছে। যেমন ঃ

মদ্যপায়ীর শাস্তি ঃ

মদ নিষিদ্ধের প্রথমদিকে মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের চতুর্থবার ধরা পড়ার পর শাস্তি স্বরূপ হত্যা করার নির্দেশ ছিল।[৩৮০] পরে এরূপ একজন নেশাগ্রস্থ ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে আনা হলে রাসুলুল্লাহ সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করেছেন, কিন্তু হত্যা করেন নি।[৩৮১] রাসুলুল্লাহ সাঃ মদ পানকারীদের কখনো স্বাভাবিক প্রহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮২] কখনো আবার খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পিটিয়ে শাস্তি দিতেন।[৩৮৩] কখনো চল্লিশ চাবুক মারতেন।[৩৮৪] আবার কখনো খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশটি আঘাত করতেন।[৩৮৫] হযরত আবু বকর রাঃ এর শাসন ব্যবস্থাতেও মদ্যপায়ীদের চল্লিশ চাবুক মারার আইন প্রচলিত ছিল।[৩৮৬] এরপর হযরত ওমর ফারুক

---

[৩৮০] আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮৪, তিরমিযী- হাঃ ১৪৪৪, বায়হাক্বী- হাঃ ১৭২৭৮।
[৩৮১] বুখারী- হাঃ ৬৩৯৮, তিরমিযী- হাঃ ১৪৪৪।
[৩৮২] বুখারী- হাঃ ৬৩৯২, আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৭৯, জামেউল উসূল- হাঃ ১৯২৩, শরহুস সুন্নাহ- ১/৬৩৯পৃঃ।
[৩৮৩] বুখারী- হাঃ ৬৩৯১, মুসলিম- হাঃ ৪৫৫১, নাসাঈ- হাঃ ৫২৭৭, আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮১।
[৩৮৪] আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮৩, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৬২৪, জামেউল উসূল- হাঃ ১৯১৬।
[৩৮৫] তিরমিযী- হাঃ ১৪৪৩।
[৩৮৬] বুখারী- হাঃ ৬৩৯১, মুসলিম- হাঃ ৪৫৫১, আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮১, জামেউল আহাদীস- হাঃ ২৯২২০।

রাঃ এর শাসনামলের শেষের দিকে প্রথমে চল্লিশ বেত মারার প্রভিধান গৃহীত হয়,[৩৮৭] পরে বাড়াবাড়ি অতিমাত্রায় রূপ নিলে আশি বেত্রাঘাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৮৮] কিন্তু হযরত আলী মর্তুজা রাঃ হযরত ওমর ফারুক রাঃ কর্তৃক প্রবর্তিত আশি বেত্রাঘাতের কথা জেনেও তিনি চল্লিশ বেত্রাঘাত মারতেন।[৩৮৯] হযরত উসমান রাঃ তাঁর আমলে কখনো চল্লিশ আবার কখনো আশি দোররা মারতেন।[৩৯০] অবশেষে হযরত মুয়াবিয়াহ রাঃ তাঁর শাসনামলে পুনরায় আশি দোররা নির্ধারিত করে দেন।[৩৯১] রাসুলুল্লাহ সাঃ মদ্যপ ব্যক্তিকে প্রযোজ্য শাস্তি প্রদানের পর ধমক দিয়ে ছেড়ে দিতে বলেছেন।[৩৯২] আর হযরত ওমর রাঃ এর শাসনামলে মদ্যপ ব্যক্তিকে মাথা মুড়িয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং পানশালা আর যেসব দোকানে মদের ক্রয়-বিক্রয় হতো, তিনি সেগুলি পুড়িয়ে দিয়েছেন।

আগুনে পুড়িয়ে প্রাণনাশের বিধান ঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অনুমতি দেননি, বরং নিষেধ করেছেন।[৩৯৩] তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর রাঃ জনৈক পায়ুকামীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। হযরত আলী রাঃও তাঁকে 'আল্লাহর অবতার' দাবিকারী একদল যিন্দীক্বদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন।

জুম'আর দিন তৃতীয় আযানের প্রচলন ঃ

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে, হযরত আবু বকর রাঃ এর সময়ে ও হযরত ওমর রাঃ এর খিলাফতকালে জুম'আর আযান হিসেবে কেবল খুৎবাহ'র আযান ও ইক্বামাতের প্রচলন ছিল। পরে যখন উসমান রাঃ খলিফা হলেন এবং শহরে লোক সমাগম বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি জুম'আর গুরুত্ব ও আবহ প্রসারের লক্ষ্যে এবং জনস্বার্থে মদীনার অদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে তৃতীয় আযান চালু করেন।[৩৯৪]

ইসলামের ইতিহাসে এরূপ আরও বহু আইনের অস্তিস্ত রয়েছে যেগুলো মানবতার সুবিধার্তে ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। যথা- যাকাত পরিশোধ না করার জন্য তার অর্ধেক মাল জরিমানা স্বরূপ আদায় করা,

[৩৮৭] বুখারী- হাঃ ৬৩৯৭, জামেউল উসূল- হাঃ ১৯০৯।
[৩৮৮] বুখারী- হাঃ ৬৩৯৭, মুসলিম- হাঃ ৪৫৫১, আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮১, তিরমিযী- হাঃ ১৪৪৩।
[৩৮৯] আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮২, বায়হাক্বী- হাঃ ১৭২৯৫।
[৩৯০] আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৯০, দারাকুতনী- হাঃ ২২৭, বায়হাক্বী- হাঃ ১৭৩০।
[৩৯১] আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৯০, দারাকুতনী- হাঃ ২২৭, বায়হাক্বী- হাঃ ১৭৩০।
[৩৯২] আবু দাউদ- হাঃ ৪৪৮০।
[৩৯৩] বুখারী- হাঃ ২৮৫৪, আবু দাউদ- হাঃ ৪৩৫৩, নাসাঈ- হাঃ ৪০৬০, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ১৮৭১, বায়হাক্বী- হাঃ ১৬৫৯৭, দারাকুতনী- হাঃ ৯০।
[৩৯৪] বুখারী- হাঃ ৮৭০, তিরমিযী- হাঃ ৫১৬, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১১৩৫।

অত্যাচারীর কবল হতে ক্রীতদাসকে মুক্ত করে স্বাধীনতা প্রদান করা, দাস প্রথা বিলুপ্ত হওয়া, যে সকল বস্তুর চুরিতে হস্তকর্তনের দণ্ড প্রযোজ্য নয়, সেগুলোর চুরির জন্য মুল্যের দ্বিগুণ জরিমানা আদায় করা, হারানো জিনিস গোপন করার জন্য দ্বিগুণ মুল্য আদায় করা, হিলাল ইবনে উমাইয়াকে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র যুগে মদের ব্যবহার কচিৎ হতো, কিন্তু হযরত ওমর রাঃ এর যুগে এ বিষয়ে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি হওয়ায় তিনি এই অপরাধের শাস্তি আশি দুররা আঘাত নির্দিষ্ট করে দেন আর মদ্যপায়ীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। হযরত ওমর রাঃ কষাঘাত করতেন, তিনি জেলখানা নির্মাণ করান, যারা মৃত ব্যক্তিদের জন্য মাতম ও কান্নাকাটির পেশা অবলম্বন করত, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে তাদেরকে পেটানোর আদেশ দিতেন। এগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনযোগ্য আইন।

এইরূপ তালাকের ব্যাপারেও যখন লোকেরা বাড়াবাড়ি করতে লাগল আর যে বিষয়ে তাদেরকে অবসর ও প্রতীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তারা সে বিষয়ে বিলম্ব না করে শরীয়তের উদ্দেশ্যের বিপরীত ক্ষিপ্রগতিতে তালাক দেওয়ার কাজে বাহাদুর হয়ে উঠল, তখন মহামান্য দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর ধারণা হল যে, শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর না করলে জনসাধারণ এই বদ অভ্যাস পরিহার করবে না। তখন তিনি শাস্তি ও দণ্ড স্বরূপ এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাকের জন্য তিন তালাকের হুকুম প্রদান করলেন, সাথে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করলেন। যেরূপ তিনি মদ্যপায়ীর জন্য আশি দুররা, মাথা মুণ্ডণ ও দেশবিতাড়নের আদেশ ইতিপূর্বে প্রদান করেছিলেন, ঠিক সেইরূপ তাঁর এই আদেশও শাস্তিমুলক প্রবর্তিত হয়। তাঁর আশি দুররা আঘাত, মাথা মুড়ানো ও দেশছাড়া করনের আইন রাসুলুল্লাহ সাঃ এবং প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাঃ এর আইনের সাথে দৃশ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও জাতীয় স্বার্থ, যুগের অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একজন রাষ্ট্রের শাসনকর্তা আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে তাঁর এরূপ করার অধিকার ছিল, সুতরাং তিনি প্রয়োজনবোধে তাই করলেন। অতএব, হযরত ওমর রাঃ এর এরূপ শাসনব্যবস্থার জন্য কুরআন ও সুন্নতের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎও টিকিবার কথা নয়।

আরও একটি প্রশ্ন এখনও ঘোলাটে। তা হল, হযরত ওমর রাঃ এর যুগে লোকেরা তালাকের ব্যাপারে কি এমন বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছিল, যার দরুন শাসক ওমর রাঃ একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার বিধান জারী করেছিলেন?

বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল (১৮৮৮–১৯৫৬ খ্রিঃ, মিশর) তাঁর 'ওমর ফারুক' গ্রন্থে লিখেন, কুরআনী আজ্ঞার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর রাঃ কর্তৃক এরূপ কঠোরতা আরোপ করার প্রকৃত কারন ছিল, হযরত ওমর রাঃ এর খিলাফতকালে ইরাক, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশগুলো আরবের লোকেদের দখলে

আসলে কিছু অসাধু আরব্য সেসব এলাকার যুদ্ধলব্ধ নারীদেরকে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে মক্কা মদীনার মত নামকরা শহরগুলোতে নিয়ে আসতে শুরু করে। তারা দেখতে বেশ আকর্ষণীয় ও আবেদনময়ী ছিল বটে, কিন্তু খুব হিংসুটে ছিল। আরবের কিছু লোক এসব নারীদের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়ে তাদের বিয়ে করার জন্য একেবারে অধীর হয়ে উঠে। তারাও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হিংসা পরায়ণ হয়ে প্রস্তাবকারীদের এই বলে চাপ দিতে আরম্ভ করে যে, তাদের বিয়ে করতে হলে প্রস্তাবকারীরা যেন তাদের পূর্বেকার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেয়। তারপর কিছু লোক ঐসব সুন্দরীদের মন পাবার উদ্দেশ্যে তাদের কথা মত নিজেদের স্ত্রীদের তিন তালাক একসাথে দিয়ে দিয়ে বিদায় করতে শুরু করে দেয়। পরে যখন দেখতে পায়, সে আসার আগেই কাঙ্খিত সুন্দরী অন্যজনের হয়ে গেছে কিংবা অন্য শহরে বিক্রি হয়ে গেছে, তখন তারা পুনরায় তাদের পূর্বেকার স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য নানা টাল-বাহানার আশ্রয় নেয়। এসব বাড়াবাড়ি যখন অতিমাত্রায় হতে লাগল, তখন বিষয়টি হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর গোচরে আসলে তিনি চিন্তা করলেন, এদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিৎ। কারন এ বিষয়ে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা এটিকে খেলনায় পরিণত করেছে। তারপর তিনি ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার আইন সাময়িকভাবে জারী করে দিলেন। সেইসাথে আশিটি বেত্রাঘাতেরও হুকুম প্রদান করলেন। মুলত এটি ছিল হযরত ওমর রাঃ এর একটি অস্থায়ী সিদ্ধান্ত, যা কেবল রাষ্ট্রের বৈরী পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রণীত হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রনিধানযোগ্য যে, রাষ্ট্রের খলিফা ও শাসনকর্তাগণের এই ধরনের শাসনমূলক ব্যবস্থাগুলোর প্রকৃতি সর্বদাই অস্থায়ী ও পরিবর্তনসাপেক্ষ। যে সকল ব্যবস্থা মহান আল্লাহর গ্রন্থ ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাহতে বর্ণিত এবং উক্ত দুই বস্তু হতে গৃহীত, কেবল সেগুলোই আসল ও স্থায়ী এবং ব্যাপক আইনের মর্যাদা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং যুগপৎ তিন তালাকের বিষয়ে উক্ত দুই উৎস হতে আহরিত স্থায়ী শাসনব্যবস্থা নির্ধারিত থাকার পর হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর শাসনমূলক অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলোকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দান করা আদৌ আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে যদি বুঝা যায় যে, তাঁর শাসনমূলক ব্যবস্থা জাতির পক্ষে সংকট ও অসুবিধার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দণ্ডবিধির যে ধারার সাহায্যে তিনি সমষ্টিগত তিন তালাকের বিদআত রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই শাসনবিধিই উক্ত বিদআতের ছড়াছড়ি ও বহুবিস্তৃতির কারনে পরিণত হতে চলেছে, যেরূপ ইদানিং তিন তালাকের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, হাজারে এমন কি লাখেও কেউ কুরআন ও সুন্নাহ প্রবর্তিত বিধান অনুসারে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে কিনা সন্দেহ, এমতাবস্থায় হযরত ওমর রাঃ এর শাসনমূলক অস্থায়ী সাময়িক নির্দেশ অবশ্যই পরিহার্য হবে এবং প্রাথমিক যুগীয় ব্যবস্থার পুণঃপ্রবর্তন আনতে হবে। কাজেই বর্তমান যুগের বিদ্বানগণের কর্তব্য হওয়া উচিৎ প্রত্যেক যুগের উম্মতের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা, জাতীয় সংকট বিদূরিত

করনে সচেষ্ট হওয়া এবং শরীয়তের প্রধান দুই উৎস কুরআন সুন্নাহ অনুসারে যথাযথ উপায় খুঁজে বের করা। গোঁড়ামী, অন্ধত্ব ও গতানুগতিকতায় অনড় থেকে জনজীবন বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ করার অধিকার কোন উলামায়ে ইসলামের নেই।

সবশেষে হযরত ওমর রাঃ স্বীয় সিদ্ধান্তের পরিণামের ব্যাপারে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কি পরিমাণ অনুতপ্ত মর্মাহত হয়েছিলেন তা প্রনিধানযোগ্য। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ 'মুসনাদে ওমর' এর বরাত দিয়ে স্বীয় 'ইগাছা'য় হযরত ওমর রাঃ এর এই অনুতাপের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে, হাফিজ আবু বকর ইসমাঈলী সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে শরয়ী তিন তালাক রূপে গণ্য করার জন্য হযরত ওমর ফারুক রাঃ এর পরিতাপ ও অনুশোচনা সনদ সহকারে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি স্বীয় মুসনাদে ওমরে উদ্ধৃত করেছেন,

أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث أن لا أكون حرمت الطلاق وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح

'হাফেজ আবু ইয়ালা আমাদের কাছে রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, সালিহ বিন মালিক আমাদের কাছে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, খালিদ বিন ইয়াযিদ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি স্বীয় পিতা ইয়াযিদ বিন মালিকের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ বললেন, তিনটি বিষয়ের জন্য আমি যেরূপ অনুতপ্ত, অন্য কোন কার্যের জন্য আমি এরূপ অনুতপ্ত নই। প্রথমতঃ আমি তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা কেন নিষিদ্ধ করলাম না। দ্বিতীয়তঃ কেন আমি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের বিবাহিত করালাম না। তৃতীয়তঃ কেন আমি পেশাদার বিলাপকারীদের হত্যা করলাম না।'[৩৯৫]

[৩৯৫] ইগাছাতুল লাহফান- ১/৩৩৬পৃঃ।

নিকাহ হালালা বা হিল্লা বিয়ে ঃ

হালালা বা তাহলীল হল মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরেকটি জঘন্য কুৎসিৎ ও নোংরা প্রথার নাম, যা দেশে 'হিল্লা বিয়ে বা ভাড়া আকদ' নামে পরিচিত। আরবীতে শব্দটি 'হিলাহ'। যার অর্থ উপায়, গতি, ফন্দি, ব্যবস্থা, আশ্রয়, কৌশল ইত্যাদি। সমাজে হিল্লা বলতে বুঝানো হয়, 'কোন স্বামীর তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, বিয়ের পর সহবাস শেষে স্ত্রীকে তালাক দিবে, যেন সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায় এবং সে তাকে পূণরায় বিয়ে করতে পারে।' নুর মোহাম্মদ আজমী অনূদিত মিশকাত এর ব্যাখ্যায় এমনটাই বলা হয়েছে।[৩৯৬] এ বিয়ে বাতিল, বেআইনী। বিশ্বের বাইশটিরও অধিক মুসলিম রাষ্ট্রে এটি নিষিদ্ধ। ১৯৬১ ইং থেকে বাংলাদেশেও 'হিল্লা বিয়ে' কাগজে কলমে নিষিদ্ধ। সম্প্রতি ভারতে নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ পাতানো বিয়ের দ্বারা কেউ কারোর জন্য হালাল হয় না। যদিও হিল্লাকারী এ ধারণা করে যে, এটা একটা নিতান্ত ভাল কাজ এবং এই ভাল কাজের মাধ্যমে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দিতে পারলে তাদের উপর বড়ই অনুগ্রহ হবে। সেই সাথে তাদের সন্তানদের ও সংসারের জন্যও মঙ্গল হবে। ইসলামে এই ভাল কাজের কোন মূল্য নেই। কারন এ বিয়ে অস্থায়ী এবং এতে কোন না কোনভাবে ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয়। তাছাড়া, এটি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সরাসরি নিষিদ্ধ এবং অভিশপ্ত।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল, যারাই এই হিল্লাকে ধর্মের মোড়ক পরিয়েছেন, তারা নিজেরাও এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়েছেন যুগেযুগে। মতভেদ করেছেন নানারূপ। একদল প্রবক্তার অভিমত হল, তাহলীলের সময় তালাক দেওয়ার শর্ত গোপন থাকলে, হিল্লা বিবাহ সিদ্ধ হবে। আরেকদল বলেন, প্রকাশ্যে তালাকের শর্ত করা হলেও সিদ্ধ হবে। ইমাম আবু হানিফা রহঃ ও ইমাম যুফার রহঃ বলেন, তাহলীলের সময় তালাকের শর্ত প্রকাশ্য

[৩৯৬] মিশকাত- হাঃ নং ৪০৬২ এর টীকা- ৬/৩২৩পৃঃ।

হলেও বিবাহ সিদ্ধ হবে, তবে তা মাকরূহ হবে।[৩৯৭] ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ বলেন, উক্ত মতে বিবাহ বাতিল (ফাসিদ) বলে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহঃ বলেন, বিবাহ সিদ্ধ হবে, তবে পূর্ব স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হবে না। ইমাম মালেক রহঃ, ইমাম আহমদ রহঃ, ইমাম ছওরী রহঃ, হাছান বসরী রহঃ, ইবরাহীম নাখঈ রহঃ, ক্বাতাদাহ রহঃ, ইবনুল মোবারক রহঃ, লাইছ রহঃ, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহঃ, হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম রহঃ সহ বহু বিদ্বানগণের দৃষ্টিতে তাহলীল তথা হিল্লা বিয়ে সর্বাবস্থায় বাতিল।[৩৯৮] এমতাবস্থায়, আমাদের সমাজে 'হিল্লা'র নামে যে অপনাট্যের আয়োজন হয় তা ঠিক কোন পদ্ধতিতে কোন মতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং যাদের ঘিরে এটি হয়ে থাকে তারাও এ বিষয়ে আদৌ অবগত থাকে কিনা সেটাও তো প্রশ্ন। ইসলামী শরীয়তে যা কিছুই যোগ করা হোক বা বাদ দেয়া হোক তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে হতে হবে। এখন, বিভিন্ন ফেক্বাহর কিতাবে যে 'হিল্লা'র মত জঘন্য এই নোংরামীটিকে শরীয়ত বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, তা ঠিক কোন দলিলবলে? আর কোন অধিকারেই বা উনারা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র হাদীসকে পর্যন্ত বুড়ো আঙ্গুল দেখাবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন? ইসলাম যথেষ্ট কলঙ্কিত হয়েছে। এসব দেখে অমুসলিমরা হাসাহাসি করে। ফতোয়া নিষিদ্ধের দাবি তুলে। আমরা যখন কোন হিন্দু মেয়েকে প্রভুদাসী বানানোর নামে মন্দিরের ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে পুরোহিত পর্যন্ত সবার যৌনখোরাক বানিয়ে রাখার প্রতিবাদ করি তখন তারাও এই হিল্লার কথা বলে পাল্টা ক্ষেপে আসে। প্রভুদাসী ও হিল্লা, দুটোই ধর্ষণ। যে রকমই হোক, সারাজীবন হোক বা জীবনে একবারই হোক, ধর্ষণ ধর্ষণই। বর্তমানে প্রভুদাসী বানানোর ঘটনা নাই বললেও চলে, তবে হিল্লার ঘটনা অহরহ ঘটছে। সবাই দিনদিন সচেতন হচ্ছে, সভ্য হচ্ছে, আমরা হবো কবে?

[৩৯৭] আসল কথা হল, ইমাম আবু হানিফা রহঃ হিল্লার সমর্থনে এরূপ কোন কথাবার্তা কোনকালেই বলেন নি। এটি তাঁর নামে জালিয়াত হয়েছে। একদল স্বার্থান্বেষী অ-পুরুষ তাদের অসৎ অভিসন্ধি চরিতার্থের জন্য ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর নামে সেযুগে একটি জাল গ্রন্থ চালিয়ে দিয়েছিল। যার নাম রাখা হয়েছিল 'কিতাবুল হিয়াল'। বহু দ্বীন বিরোধী কথাবার্তা লেখা হয়েছিল এই বানোয়াট গ্রন্থে। পরবর্তীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহঃ স্বীয় 'ইক্বামাতুত দালিল আলা ইবতালিত তাহলীল' গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় ও 'ফাতাওয়া আল কুবরা' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থটি যে ইমাম আবু হানিফা রহঃ রচিত নয় তা শক্তভাবে প্রমাণ করার পর উল্লেখ করেন, أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ الَّتِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي نَفْسِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى إِمَامٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْحٌ فِي إِمَامَتِهِ وَذَلِكَ قَدْحٌ فِي الْأُمَّةِ حَيْثُ ائْتَمُّوا بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ 'এ সমস্ত হারাম হিল্লা একজন ইমামে উম্মতের বক্তব্য হতে পারে না। তিনি কখনোই এরকম হিলা-বাহানার নির্দেশ দিতে পারেন না। তাহলে তো তিনি ইমাম হওয়ার অযোগ্য প্রমাণিত হবেন। আর সেক্ষেত্রে সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীও অযোগ্য উম্মত বলে প্রমাণিত হবে। কারন তারা অযোগ্য একজনকে ইমাম হিসেবে গ্রহন করেছে।'

[৩৯৮] ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/১৩৫-১৩৬পৃঃ।

ফতোয়া নিষিদ্ধের নেপথ্য কারন হিল্লা ঃ

২০০০ সালের ১৬ নভেম্বর নওগাঁ জেলার আতিথা গ্রামে সংঘটিত হিল্লা বিয়ের একটি ঘটনা সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করে। যা শেষে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ও হাবিবুর রহমানের বেঞ্চ সুয়োমোটো রুল জারি করে 'হিল্লা' সহ সকল প্রকার ফতোয়া অবৈধ ও দন্ডনীয় অপরাধ বলে রায় ঘোষণা করেন। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এই রায়ের কার্যকারিতা প্রথমে স্থগিত এবং পরে বাতিল করে দেন। একই বছরের ২রা ডিসেম্বর ঐ নওগাঁ জেলারই নওগাঁ সদর থানার কীর্তিপুর গ্রামে ঘটে যায় অনুরূপ আরও একটি ঘটনা। এখানেও চলে অসভ্য মাতব্বরী। জানা যায়, নওগাঁ সদর থানার কীর্তিপুর গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে সাইফুলের সঙ্গে শাহিদার বিয়ে হয় বছর দেড়েক আগে। শাহিদা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা থাকা অবস্থায় ঝগড়ার এক পর্যায়ে সাইফুল তাকে রাগের মাথায় তালাক দেওয়ার কথা উচ্চারণ করে। পরে রাগ প্রশমিত হলে তারা স্বাভাবিকভাবে ঘর-সংসার করতে থাকে। একই পরিবারের হাজী আজিজুল হক ফতোয়া জারি করেন যে, হিল্লা বিয়ে ছাড়া ঘর-সংসার করলে পাপ হবে। তাই তিনি শাহিদাকে তার চাচাতো দেবর শামসুলের সঙ্গে দুই তিন মাসের জন্য হিল্লা বিয়ে দেন। বাংলাবাজার পত্রিকায় এ রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে উচ্চ আদালত তা আমলে নেয়। ফের ফতোয়া নিষিদ্ধের দাবি ওঠে আদালত পাড়ায়। যার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট আবারও 'হিল্লা' সহ সকল প্রকার ফতোয়া অবৈধ ও দন্ডনীয় অপরাধ বলে রায় দেন (যার রিট আবেদন নং ৫৮৯৭/২০০০, রায় ০১/০১/২০০১ ইং)। এ সময় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে গোটা আলেম সমাজে। প্রাণও হারিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। গ্রেফতার হন দেশের শীর্ষ দুই শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক এবং মুফতি আমিনী সাহেব। আরো উত্তাল হয়ে ওঠে সারাদেশ। তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর বিএনপি জোট সরকারের আমলে এ মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী জোট সরকার পূণরায় ক্ষমতায় এলে এ মামলার কার্যক্রম আবার সচল হয়। ২০১১ সালে হাইকোর্ট উক্ত ফতোয়া নিষিদ্ধের রায় বহাল রাখে। তাওহিদী জনতা আবারো সংক্ষুব্ধ হয় এবং আপিল করে। আন্দোলনের তোপে পড়ে আদালত পূণর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিশেষে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পাঁচ জন শীর্ষ আলেমকে এ্যামিকাস কিউরি নিযুক্ত করে দীর্ঘ যাচাই বাছাইয়ের পর ওই বছরের ১২ মে সুপ্রিমকোর্ট মামলাটি নিষ্পত্তি করে। তখনকার প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে ছয় বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেওয়া রায়ে বলেন, 'যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই শুধু ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন। তবে ফতোয়ার নামে কোন ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া যাবে না।' অর্থাৎ, ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে কেবল সার্টিফাইড ইসলামী বিশেষজ্ঞরাই ফতোয়া দিতে পারবেন। তবে এটা কোন বিচারিক

রায়ের মত হবে না বা বাস্তবায়ণ করা যাবে না। ভুক্তভোগীদের শারীরিক মানসিক কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। এ বিষয়ে আলেম ওলামারাও একমত পোষণ করেছেন। বলা হয়েছে, শরিয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়ণের দায়িত্ব সরকার বা আদালতের, কোন ব্যক্তি বা সংগঠন এই কর্তৃত্ব দেখাতে পারবে না।

শুধুমাত্র বাংলাদেশেই কত পরিবারের উপর দিয়ে এই নিগৃহের ঝড় বয়ে গেছে তার হিসাব মেলানো অসম্ভব। ২০০৬ সালের ১৭ নভেম্বর 'দৈনিক যায়যায় দিন' এর ১১ পৃষ্ঠায় 'হিল্লা বিয়ে' সম্পর্কে একটি সংবাদ ছাপা হয়। ইউসুফ আলমগীর পরিবেশিত উক্ত সংবাদে জানা যায়, কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থানার শৌলমারী ইউনিয়নের বোয়ালমারী গ্রামের এলেজা খাতুনের (৩১) সঙ্গে একই গ্রামের এন্তাজ মিয়ার ১২ বছর আগে বিয়ে হয়। দিনমজুর এন্তাজ ঘরজামাই হিসেবে থাকত। পারিবারিক টানাপোড়েনের কারনে দুই বছর আগে ঝগড়া-ঝাটির এক পর্যায়ে এন্তাজ স্ত্রী এলেজাকে মৌখিকভাবে তালাক দেয়। ঘটনাটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লে সালিশ বসে। সালিশে এলেজাকে হিল্লা বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। আট সন্তানের জনক খলিলের সঙ্গে এলেজাকে ১৯৯ টাকা দেনমোহরের বিনিময়ে হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর দু'বছর যাবৎ এন্তাজ ও এলেজাকে একঘরে করে রাখা হয়। হিল্লা বিয়ে সম্পন্ন করার পর এন্তাজকে তিন মাসের জন্য আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করা হয়। ২০১৩ সালে বগুড়ার শাহজাহানপুরের দিনমজুর রুহুল আমিন (৩৫) রাগের মাথায় তার স্ত্রী জোসনা বেগম (৩০) কে তালাক দেয়ায় এলাকার মাতব্বরদের চাপে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় স্বামী রুহুল। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে এক মাসের মাথায় আবারও নোটারী পাবলিকে এ্যাফিডেভিট করে তারা ঘর সংসার শুরু করে। কিন্তু এলাকার মাতব্বররা পুণরায় হিল্লা বিয়ে ও দোররা মারার ফতোয়া দিলে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় এই দম্পতি। ছয় মাস পর ভিটেমাটির মায়ায় আবারও নিজ এলাকায় ফেরে রুহুল। সেই থেকে প্রায় দেড় বছর যাবৎ তাদের একঘরে ও সমাজচ্যুত করে রাখা হয়। মেলামেশা করতে দেয়নি বৃদ্ধ বাবা মায়ের সাথেও। নিষিদ্ধ ছিল সামাজিক সব ধরনের আচার অনুষ্ঠানে। অবশেষে প্রায় দেড় বছর পর স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার সুযোগ পায় শাহজাহানপুরের কাবাষট্টি গ্রামের এই দম্পতি। প্রতিবেশী আবু সাঈদ জানায়, এক বছর পর রুহুল আমিন গ্রামে ফিরলে মাতব্বরেরা পাশের নুনদহ মাদ্রাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল বশর মোঃ আজহার আলীর কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে আসেন। ওই ফতোয়া অনুযায়ী হিল্লা বিয়ে, ৮০ দোররা ও ৩১৫ দিন অন্যের সঙ্গে ঘর সংসার করা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর ঘর সংসার করা বৈধ নয় বলে জানানো হয়। ২০১৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার 'দৈনিক ইত্তেফাক' এরকম আরও একটি খবর ছাপে। এতে বলা হয়, নীলফামারী জেলাস্থ ডোমার উপজেলার ভোগড়াবুড়ি ইউনিয়নের কারেঙ্গাতলী গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন গত ৯মে ঝগড়া-ঝাটির এক পর্যায়ে তার স্ত্রী রাবেয়াকে রাগের মাথায় তালাক শব্দ

উচ্চারণ করে। তারপর গ্রামের ফতোয়াবাজ মাতব্বররা জোর করে রাবেয়াকে একই গ্রামের লুৎফর রহমানের (৬০) সাথে কারেঙ্গাতলী জামে মসজিদের ইমাম মহসিন আলীর মাধ্যমে হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের ৪ মাস পরও হিল্লা স্বামী তালাক না দেয়ায় আহাজারি করছে রাবেয়া। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ 'প্রথম আলো' ছাপিয়েছে, হিল্লা বিয়েতে রাজি না হওয়ায় চকজোড়া গ্রাম ছেড়ে পাশের সাজাপুর পশ্চিমপাড়ায় আশ্রয় নিতে হয়েছে শফিকুল ইসলাম ও শাহিনুর বেগম দম্পতিকে। একই কারনে গ্রাম ছেড়েছেন একই এলাকার আব্দুস সামাদ ও জয়নব বেগম দম্পতি। ওই এলাকারই আরেক বাসিন্দা কৃষক আব্দুল মান্নান (৪০) ১৯৯০ সালের দিকে বেলী বেগম (৩২) কে বউ করে ঘরে তোলে। তাদের সংসারে এক বছরের মাথায় একটি ছেলে হয়। ছেলের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বিবাদের এক পর্যায়ে রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাক শব্দ উচ্চারণ করে মান্নান। তারপর গ্রাম্য মোড়লদের তোপে বউকে অন্যের সাথে হিল্লা বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মান্নান বলে, 'সে কথা মনে পড়লে রাগে-ক্ষোভে বুকটা ফেটে যায়'। একই গ্রামে একঘরে ও সমাজচ্যুত করা হয় আরেক আখতার-ঝরনা দম্পতিকে। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই শুক্রবার 'যায়যায়দিন' এরূপ আরেকটি খবর ছাপে, এতে বলা হয় বগুড়ার সার্ভেয়ার মকবুল হোসেন (৫৫) ও সফুরা বেগম (৫৩) হিল্লা বিয়েতে না করায় একঘরে জীবন যাপন করছে। কক্সবাজারের ঈদগাঁওতে পাঁচ সন্তানের জননী খালেদা আক্তার হিল্লায় যেতে নারাজ হওয়ায় তার স্বামী সন্তান সবাইকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই দম্পতি একঘরে বসবাস করে আসছে। এরূপ ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে। হাজার হাজার সংসার অঙ্কুরেই তছনছ হয়ে গেছে এই হিল্লার কারনে। কত মানুষ সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, কত নিরীহ নারীর জীবনে নেমে এসেছে ভর্ৎসনা, অপবাদ আর অনাশ্রয়ের অসূরমেঘ, কত নিষ্পাপ সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়েছে অকালে অকারণেই, সে হিসাব মেলানো সম্ভব নয়।

নিকাহ হালালা বা হিল্লা বিয়ে শরীয়ত অনুমোদিত নয় ঃ

১ম প্রমাণ ঃ

ইমাম তিরমিযী রহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে এ বিষয়ে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন,

عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحل والمحلل له

'ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত (লা'নত) করেছেন।'[৩৯৯]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী রহঃ বলেন,

سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي

'আমি জারুদ ইবনে মু'য়াজকে ইমাম ওয়াকী থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, এ হাদিসের ফলে যুক্তিবাদীদের কথা বাইরে নিক্ষেপ করা উচিৎ।'[৪০০]

২য় প্রমাণ ঃ

হযরত আলী মুর্তাজা রাঃ ও হযরত জাবির রাঃ থেকেও এ বিষয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

عن جابر بن عبد الله وعن علي قالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن المحل والمحلل له

'হযরত আলী রাঃ ও জাবির রাঃ বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, যে লোক হিলা করে এবং যে লোকের জন্য হিলা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাঃ অভিসম্পাত করেছেন।'[৪০১]

৩য় প্রমাণ ঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃ হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

'আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ হিলাকারী ও যার জন্য হিলা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত (লা'নত) করেছেন।'[৪০২]

৪র্থ প্রমাণ ঃ

আব্দুর রাজ্জাক রহঃ স্বীয় 'মুসান্নাফে' হযরত আত্বা রহঃ হতে অনুরূপভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن عطاء قال لعن النبي صلى الله عليه و سلم المحل والمحلل له

---

[৩৯৯] তিরমিযী- হাঃ ৩/৪২৮, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৭/৩৩৪, মুসনাদে আবি ইয়ালা- হাঃ ৮/৪৬৮, বাগভী- ৫/৫৬পৃঃ।

[৪০০] মুসনাদ আস সাহাবা- ২৬/৩২।

[৪০১] তিরমিযী- হাঃ ৩/৪২৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ- হাঃ ৪/২৯৫।

[৪০২] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ১৪/৪২।

‘হযরত আত্বা রহঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে লোক হিলা করে এবং যে লোকের জন্য হিলা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অভিসম্পাত।’[৪০৩]

৫ম প্রমাণ ঃ

ইমাম হাকেম রহঃ স্বীয় ‘মুসতাদরাক’এ সাহাবী উকবা বিন আমের রাঃ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا

بلى قال هو المحل ثم قال لعن الله المحل والمحلل له

‘হযরত উকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে ‘ভাড়া করা পাঠা’ সম্পর্কে বলব? তারা বলল, অবশ্যই হে রাসুল। রাসুল সাঃ বললেন, সে হল হিল্লাকারী। অতঃপর বললেন, আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত (লা’নত) করেছেন।’[৪০৪]

৬ষ্ট প্রমাণ ঃ

ইবনে মাজাহ রহঃ স্বীয় সুনানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ বিষয়ে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন,

عن ابن عباس قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

‘ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত (লা’নত) করেছেন।’[৪০৫]

৭ম প্রমাণ ঃ

ইবনে আবি শায়বাহ কূফী রহঃ স্বীয় মুসান্নাফে আলোচ্য বিষয়ের উপর হযরত আবু হুরায়রা রাঃ এর পাশাপাশি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ ও ইবনে শিরিন রাঃ হতেও অনুরূপ পৃথক পৃথক হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৪০৬]

৮ম প্রমাণ ঃ

---

[৪০৩] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- হাঃ ৬/২৬৯।
[৪০৪] মুসতাদরাক লিল হাকেম- হাঃ ২৭৩১। আরও দেখুন, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৯৩৬, দারাকুতনী- হাঃ ৩৫৭৬, বায়হাক্বী- হাঃ ৭/২০৮, জামেউল আহাদীস- হাঃ ৫/৪২৫।
[৪০৫] ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৯৩৪।
[৪০৬] মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ- হাঃ ৪/২৯৫,২৯৬।

ইমাম হাকেম রহঃ ও ইমাম তাবরানী রহঃ স্বীয় মুসতাদরাক ও আওসাত গ্রন্থে ওমর ইবনে নাফে’র বর্ণনা রেওয়ায়েত করেন, তিনি তাঁর পিতা নাফে’ হতে বর্ণনা করেন,

روي عمرو بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا،

فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهما ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة

كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)

‘ওমর ইবনে নাফে’ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে ওমর রাঃ এর নিকট আগমন করে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতঃপর তার এক ভাই কোন পরামর্শ ছাড়াই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নেয় তার ভাইয়ের জন্য হালাল করার নিয়তে। এভাবে কি প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হবে? তিনি জবাব দিলেনঃ না, পছন্দ ও আগ্রহের বিয়ে ব্যতীত হালাল হবে না। আমরা এটাকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে যিনা বিবেচনা করতাম।’[৪০৭]

৯ম প্রমাণ ঃ

হযরত ওমর রাঃ এর দৃষ্টিতে হিল্লার আয়োজন একটি গুরুতর অপরাধ ও ব্যভিচার বলে গণ্য হতো এবং তিনি হিল্লা আয়োজকদের শাস্তি হিসেবে ব্যভিচারের শাস্তির ন্যায় প্রস্তরাঘাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেমন, ইবনুল মুনজির রহঃ হযরত ওমর রাঃ এর বাণী নিম্নের শব্দে বর্ণনা করেন,

عن عمر بن الخطاب أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما

‘ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আমার নিকট কোন হিল্লাকারী পুরুষ অথবা নারীকে পেশ করা হয়, তাহলে আমি তাদের প্রস্তরাঘাত করবো।’[৪০৮]

১০ম প্রমাণ ঃ

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ রহঃ রেওয়ায়েত করেন, আব্দুল মালিক ইবনে মুগিরা ইবনে নাওফেল হতে বর্ণিত,

أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم

‘হযরত ইবনে ওমর রাঃ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার বিধান কি? তিনি বলেন, এটা ব্যভিচার। যদি ওমর রাঃ তোমাদের দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের শাস্তি দিতেন।’[৪০৯]

---

[৪০৭] আল-মুসতাদরাক লিল হাকেম- হাঃ ২৭৩১, তানতাভী- হাঃ ১/৪১৫, বায়হাক্বী- হাঃ ৭/২০৮।
[৪০৮] ইগাছাতুল লাহফান- ১/৪১১পৃঃ, ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/১৩৫পৃঃ।

১১তম প্রমাণ ঃ

ইমাম জুহরি রহঃ আব্দুল্লাহ ইবনে শারিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রাঃ কে বলতে শুনেছি, তাকে হিল্লাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন,

وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

'আমরা এটিকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর যুগে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করতাম।'

তিনি আরও বলেন,

وقال لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة

'যদি তারা বিশটি বছরও এভাবে পার করে, তবুও তারা উভয়ে যেনা অবস্থাতেই থাকবে, ।'[৪১০]

১২তম প্রমাণ ঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ হযরত হাসান বসরী রাঃ এর বাচনিক স্বীয় 'ইক্বামাতুদ দালিল আলা ইবতালিত তাহলীল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

أنه قال له رجل إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها فقال له الحسن إتق الله يا فتى ولا تكون مسمار نار لحدود الله

'এক ব্যক্তি (হাসান বসরী) কে বলল, আমার বংশের এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। এখন সে ও তার স্ত্রী লজ্জিত। আমি ইচ্ছা করছি আমি তাকে বিয়ে করি, মোহর প্রদান করি, অতঃপর তার সাথে মিলিত হই যেরূপ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। তারপর আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই। হাসান তাকে বলেন, হে যুবক আল্লাহকে ভয় কর। তুমি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে জাহান্নামের পেরেকে পরিণত হয়ো না।'[৪১১]

হাসান রাঃ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুসলমানগণ হিল্লাকারীকে 'ভাড়া করা পাঠা' হিসেবেই জানে এবং এ কাজে আল্লাহর লা'নত ছাড়া কিছুই হয় না। এছাড়াও, 'আউনুল মাবুদ' গ্রন্থকার বলেন, হিল্লাকারী সম্পর্কে কেউ বলেছেন, যেহেতু

---

[৪০৯] সুনানে বায়হাক্বী আল কুবরা- হাঃ ৭/২০৮।
[৪১০] ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/৪৭পৃঃ।
[৪১১] ইক্বামাতুত দালিল আলা ইবত্বালিত তাহলীল- ৩/৪৯৪পৃঃ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ- হাঃ ৪/২৯৬।

সে হালালা করার ইচ্ছা করেছে সেহেতু তাকে হালালকারী বলা হয়। হাফেয ইবনে হাজর আসক্বলানী রহঃ স্বীয় 'তালখীস' নামক গ্রন্থে বলেন, হাদীসবেত্তাগণ এর ভিত্তিতে দলিল দেন যে, যদি প্রথম স্বামী দ্বিতীয় স্বামীকে শর্ত করে যে, বিয়ের পরই সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে, অথবা সে তাকে তালাক দেবে, অথবা এ জাতীয় অন্য কোন শর্ত করে তবে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। ইমাম খাত্তাবী রহঃ স্বীয় 'মাআলেম' গ্রন্থে বলেন, যদি এ বিয়ে সম্পাদিত হয় উভয়ের শর্ত মোতাবেক তাহলে এ বিয়েই বাতিল। কেননা, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এ চুক্তি শেষ হয়ে যাবে 'মুতা' বিয়ের ন্যায়। ইব্রাহীম নখয়ী রহঃ বলেছেন, পছন্দ ও আগ্রহের বিয়ে ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য তিন তালাক প্রাপ্তা নারী কোনভাবেই হালাল হবে না। সুফিয়ান সওরী রহঃ বলেন, যদি কেউ হিল্লার নিয়তে বিয়ে করে, অতঃপর কেউ তাকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার ইচ্ছা করে, তাহলে এটা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়, যতক্ষণ না নতুনভাবে বিয়ে করে নিবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহঃও অনুরূপ বলেছেন। মালেক ইবনে আনাস রহঃ এর অভিমত হল, এ বিয়ে যে অবস্থাতেই হোক উভয়ের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে। জমহুর বিদ্বানগণের অভিমত এই যে, হিল্লা আয়োজক ও আয়োজনকারী সকলেই অভিশপ্ত এই জন্য যে, হিল্লাতে রুচিবোধ ও সম্মানের বিলুপ্তি ঘটে, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা দুটোই বিনষ্ট হয় এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতি ও ইতর স্বভাব স্পষ্ট হয়। সন্তান সন্ততিসহ সংসারের সাথে জড়িত সকলের জীবনমান অপবাদে কলুষিত হয়। আর যাকে দিয়ে হিল্লা করা হয় তার ব্যাপারে তো এসব স্পষ্ট, সে অপরের উদ্দেশ্যে নিজেকে পরস্ত্রীর সাথে সহবাসের জন্য ভাড়ায় বিক্রি করে। এ জন্যই হাদীসে এসব হিল্লাকারীকে ভাড়া করা পাঠার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কাযী আয়ায সূত্রে মিরকাতের লেখক মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ এ উক্তি উদ্ধৃত করেন।[৪১২]

অতএব, উত্থাপিত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথাই জোর দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামে হিল্লা শুধু গর্হিতই নয়, বরং কড়াভাবে নিষিদ্ধ এবং মারাত্মক গুনাহের কাজ।

আপত্তি ও জবাবঃ

নিতান্ত দুঃখের ব্যাপার হল, এরূপ একটি জঘন্য ও গর্হিত কাজকেও বৈধ করার জন্য লম্পট ধর্মদস্যুদের বাহানার যেন অভাব নেই। কোন কোন ফেক্বাহর কিতাবে এর এমন নামও দেওয়া হয়েছে যাতে মনে হয় এটি শরীয়তেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোথাও বলা হয়েছে 'নিকাহে হালালাহ বা হালালীকরণের বিয়ে' আবার কোথাও 'হালালায়ে শরয়ীয়্যাহ' অর্থাৎ শরয়ী উপায়ে হালালী করণ। মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। দাঁড়

---

[৪১২] আউনুল মাবুদ- হাঃ ১৭৩৬ (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)।

করিয়ে দেওয়া হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হাদীসের বিরুদ্ধে। চলুন এবার হিল্লার পেছনের বাহানাগুলোও পর্যালোচনা করা যাক।

১ম বাহানা ঃ কুরআন পরিষ্কার বলছে তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য হিল্লা ব্যতীত প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। যেমন,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

'তারপর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। যদি আল্লাহ্‌র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে।'[৪১৩]

জবাব ঃ (১) সমস্ত মুফাচ্ছিরীনে কেরামগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, এই আয়াতে তৃতীয় তালাকের কথা বলা হয়েছে। কোনভাবেই একত্রিত তিন তালাক নয়। কারন একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করা সর্বসম্মতিতে বিদআত, আর কুরআন কোনভাবেই বিদআত শিক্ষা দিতে পারে না। দুঃখের ব্যাপার হলো অজ্ঞতার কারনে নাকি অন্তরে বক্রতার কারনে জানিনা, আপত্তিকারীরা এই 'তিন' আর 'তৃতীয়'র মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করতে চান না। মুলত 'তিন' আর 'তৃতীয়'র মাঝে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। যেমন কেউ বলল, 'আমি এই মাসে তিনবার সিঙ্গাপুর সফর করেছি'। এই কথা দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, লোকটি একমাসের মধ্যেই তিনবার সিঙ্গাপুর সফর করেছে। আবার যদি বলে, 'আমি এই মাসে তৃতীয়বার সিঙ্গাপুর সফর করেছি'। এই কথা দ্বারা কিন্তু এটা বুঝা যায় না যে, লোকটি একমাসের মধ্যেই তিনবার সিঙ্গাপুর সফর করেছে, বরং বুঝা যায় লোকটি একমাসের মধ্যে কেবল একবার সিঙ্গাপুর সফর করেছে আর এটি তার তৃতীয় সফর। অনুরূপ একমাসে তিনবার রক্তদান করা আর তৃতীয়বার রক্তদান করা কিংবা একবছরে তিন জমাত সম্পন্ন করা আর তৃতীয় জমাত সম্পন্ন করা কিন্তু এক নয়। তালাক সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত আয়াতেও এরূপই বলা হয়েছে যে, এই বিধান তৃতীয় তালাক প্রদানের পরে প্রযোজ্য। এক তুহরে তিন তালাক প্রদানের পরে নয়।

(২) আয়াতের কোন অংশে এক তালাক, দুই তালাক বা তিন তালাক অথবা একত্রিত তিন তালাকের কথা স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কাজেই আয়াতটি ব্যাখ্যানির্ভর। যেমন, পবিত্র কুরআনের সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে (প্রচলিত অনুবাদ অনুযায়ী) স্ত্রীদের প্রহার করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ, কি দ্বারা, কিভাবে, কোথায় কোথায় এবং কতক্ষণ ধরে প্রহার করবে তা বলা হয়নি। এখন যদি কেউ কুরআনের দোহাই দিয়ে

[৪১৩] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩০।

তার স্ত্রীকে দিনে রাতে বেদম প্রহার করতে থাকে আর বলে কুরআনে তো মারতে বলা হয়েছে, তাহলে কি ব্যাপারটি আদৌ শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে? আছেন কেউ ফতোয়া দিবেন? আসলে এটি যেমন ভুল সিদ্ধান্ত, তেমনি তালাকের এই আয়াতটিতেও পূর্বাপর আয়াতের বিধি বিধান চিন্তা না করে শুধুমাত্র এই একটি আয়াত বিচার করে তক্ষুনি হিল্লার ফতোয়া দিয়ে বসা একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত। বিশ্বের সমস্ত মুফাচ্ছিরীনে কেরামগণ এ কথার উপর একমত যে, আনীত আয়াতে পন্থা মোতাবেক তালাকে রজঈদ্বয় অতিক্রম করার পরেও স্বামী স্ত্রী সমঝোতায় না আসলে তৃতীয় তালাকের পরবর্তী পরিণাম কি হবে তা বর্ণিত হয়েছে। কোনভাবেই একত্রিত তিন তালাকের বিধান বর্ণিত হয়নি। কারন, যেহেতু একত্রিতভাবে তিন তালাক দিয়ে দেওয়া বিদআত, সেহেতু কোন মুসলমান এটি মেনে নিতে পারে না যে কুরআনে বিদআত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যদি গায়ের জোরে শুধুমাত্র এই আয়াত দ্বারা হিল্লার ফতোয়া দেয়া হয়, তাহলেও এটি প্রত্যাখ্যাত হবে। কারন এখানে কুরআন নির্দেশিত সমঝোতার ব্যাপারটিও একেবারে উপেক্ষিত। অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তালাক সম্বলিত পূর্বাপর আয়াতসমূহের নিহিতার্থের সাথে এই আয়াতেরও একটা যোগসম্পর্ক বজায় থাকে আর সবগুলি আয়াতের সমন্বিত অর্থই যেন হয় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

(৩) আয়াতের শুরুস্থ 'فَ–ফা' প্রমাণ করে এখানে প্রক্রিয়ামুলক তালাকের বিধান বর্ণিত হয়েছে। আকস্মিক বা আচমকা তালাকের নয়। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত পন্থায় নারীর ইদ্দতের অবকাশ রেখে পরিচ্ছন্না অবস্থায় সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ধির-মেজাজে প্রতি তুহরে এক তালাক এক তালাক করে তৃতীয় তুহরে তৃতীয় তালাকটিও সম্পন্ন করে ফেললে তখন সে স্ত্রী আর প্রথম স্বামীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে ভিন্ন বৈধ নয়। আমরা জানি, হিল্লার পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন স্বামী ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে কুরআন সুন্নাহর তোয়াক্কা না করেই বিদআতি পন্থায় একসাথে তিন তালাক দিয়ে বসে। আবার যখন রাগ প্রশমিত হয়, সন্তানদের কান্নাকাটি সহ্য হয় না, তখন পুনরায় স্ত্রীকে রেখে দিতে চায় আর স্ত্রীও স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে চায় না। এই যে স্বামীর পুনরায় স্ত্রীকে রেখে দিতে চাওয়া আর স্ত্রীরও স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে না চাওয়া, এটাই তো সমঝোতার সম্ভাবনা। আর কুরআন সমঝোতা চায় বলেই তো তালাকের প্রক্রিয়াটি এত দীর্ঘ করেছে।

এছাড়াও, উল্লেখিত আয়াতের পূর্বের আয়াতের শানে নুযুল বলছে, নারীর অধিকার সমুন্নত রাখতেই তালাকের এসব বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী যুগে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের যথেচ্ছা তালাক দিতো আবার ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নিতো। না হৃদ্যতার সাথে রেখে দিতো, না সসম্মানে যেতেও দিতো। এভাবে কষ্ট দিতো। এই সংকট থেকে নারীকে উদ্ধার করতেই তালাকের নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

এখন স্বামী নিয়মের বাইরে গিয়ে বিদআতি পন্থায় তালাক দিবে আর নিপরাধ স্ত্রী যাবে অন্যের বিছানায়, নারীর প্রতি এই যুলুম কি জাহেলী যুগের সেই বর্বরতাকেও হার মানায় না? আজ যদি রাসুল সাঃ দুনিয়াতে থাকতেন, কী হতো আপনার ভেবে দেখুন।

(৪) এই আয়াতটিতে আদৌ হিল্লার কথা আছে কিনা তা বুঝতে হলে আমাদের পরবর্তী দুটি আয়াতের মুল নির্দেশনা দেখতে হবে। তাতে মহান আল্লাহ বলছেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা তাদেরকে হয় হৃদ্যতার সাথে রেখে দাও অথবা সদয়ভাবে মুক্তি দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করো না।’[৪১৪]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ন করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।’[৪১৫]

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের নির্দেশনা এই যে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর যদি নির্ধারিত ইদ্দত নিঃশেষও হয়ে যায়, তখনও তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিয়ে করা যাবে। আয়াতদ্বয় ও পূর্বোক্ত আয়াতের মাঝে পার্থক্য এটুকু যে, শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক তথা রেজয়ী তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা এ ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং প্রথমোক্ত আয়াতে পন্থা মোতাবেক রেজয়ী তালাকদ্বয় অতিক্রম করে তৃতীয় তালাকটিও দিয়ে ফেললে স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। যদি প্রথমোক্ত ২৩০ নং আয়াতে হিল্লার কথাই বলা হতো তাহলে শেষোক্ত ২৩১ নং আয়াতে فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ‘তোমরা তাদেরকে হৃদ্যতার সাথে রেখে দাও’

[৪১৪] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩১।
[৪১৫] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩২।

এবং ২৩২ নং আয়াতে فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ‘তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না’ বাক্যগুলোর অর্থ কি হবে? আর যদি ২৩০ নং আয়াতটি বিদআতি পন্থায় একত্রিত তিন তালাক দত্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় তাহলে وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ‘আর আল্লাহর নির্দেশকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করো না’ বাক্যটি কিসের হুঁশিয়ারী? সহজ কথায়, কুরআন মেনে তালাক দিলে কস্মিনকালেও হিল্লা’র পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার কথা নয়।

(৫) সুরা বাক্বারাহ’র ২৩২ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসাবে উল্লেখ আছে, আয়াতটি হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার রাঃ ও তাঁর ভগ্নী সম্মন্ধে অবতীর্ণ হয়। সহিহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর রয়েছে এরূপ, হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার রাঃ বলেন, আমার নিকট আমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব আসলে আমি তাকে বিয়ে দিয়ে দেই। তার স্বামী কিছুদিন পর তাকে তালাক দিয়ে দেয়। ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূণরায় সে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব করলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে হযরত মা’কাল রাঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সঙ্গে আর আমার বোনের বিয়ে দেবো না এ শপথ সত্ত্বেও বলেন, আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। অতঃপর তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে ডেকে পাঠিয়ে পূণরায় তার সাথে তাঁর বোনের বিয়ে দেন। তারপর নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। তাঁর ভগ্নীর নাম ছিল জামিলা বিনতে ইয়াসার রাঃ এবং স্বামীর নাম ছিল আবুল বাদাহ রাঃ। কেউ কেউ তাঁর নাম ফাতিমা বিনতে ইয়াসারও বলেছেন।[৪১৬] হাদীসটি এই,

حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه–[৪১৭]

আয়াতের শানে নুযুলে দেখা যাচ্ছে, কোন হিল্লা বিয়ে ছাড়াই হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার রাঃ তার বোনকে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। এখানে আরেকটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়, সুরা বাক্বারাহর ২৩১ এবং ২৩২ নং আয়াতে কিন্তু এমন কোন কথার স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, এক তালাক পরবর্তী বা দুই তালাক পরবর্তী অথবা তিন

[৪১৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর- খন্ডঃ ১, পৃঃ ৬৪৯।
[৪১৭] বুখারী- হাঃ ৪৮৩৭।

তালাক পরবর্তী কিংবা একত্রিত তিন তালাক পরবর্তী ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। আবার একইভাবে ২৩০ নং আয়াতেও এরূপ কোন নির্দেশনা উল্লেখ নেই। এখন কোন প্রকারের তালাক পরবর্তী প্রযোজ্য তা উল্লেখ না থাকা স্বত্ত্বেও যদি ২৩০ নং আয়াত দ্বারা হিল্লার ফতোয়া দেওয়া হয়, সেই একই কারনে ২৩১ এবং ২৩২ নং আয়াত দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা এ আয়াতদ্বয়েও সেরূপ কোন শর্তের উল্লেখ নেই, অথচ তালাকদত্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ রয়েছে।

(৬) হযরত কাতাদাহ রাঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ আপন স্ত্রী হযরত হাফসা রাঃ কে তালাক দিলে তিনি তাঁর পিতার বাড়ি চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা সুরা ত্বালাকের প্রথম আয়াতটি নাযিল করেন এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ কে স্বীয় স্ত্রী হাফসা রাঃ কে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বলা হয়। তারপর তিনি হাফসা রাঃ কে ফিরিয়ে নেন। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ওমল ইবনুল খাত্তাব রাঃ (আজমাঈন) হতে বর্ণনা করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها

'রাসুলুল্লাহ সাঃ হযরত হাফসা রাঃ কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।'[৪১৮]

এই হাদীসেও হিল্লার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, এখানেও কোন প্রকারের তালাক তা স্পষ্ট বলা নেই।

(৭) ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা তাঁদের সনদ সহকারে বর্ণনা করতেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ ইবনে হুসাইনের বাচনিক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইকরিমার প্রমুখাত রেওয়ায়েত করেছেন যে,

عن بن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দে ইয়াযীদের পুত্র রুকানা তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করেন। পরে স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হলে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে কীরূপ তালাক দিয়েছ? রুকানা বললেন, একত্রিতভাবে তিন তালাক দিয়েছি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, ঠিক আছে, এই তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে। সুতরাং তুমি যদি মনে

[৪১৮] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০১৬, আবু দাউদ- হাঃ ২২৮৫, দারেমী- হাঃ ২২৬৪।

কর, তবে তাকে পূণঃ গ্রহন করতে পার। অতঃপর রুকানা তার (তিন তালাকদত্তা) স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, অবশ্যই তালাক হতে হবে প্রতি তুহরে।'[৪১৯]

এই হাদীসেও দেখা যাচ্ছে, নবী করীম সাঃ রুকানার স্ত্রীকে তিন তালাক দত্তা হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ হিল্লা ছাড়াই তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর এটিও উল্লেখ আছে, এই তিন তালাক একত্রিত ছিল। কাজেই নিশ্চিতরূপে বলা যায়, সুরা বাক্বারাহর ২৩০ নং আয়াতের দোহাই দিয়ে হিল্লা নামক যে অপনাট্য সমাজে চালু আছে তা সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত, অত্যন্ত নিন্দিত ও গর্হিত কাজ।

২য় বাহানা ঃ হালালা বিয়ে সহিহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত। কেননা হাদীসে এসেছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে এবং অপর স্বামী তাকে বিয়ে করে নেয় তবে সেও সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয়। সে স্ত্রী প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে নবী সাঃ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, নবী সাঃ জবাবে বললেন, না সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না তারা উভয়ে উভয়ের সহবাসের স্বাদ গ্রহন করে। যেমন,

عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن زبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

'হযরত আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু কুরায়যা বংশের রিফায়ার স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে এসে অভিযোগ করল যে, আমি রিফায়ার স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিয়ে বিদায় করলে আমি আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইরকে বিয়ে করি। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের পুটলির চেয়ে বেশি কিছু নেই। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, তুমি কি রিফায়ার কাছে ফিরে যেতে চাও? না যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি তার সহবাসের স্বাদ গ্রহন কর আর সেও তোমার সহবাসের স্বাদ গ্রহন করে।'[৪২০]

জবাব ঃ (১) হাদীসের নির্জলা অপব্যবহার এটি। উক্ত অভিযোগের প্রকৃত কারন কি ছিল তা আপত্তিকারীরা কখনোই স্বীকার করবে না। স্বীকার করলে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। চলুন দেখা যাক তাহলে বাকী ঘটনা কী ছিল।

[৪১৯] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৩৮৭, মুসনাদে আবি ইয়ালা- হাঃ ২৫০০। আরও দেখুনঃ ফাতহুল বারী- ৯/৩৬২পৃঃ, বায়হাক্বী আল কুবরা- হাঃ ১৪৭৬৪, রাওজাতুল মুহাদ্দেসীন- হাঃ ১৮৫০, ইরওয়া আল গালীল- ৭/১৪৪পৃঃ, ফিক্বহুস সুন্নাহ- ২/২৬৯পৃঃ, ইগাছা- ১/২৮৭পৃঃ।

[৪২০] মুসলিম- হাঃ ৩৫৯৯, বুখারী- হাঃ ২৬৩৯, তিরমিযী- হাঃ ১১১৮, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৯৩২।

قال وسمع أنها قد أتت رسول الله فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فقال رسول الله فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين

'বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর শুনতে পেলেন যে, তার স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে (নালিশ করতে) এসেছে। তাই সেও তার পূর্ব স্ত্রীর দুটি ছেলেকে সাথে করে চলে এলো। স্ত্রী লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! তার উপর আমার এ ছাড়া আর কোন অভিযোগ নেই যে, তার কাছে যা আছে তা আমাকে এ জিনিসের চেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয় না। এ বলে তার কাপড়ের আঁচল ধরে দেখাল। আব্দুর রহমান বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সে মিথ্যা বলছে। আমি তার সাথে পূর্ণশক্তির সাথে দীর্ঘক্ষণ সঙ্গমের চেষ্টা করি। কিন্তু সে অবাধ্য স্ত্রী, রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চায়। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, ব্যাপার যদি তাই হয় তাহলে রিফাআ তোমার জন্য হালাল হবে না। অথবা তুমি তার যোগ্য হতে পারো না যতক্ষণ না আব্দুর রহমান তোমার সুধা আস্বাদন করবে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ আব্দুর রহমানের সাথে থাকা তার পুত্রদ্বয়কে দেখে বললেন, এরা কি তোমার পুত্র? তিনি বললেন হ্যাঁ। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, এই আসল ব্যাপার, যে জন্য স্ত্রীলোকটি এরূপ করছে।'[৪২১]

এখন বলুন, এই হাদীসের কোথায় উল্লেখ আছে, আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর সেই স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়তে বিয়ে করেছিলেন? অধিকন্তু হাদীসের বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি তাকে আগ্রহ ভরে, সন্তান লালন পালনের জন্য ও স্থায়ীভাবে রাখার উদ্দেশ্যেই বিয়ে করেছিলেন। সেই সাথে তার তলব করাতেই তিনি তাকে তালাক দিয়ে দেননি, বরং সে তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। এছাড়াও, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুস্পষ্ট কথা فإن كان ذلك 'ব্যাপার যদি তাই হয়' এবং هذا الذي تزعمين ما تزعمين 'এই আসল ব্যাপার, যে জন্য স্ত্রীলোকটি এরূপ করছে' দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি হিল্লা বিষয়ক নয়। যদি এই হাদীস হিল্লা সম্পর্কে হতো, তাহলে উক্ত মহিলা অভিযোগও করতো না আবার আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইরও সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপত্তি জানাতো না। চুপিসারে আলাদা হয়ে রিফায়ার ঘরে উঠে পড়তো।

[৪২১] বুখারী- হাঃ ৫৪৮৭।

(২) ইবনে আব্দুল বার রহঃ বলেন, রিফায়ার স্ত্রীকে সম্বোধন করে রাসুলুল্লাহ সাঃ যে বলেছেন, أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ 'তুমি কি রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চাও?' এ কথা দ্বারা বুঝা যায়, এ বিয়ে স্বাভাবিক ছিল। তিনি আরও বলেন, স্ত্রীর মধ্যে প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে থাকার কারনে বিবাহকারীর সমস্যা হবে না, এটি অভিশপ্ত হিল্লার সেই অর্থও বহন করে না।[৪২২] এছাড়াও হাদীসের وما معه إلا مثل هدبة الثوب 'তার কাছে কাপড়ের পুটলির চেয়ে বেশি কিছু নেই' বাক্যটি প্রমাণ করে যে, উক্ত মহিলার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করার প্রকৃত কারন ছিল (স্ত্রীর দাবিমতে) দ্বিতীয় স্বামীর শারীরিক অক্ষমতা। এর বেশি কিছু নয়।

(৩) এবার রুকানার পিতা আব্দে ইয়াযীদের হাদীসটির প্রতি আরেকবার দৃষ্টি দেয়া যাক। ইমাম আবু দাউদ রহঃ আব্দুর রাযযাকের হাদিস হতে, তিনি ইবনে জুরায়জের বাচনিক রেওয়ায়েত করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবু রাফে'র কোন পুত্র ইকরিমার নিকট হতে এবং তিনি ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়েত করেছেন যে,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم وقالت ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة وإخوته وقال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل فقال راجع امرأتك أم ركانه فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)

'ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রুকানার পিতা আব্দে ইয়াযীদ উম্মে রুকানা (রুকানার মা) কে তালাক প্রদান করেন এবং মুযায়না গোত্রের অন্য এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। উক্ত মহিলা একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজ মস্তক হতে একটি চুল উপড়ে অভিযোগ করল, এই চুল দ্বারা যেটুকু হয়, আব্দে ইয়াযীদের দ্বারা এর অতিরিক্ত আমার কার্যোদ্ধার হয় না। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। রাসুলুল্লাহ সাঃ উষ্মা বোধ করলেন এবং রুকানা ও তার ভাইদের আহ্বান করলেন। অতঃপর তিনি সাঃ সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, আব্দে ইয়াযীদের এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক

[৪২২] আত তাহমীদ- ১৩/২২৭।

অংশে আর এই পুত্রের দেহের অমুক অমুক অংশে কি আব্দে ইয়াযীদের সৌ-সাদৃশ্য নেই? সকলেই বলল, অবশ্যই আছে। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ আব্দে ইয়াযীদকে বললেন, তুমি একে তালাক দাও। আব্দে ইয়াযীদ তাই করলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাঃ আব্দে ইয়াযীদকে আবার নির্দেশ দেন যে, তুমি উম্মে রুকানা (রুকানা ও তার ভ্রাতাগণের মা) কে পুণঃগ্রহন করো। আব্দে ইয়াযীদ বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো তাকে তিন তালাক প্রদান করেছি। রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন, তা আমি জানি, তুমি তাকে পুণরায় গ্রহন করো। এরপর তিনি সাঃ পবিত্র কুরআন হতে সুরা ত্বালাকের প্রথম আয়াত তিলাওয়াত করেন, হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।'[৪২৩]

লক্ষ্য করুন, প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসে রিফায়া কুরায়যীর স্ত্রী ও অত্র হাদীসে আব্দে ইয়াযীদের স্ত্রী উভয়েই একই অজুহাতে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করেছেন। আর তা হলো, (তাদের দাবিমতে) স্বামীর শারিরীক অক্ষমতা। এখন রিফায়ার স্ত্রীর জন্য যে বিধান, আব্দে ইয়াযীদের স্ত্রীর জন্যও একই বিধান প্রযোজ্য হবার কথা। নয় কি? অথচ দেখা যাচ্ছে, আব্দে ইয়াযীদ কোনরূপ হিল্লা ছাড়াই রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নির্দেশে উম্মে রুকানাকে পুণঃগ্রহন করছেন। এ থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, রিফায়ার প্রাক্তন স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে অন্য কারনে অর্থাৎ সৎছেলে দুটোকে সহ্য না হওয়ার কারনে বিচ্ছেদ চেয়েছিল? যেমনটি একটু আগে (১) নং এ উল্লেখ করেছি। মুলত রিফায়ার প্রাক্তন স্ত্রীর পেশকৃত উপসর্গ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দৃষ্টিতে ন্যায়যুক্ত ছিল না বলেই তিনি তার আবেদন উক্ত কথা বলে নাকচ করে দিয়েছেন। হিল্লার লেশমাত্র ইঙ্গিতও এখানে নেই।

(৪) আচ্ছা, যদি দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ গ্রহনের ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তখন হয় স্ত্রীকে গর্ভপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে অথবা পেটে সন্তান নিয়েই প্রথম স্বামীর কাছে চলে আসতে হবে। যে অবস্থাতেই হোক, এই নিষ্পাপ সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে? কাজেই ইসলাম এমন কোন আইন দিতে পারে না, যা মানবসমাজে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টির কারন হবে। বরং আমরাই ভুল উপলব্ধি করি।

৩য় বাহানা ঃ হাদীসে যেহেতু حلله শব্দটি এসেছে এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ দ্বিতীয় স্বামীকে হালালকারী বলেছেন, তখন হিল্লা বৈধ হওয়ার জন্য এটাই উপযুক্ত দলিল। কেননা,

[৪২৩] আবু দাউদ- হাঃ ২১৯৮। আরও দেখুনঃ বায়হাক্বী- হাঃ ১৪৭৬৩, মুসান্নাফে আব্দ রায্যাক- হাঃ ১১৩৩৪।

حلله শব্দের অর্থই হল হালাল করা। যদি হিল্লা বিয়ে বাতিল হতো, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে হালালকারী বলা হতো না।

জবাব ঃ হাদীসে لعنة শব্দটিও এসেছে। আর لعنة শব্দের অর্থই হল অভিশম্পাত করা। যেহেতু হাদীসে এ সমস্ত নোংরামীতে জড়িত সকলকে লা'নত করা হয়েছে, তখন প্রশ্নকারীর প্রশ্নমতে এটাই হিল্লা অবৈধ ও নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত দলিল। কেননা, কোন হালাল কাজে কষ্মিনকালেও লা'নত হতে পারে না। আর যে কাজ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দৃষ্টিতে অভিশপ্ত সে কাজ বৈধতার দলিল হয় কি করে? এখানে حلله শব্দটি একটি কথার কথা মাত্র, কার্যত নয়। যেমন মঙ্গলবারে 'মঙ্গল' আছে, তাই বলে সেদিনের যাবতীয় অন্যায়, অপরাধ, হানাহানি-মারামারি, শিরক, কুফর সবকিছুকে মঙ্গলজনক বলে হজম করা যাবে না।

حلله শব্দটি মুলত হালালকারীর ধারণা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের সুরা ক্বসাসের ৬২ নং আয়াতে এসেছে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ মুশরিকদের ডেকে বলবেন, أَيْنَ شُرَكَائِيَ 'আমার শরীকরা কোথায়?', এখানে শরীক বলা হয়েছে মুশরিকদের ধারণা অনুযায়ী। মুলত আল্লাহর কোন শরীক থাকতে পারে না। এখন হালালকারী বলার কারনে যদি হিল্লা বৈধ হয় তাহলে শরীক বলার কারনেও শিরক বৈধ হবার কথা (নাউযুবিল্লাহ)। মুশরিকদের দৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা তাদের জন্য কল্যাণের হলেও আল্লাহর কাছে যেমন তা গ্রহনযোগ্য নয়, তেমনি হিল্লাকারীরা হিল্লা করাকে সওয়াবের কাজ মনে করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তা সর্বদা হারাম। হারাম না হলে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অভিশম্পাত এর কি অর্থ থাকতে পারে? অনুরূপভাবে এই আয়াতাংশটিও চিন্তা করা যেতে পারে, মহান আল্লাহ বলছেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 'তারা তাদের পণ্ডিত ও সন্যাসীদের প্রভু হিসেবে গ্রহন করেছে আল্লাহর পরিবর্তে এবং মরিয়ম পুত্র (ঈসা আঃ) মসীহকেও।'[৪২৪] এখানে বলা হচ্ছে মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ সহ কিছু লোককে একদল পথভ্রান্ত তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। এখন কি এ কথা বলা উচিৎ হবে, যেহেতু আল্লাহ তাদের প্রভু বলেছেন সুতরাং তাদের প্রভুত্ব বৈধ হওয়ার জন্য এটাই উপযুক্ত দলিল?

সারকথা হলো, এ বিয়ে অস্থায়ী এবং শরয়ী বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী হওয়ার কারনে বাতিল। প্রাক ইসলামী যুগে মুতা বিয়ের মতো অস্থায়ী বিয়ের প্রচলন ছিল এবং ইসলামী মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আগে মুসলিমদেরকেও মুতা বিয়ের মতো অস্থায়ী বিয়েতে

[৪২৪] সুরা তওবা ঃ ৩১।

অভ্যস্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু ইসলামী অনুশাসনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুতা বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। মুতা বিয়ে যেখানে শরয়ী বিয়ের উদ্দেশ্য পরিপন্থী হওয়ায় নিষিদ্ধ সেখানে হিল্লার মতো ক্ষণস্থায়ী একটি প্রতারণার বিয়ে কিভাবে ইসলাম অনুমোদিত হতে পারে? বস্তুত সমস্ত ওলামায়ে হক এ কথার উপর একমত যে, প্রথম স্বামী, স্ত্রী ও দ্বিতীয় স্বামী এই তিন জনের মধ্যে কোন একজনের মনেও যদি এই চিন্তা আসে যে, এই বিয়ে অস্থায়ী, শুধুমাত্র ভেঙ্গে যাওয়া সংসারকে জোড়া লাগাবার নিয়তে এই বিয়ে হচ্ছে, তাহলে ইসলাম বলে এই বিয়ে বৈধ নয়। কেননা, এ বিয়েতে শরয়ী বিয়ের মহান উদ্দেশ্য যেমন পারস্পরিক ভালবাসা, নিজেদের পুতঃপবিত্র রাখার মানসিকতা, স্থায়ীভাবে বসবাস ও সন্তান লাভের আশা আকাঙ্খা ইত্যাদি অনুপস্থিত থাকে। এই জন্য রাসুলুল্লাহ সাঃ এই সমস্ত নাটকীয় বিয়ের আয়োজক এবং এতে অংশ গ্রহনকারী সকলের উপর লা'নত করেছেন।

৪র্থ বাহানা ঃ হিল্লা বিয়ের সময় যদি তালাক দেওয়ার শর্ত না থাকে কিংবা গোপন থাকে, তাহলে বিবাহ সিদ্ধ হবে। কেননা, সিদ্ধান্ত হবে প্রকাশ্য কথার উপর, অন্তরের গোপন বাসনার উপর নয়। এটি হানাফী মাযহাবের কতিপয় বিদ্বানের অভিমত।

জবাব ঃ পবিত্র কুরআনে এক শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।'[৪২৫]

এখন প্রশ্নমতে সিদ্ধান্ত যদি প্রকাশ্য কথার উপর হয় তাহলে একদল লোক ঈমান এনেছি বলে স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরও তারা ঈমানদার নয় কেন?

মুলত সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য কথার উপর হয় না। কখনো কখনো নীরব থাকাতেও সম্মতির প্রকাশ পায়। খোদ রাসুলুল্লাহ সাঃ নীরব থেকে ইসলামের বহু বিধানের অনুমোদন দিয়েছেন। যেগুলোকে আমরা তাক্বরিরী হাদীস বলে জানি। তাছাড়া যেকোন শর্ত যত গোপনই হোক, তা দ্বারা পৃথিবীর সবাইকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আসমান জমিনের কোন কিছুই তাঁর আয়ত্বের বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বাণী, إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ 'নিশ্চয় তিনি যাবতীয় প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়ে পরিজ্ঞাত।'[৪২৬] সর্বোপরি, মুখে প্রকাশ না করাটাই হলো প্রকৃত ধোঁকা। মহান আল্লাহ ধোঁকাবাজদের ধিক্কার দিচ্ছেন, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ 'ধিক! ধোঁকাবাজদের

[৪২৫] সুরা বাক্বারাহ ঃ ৮।
[৪২৬] সুরা আ'লা ঃ ৭।

জন্য।'[৪২৭] রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৪২৮] তিনি আরও বলেন, والمكر والخداع في النار 'ঠক ও প্রতারকরা জাহান্নামে যাবে।'[৪২৯] এছাড়াও, অন্তরে এক রকম আর মুখে অন্য রকম এটি কোন মুমিনের স্বভাব হতে পারে না, এটি মুনাফিকের স্বভাব।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না আর তারা তা অনুভব করতে পারে না।'[৪৩০]

৫ম বাহানা ঃ হানাফী মাযহাবের আরেকদল বিদ্বানের দাবি হল, তাহলীলের সময় যদি শর্তও করে থাকে, তাহলেও বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা, হারাম শর্তের কারনে বিবাহ বাতিল হয় না।

জবাব ঃ হারাম উপায়ে বিবাহ হলে তা অবশ্যই বাতিল। যেমন, কোন তাওহীদবাদী নর নারীর জন্য মুশরিক কাউকে বিয়ে করা হারাম। জামাতার জন্য তার শাশুড়ীকে বিয়ে করা হারাম। অনুরূপভাবে, দুই সহোদর বোনকে, খালা ও ভাগ্নিকে, ফুফি ও ভাতিজিকে এক সাথে বিয়ে করা যায় না। আবার কোন নারীও একসাথে একাধিক স্বামীর স্ত্রী হতে পারে না। এখন কোন বিকৃত রুচির লোক দ্বারা এমন গর্হিত কাজও যদি সংঘটিত হয়, তাদের ব্যাপারে হুকুম কী? যত শর্তই জুড়ে দেয়া হোক, এই প্রকারের বিয়ে হারাম হওয়ার কারনে বাতিল। সহিহ বুখারীতে এসেছে,

وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما

'হাসান রহঃ বলেছেন, যখন কেউ অজান্তে কোন মুহার্‌রাম (যাদের সাথে বিয়েতে বসা বৈধ নয়) মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে, তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।'[৪৩১]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহঃ বলেন, 'এ বিয়ে বাতিল। আর বাতিল হওয়ার মুল কারন হল মহান আল্লাহ যাদের সাথে আক্বদ হারাম করেছেন এ বিয়েতে তাদের সাথেই আক্বদ হয়।'[৪৩২]

[৪২৭] সুরা মুত্বাফফিফীন ঃ ১।
[৪২৮] মুসলিম- হাঃ ১/৬৯।
[৪২৯] ইবনে হিব্বান- হাঃ ৫৬৭, মু'জামুল কবীর- হাঃ ১০২৫৬।
[৪৩০] সুরা বাক্বারাহ ঃ ৯।
[৪৩১] বুখারী- ৭/৫১৮ পৃঃ,।
[৪৩২] জামেউল আহাদিস- ১৩৮ পৃঃ।

এছাড়াও যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তাতো বাতিলই, যদিও তা শতাধিক শর্ত হয়। যেমন হাদীসে এসেছে,

ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق

'লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। তারা যদি এরূপ কোন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যদিও তা একশতবার করা হয়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সত্য ও সুদৃঢ়।'[৪৩৩]

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

'আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে নেই এমন সমস্ত শর্ত বাতিল, যদিও তা শত শর্ত হয়।'[৪৩৪]

এবার দেখুন খোদ হানাফী মাযহাব কি বলছে,

كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

'মুসলমানদের পারস্পরিক যেকোন সমঝোতা বা সন্ধিচুক্তি বৈধ। তবে কোন হারামকে হালাল অথবা কোন হালালকে হারাম করার চুক্তি বৈধ নয়।'[৪৩৫]

স্বামীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্ত্রী করবে কী? ইসলাম কী বলে?

স্বামী তালাক দিয়ে ভুল করলে সেই ভুলের মাশুল গুণতে হবে স্ত্রীকেই। আর তা হবে অন্যের বিছানায় যেয়ে। আমাদের মুসলিম সমাজে শত শত বছর ধরে চলে আসা এই কুনিয়মের প্রেক্ষিতেও বলা হয়ে থাকে, এটাই নাকি স্বামীর জন্য উচিৎ শাস্তি আর স্ত্রীর জন্য রহমত। কিন্তু আমরা দেখি, এক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীকে ক্ষমা করলেও এই ক্ষমার কোন মূল্য থাকে না। আরও বলা হয়ে থাকে, স্ত্রী হিসাবে নারীর যে সম্মান, তালাক তা ক্ষুন্ন করে। যে স্বামী কথায় কথায় তালাক দিতে পারে, সে মূলত স্ত্রীকে অসম্মানই

[৪৩৩] বুখারী- হাঃ ২০৪৭, ২৪২১, ৪৪৪, ২৫৮৪, মুসলিম- হাঃ ৩৮৫০, আবু দাউদ- হাঃ ৩৯৩১, দারাকুতনী- হাঃ ৭৭, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৪৫২২, ২৬৩৩৫।
[৪৩৪] মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৫৭৮৬, মু'জামুল কবীর- হাঃ ৪৯৩, জামেউল আহাদীস- হাঃ ৩৩৪, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৪২৭২, ফতহুল বারী- ৯/২১৯।
[৪৩৫] হেদায়াহ- ৩/১৯২, রদ্দুল মুহতার- ২/৩৫১, হাশিয়াহ ইবনে আবেদীন- ৮/২২২, তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন- ২/৫১৪ পৃঃ।

করে। তাই স্বামী যাতে কথায় কথায় তালাক না দেয় সেজন্য এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে। মাওলানা ইউসূফ সুলতান তার এক আর্টিকেলে এসব উদ্ভট প্রলাপ প্রসবের পর তিনি লিখেন, কোন নারী নিশ্চয় এতকিছু বুঝার পর ইসলামের এই সুন্দর বিধানকে অসম্মান করবে না। বরং নিজের সম্মান যদি নারী বুঝতে পারে, তাহলে ইসলামের এ বিধান পেয়ে নিজেকে সম্মানিতই মনে করবে। এটা নাকি পবিত্র কুরআনের অনুপম দূরদর্শিতাও। আমি বলি, এটি কুরআনের নামে নারীলোভীদের একটি দূরভিসন্ধিতা। হাটহাজারী মাদ্রাসার সিনিয়র ও প্রবীণ ফক্বীহ মুফতি জসীমুদ্দীন সাহেবও এরূপই ফতোয়া দিয়েছেন। উনারা কি জানেন না, কোন প্রকারের তালাকে নারীর সম্মানহানি হয়? সেই বিদআত তালাকের অনুমোদন রেখে নারীকে পাঠানো হচ্ছে অন্যের বিছানায়? তাও আবার রহমত বলে! কতবড় স্পর্ধা! রাগ হয়েছে স্বামীর, পিটিয়েছে স্বামী, তালাকও দিয়েছে স্বামী, শাস্তিটা কেন স্ত্রীর? সেতো স্বামীর সেবাযত্ন করে, সংসারের দেখভাল করে, রান্না-বান্না করে, বাল-বাচ্চার লালন পালন করে। সত্তর-আশি বছর ধরে সঙ্গ দিয়েও স্বামীর একটি ভুলের কারনে নারী মুহুর্তের মধ্যেই রাস্তায়! আবার নিজেরই ঘরে ফিরতে চাইলে গা বিলাতে হবে অন্যের বিছানায়! এ কেমন বিচার?

স্বামী যেহেতু তালাক দিয়ে অন্যায় করেছে, সেজন্য হয়ত সে এটিকে তার জন্য শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে পারবে। কিন্তু যদি সে দম্পতির কোন সন্তান সন্ততি থাকে, তারা এটিকে কোন অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে নেবে? তাদের উপর যে অপবাদের ঝড় নেমে আসবে তা সহ্য করবে কিভাবে? পৃথিবীর কোন বৈধ সন্তান তার মাকে অন্যের বিছানায় চিন্তা করার ধৈর্যশক্তি অর্জন করতে হলে পৃথিবীকে কতবার ধ্বংস হতে হবে পাঠকগণ ভাবুন। যে আইন গোপনে প্রয়োগ হয়, স্ত্রী নিরপরাধ হলেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সবকিছু মেনে নিতে হয় তা রহমত হয় কি করে? আসল কথা হল, সব ধরনের তালাকে নারীর সম্মান ক্ষুন্ন হয় না। বরং যে তালাক কুরআন সুন্নাহ'র, সে তালাক মুক্তির। আর যে তালাক মুক্তির, সে তালাক সম্মানের।

চলুন এবার দেখা যাক, একজনের কুকর্মে অন্যজন দায়ী হবে কিনা, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন কি বলে ঃ

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 'যে ব্যক্তি কোন অন্যায় করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। একজনের প্রায়শ্চিত্তের ভার অন্যজনে বহন করবে না।'[৪৩৬] وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ 'যে কেউ অন্যায় করে, সে নিজের পক্ষেই করে।'[৪৩৭]

[৪৩৬] সুরা আনআম ঃ ১৬৪, সুরা নাজম ঃ ৩৮, সুরা ইসরা ঃ ১৫, সুরা যুমার ঃ ৭, সুরা ফাতির ঃ ১৮।
[৪৩৭] সুরা নিসা ঃ ১১১।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।’[৪৩৮] كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী।’[৪৩৯] لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‘তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।’[৪৪০] الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ‘সেইদিন প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। সেইদিন কারোর প্রতি অবিচার হবে না।’[৪৪১] وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ‘আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে, তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেও অন্যায় করা হবে না।’[৪৪২]

এবার বলুন, কুরআনকে আর কতবার কতভাবে বলতে হবে স্বামীর পাপের দায়ে স্ত্রী দণ্ডিত হবে না? একদিকে স্বামীর হাতে তালাকের যথেচ্ছা ব্যবহারের অধিকার, অন্যদিকে তারই কুকর্মের ফল স্ত্রীর ঘাড়ে, এ নিয়ম কি একটি সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার অন্তরায় নয়? সম্মানিত মুফতিগণ, যারা স্বামীর পাপের দায়ে স্ত্রীকে পাঠাচ্ছেন অন্যের বিছানায়, আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি নিন।

হিল্লা প্রথা বিনাশ না হওয়ার মুল কারন ও উত্তরণের উপায় ঃ

(১) সমাজে বিদআতের অবাধ ছড়াছড়ি। যেমন, নিয়ম বহিঃর্ভূত পন্থায় কেউ তাৎক্ষণিক তিন তালাক দিয়ে দিলে তাকে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার কারনে হিল্লার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অথচ, তিন তালাক একসাথে দেওয়াই হলো বিদআত। কাজেই এই বিদআত রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহ অনুসারে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করতে হবে।

(২) মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। যেমন, রাগের মাথায় কেউ তালাক বলে ফেললে প্রথমে তাকে সমাজিকভাবে নিগৃহীত করা হয়, তারপর তার সব ধরণের অনুতাপ অনুশোচনার অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আরও মানসিক যন্ত্রনায় আর্ত করে তোলা

[৪৩৮] সুরা মুদ্দাচ্ছির ঃ ৩৮।
[৪৩৯] সুরা তুর ঃ ২১।
[৪৪০] সুরা বাক্বারাহ ঃ ১৩৪, ১৪১।
[৪৪১] সুরা গাফির ঃ ১৭।
[৪৪২] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৮১, সুরা আলে ইমরান ঃ ২৫,১৬১, সুরা যাছিয়াহ ঃ ২২।

হয়, সেই সাথে তার নিষ্পাপ সন্তান সন্ততিদের ঠেলে দেয়া হয় এক অনিশ্চিত অন্ধকার গন্তব্যের দিকে। ফলে হিল্লার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কাজেই রাগের মাথায় কেউ তালাক দিলেও তাকে কুরআন সুন্নাহ অনুসারে চিন্তা বিবেচনার সুযোগ দিতে হবে, যাতে সে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে স্ত্রীকে রাখবে কি রাখবে না।

(৩) কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা। যেমন, সাময়িক উত্তেজনা বা অজ্ঞতা বশত স্বামী কখনো কখনো তার স্ত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে তিন তালাক দিয়ে বসে। পরে রাগ প্রশমিত হলে বা ভুল বুঝতে পারলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের ফিরে পেতে আবার মরিয়া হয়ে ওঠে। অপর দিকে স্ত্রীও কোনভাবেই স্বামীর সংসার ত্যাগ করতে চায় না। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম, ভালবাসা, সন্তানের মায়া-মমতা ও নিজ হাতে সাজানো গুছানো সংসার তাদের আরও শোকাহত করে তোলে। মানসিকতার এই নাজুক অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে পুণরায় আপন করে পেতে যা যা করার দরকার তারা তা তা করতে রাজী হয়ে যায়। এই দূর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই স্ত্রীকে পাঠানো হয় হিল্লার মত জঘন্য পাপাচারে। যা স্ত্রী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মেনে নিতে বাধ্য হয়। কাজেই প্রচলিত তালাক পদ্ধতি সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। কাজেই জনসাধারণকে (যদি তালাক দিতেই হয়) কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত পন্থায় তালাক প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। বাকী নিয়মগুলো বর্জন করতে হবে। মানুষকে বুঝাতে হবে, কুরআন সুন্নাহ মেনে তালাক দিলে কষ্মিনকালেও হিল্লার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না।

মুসলিম পারিবারিক আইন ও কুরআন সুন্নাহ ঃ

তালাক পূর্ব সালিস-সমঝোতার বিষয়ে দায়িত্ব পালনের পর্যায় সমূহের মধ্যে শক্তিশালী নিরপেক্ষ সংস্থা বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার পক্ষে (ন্যায়পরায়ণ মুসলিম জাজ বিশিষ্টি) সরকারি আদালত অন্যতম। প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রীয় আইন তথা যে আইনের অনুবলে সরকারী আদালত সুরাহা বিধান করবেন, তাতে যদি কুরআন সুন্নাহর বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে সমাধান কি? উত্তর একটাই। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ প্রণীত আইন তথা ওহী'ভিত্তিক আইনের বিরোধিতা করার অধিকার কোন মুসলিমের নেই। এ বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ'য় কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই । যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'[৪৪৩]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।'[৪৪৪]

---

[৪৪৩] সুরা আহযাব ঃ ৩৬।
[৪৪৪] সুরা নিসা ঃ ৬৫।

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا

'আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই তা তোমরা গ্রহন করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো।'[৪৪৫]

মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাক ঃ

'মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১' (MFLO) এর ৭ নং ধারায় বর্ণিত তালাক ব্যবস্থাটি হলো ঃ

১. কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তালাক ঘোষণার পরপরই যথা শীঘ্র সম্ভব স্থানীয় চেয়ারম্যান (অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল) বরাবরে লিখিত নোটিশ দিতে হবে এবং গৃহীত নোটিশের কপি প্রতিপক্ষ বরাবরও প্রদান করতে হবে।
২. উপধারা (১) অমান্যকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে অনধিক এক বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড বা পাঁচ হাজার টাকা (বর্তমানে দশ হাজার টাকা) পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হবে।
৩. উপধারা (৫) ভিন্ন, তালাক (আল-আহসান, আল-হাসান বা আল-বিদআত যে প্রকারেরই হোক) তা উপধারা (১) এ উল্লেখিত চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান পূর্বক অবহিত করনের দিন থেকে শুরু করে ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে বলবৎ হবে না।
৪. উপধারা (১) এ উল্লেখিত নোটিশ পাবার দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি নিখুঁত সালিশী পরিষদ গঠন করবেন। বিচারকগণ উভয়পক্ষকে সমঝোতায় আনার জন্য এবং তালাক থেকে বিরত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবেন।

---

[৪৪৫] বুখারী- হাঃ ৭২৮৮, মুসলিম- হাঃ ১৩৩৭, তিরমিযী- হাঃ ২৬৭৯, ইবনু মাজাহ- হাঃ ২, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৭৩২০। আরও দেখুন, আল কুরআন- ২:৮৫, ২:২০৮, ৪:১৪, ৪:৬৫, ২৭:৭৮, ২৮:৫০, ৩৩:২, ৪০:২০, ৫৯:৭, ৭২:২৩। বুখারী- হাঃ ৪৪৪, ২০৪৭, ২৪২১, ২৫৮৪, ২৬৯৭, ৬৮৪৯, ৬৮৫১, ৭২৭৭, ৭২৮০, ৭২৮২, ৭২৮৮। মুসলিম- হাঃ ১৩৩৭, ১৭১৮, ২০৪২, ৩৮৫০, ৪৫৯০। আবু দাউদ- হাঃ ৪৬০৬, ৩৯৩১। ইবনু মাজাহ- হাঃ ২, ৪৫, ৪৬। তিরমিযী- হাঃ ২৬৭৯। মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৭৩২০, ৮৭২৮, ১৪৩৩৪, ১৭১৪৫, ২৩৯২৯, ২৪৫২২, ২৫১২৮, ২৫৪৭২, ২৬১৯১, ২৬৩৩৫।

৫. স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে উপধারা (৩) এ উল্লেখিত মেয়াদ তথা ৯০ দিন এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত এ দু'য়ের মাঝে যে মেয়াদটি দীর্ঘতর, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না।

উল্লেখ্য যে, 'মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ **১৯৬১**' এর ৭(১) ও (২) নং ধারা অনুযায়ী স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র ও প্রতিপক্ষকে নোটিশ না পাঠালেও স্বামী দন্ডিত হবে ঠিকই, কিন্তু তালাক বাতিল হবে না। উক্ত ধারাদ্বয়ে তালাক কার্যকর হবে না বলে উল্লেখ নেই। সম্প্রতি একটি মামলায় (মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বনাম মোছাঃ হেলেনা বেগম ও অন্যান্য। সিভিল রিভিশন নং ৬৯৮, **১৯৯২**) এ মর্মেই রায় দেওয়া হয়েছে।

কুরআন সুন্নাহ'র সাথে উক্ত অর্ডিন্যান্সের বিরোধ ঃ

পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান সরকারের নির্দেশে প্রণীত 'মুসলিম পারিবারিক আইন-**১৯৬১**' এর প্রায় নব্বই শতাংশ আইনই কুরআন সুন্নাহ'র সাথে বিরোধপূর্ণ। শুধুমাত্র তালাক সংশ্লিষ্ট আইনেই কুরআন সুন্নাহ'র পাঁচ থেকে ছয়টি বিধানের সাথে উক্ত অর্ডিন্যান্সের সুস্পষ্ট বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হ্যাঁ, উক্ত অর্ডিন্যান্সে বিবৃত তালাক প্রদানের ব্যবস্থাটি যে প্রচলিত বিদআতি পন্থায় তালাক প্রদানের চেয়ে শতগুণ উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ, তা মোটেও অনস্বীকার্য নয়। অন্ততঃ হিল্লা বা তাহলীলের মত ধর্ষণ বা ব্যভিচারবৃত্তির ঝুঁকি এতে নেই। এজন্য কেউ কেউ সম্পূর্ণ ব্যাপারটি না জেনে উদ্ধৃত অর্ডিন্যান্সের পক্ষে অত্যুক্তিতে লিপ্ত হয়েছেন এবং জনসাধারণকে উক্ত অর্ডিন্যান্সের উপর পূর্ণ আস্থাশীল করে তোলার প্রপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন। সাথে সাথে অর্ডিন্যান্সের সাথে কুরআন সুন্নাহ'র কোনরূপ বিরোধ নেই বলেও প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, যা মোটেও কাম্য নয়। একটি ভাল কাজের জন্য একাধিক মন্দ কাজ গ্রহনীয় হতে পারে না। সেই সাথে বিদআতি পন্থায় তালাক প্রদানের প্রচলিত ব্যবস্থাকেও কোনরূপ উৎসাহিত করা যায় না। কাজেই এ সমস্ত ব্যাপারে সর্বদা ওহীভিত্তিক সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকাই হবে মুসলমানদের জন্য মঙ্গলের।

এক্ষণে, তালাক সম্বলিত উক্ত অধ্যাদেশটি ও অধ্যাদেশের প্রতিকুল কিছু আপত্তি যেগুলো কুরআন সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি, যাতে মুসলিম উম্মাহ সতর্ক হতে পারে।

১ম বিরোধ ঃ অর্ডিন্যান্সের (৪) নং উপধারায় তালাকের পর সালিশের মাধ্যমে সমঝোতার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যা সুরা নিসার ৩৫ নং আয়াতের তাৎপর্যের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। উক্ত আয়াতে তালাকের পূর্বেই সালিশ-সমঝোতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।'

বিবেকের দাবিও এই যে, তালাক পর্যন্ত পৌছানোর অবকাশ না দেয়াই পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। তালাকের পর সালিশ-সমঝোতা চিন্তা করা অনেকটা এরকম যে, দুইজন লড়াইকারীর লড়াইয়ের সময় বসে বসে তামাশা দেখতে থাকা আর যখন তাদের একজন অন্যজনের কেচ্ছা খতম করে দেবে তখন সালিশ-সমঝোতার ফিকির করা। এই আইন উদ্ভট ও নিতান্ত উদাসীনতার।

২য় বিরোধ ঃ অর্ডিন্যান্সের (৩) নং উপধারায় ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তালাককে সম্পূর্ন অকার্যকর সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা পবিত্র কুরআনের সুরা তালাকের ১ নং আয়াতের পরিপন্থী। অত্র আয়াতে প্রথমে ইদ্দতের প্রতি খেয়াল রেখে তালাক, তারপর ইদ্দত গনণার কথা বলা হয়েছে। তালাক কার্যকর না হলে ইদ্দত গনণার কারন কী? তবে প্রথম দুই তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে যেমন রাজআত (পূণঃগ্রহন) করার সুযোগ রয়েছে, তেমনি তালাক কার্যকর হওয়ার দরুন প্রদত্ত তালাক বাতিলও হয়ে যায় না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ

'হে নবী, আপনারা যখন আপন স্ত্রীদেরকে (একান্ত অপারগ অবস্থায়) তালাক দিতে চান, তখন তাদেরকে তালাক দিন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করুন।'

৩য় বিরোধ ঃ অর্ডিন্যান্সের (৩) নং উপধারায় চেয়ারম্যান বরাবর তালাকের নোটিশ প্রদানের পর থেকে ইদ্দত গণণার কথা বলা হয়েছে। যা সুরা তালাকের **১** নং ও সুরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ। আয়াতসমূহে তালাক প্রদানের পর থেকেই ইদ্দত গণণার কথা বিবৃত হয়েছে। যেমন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'তালাকদত্তা নারীরা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেদের সংবরণ করে রাখবে।'

৪র্থ বিরোধ ঃ অর্ডিন্যান্সের (৩) নং উপধারায় অগর্ভবতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইদ্দতের মেয়াদ সর্বাবস্থায় ৯০ দিন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যা সুরা বাক্বারাহর ২২৮ ও ২৩৪ নং আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজেদের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই মহান আল্লাহর অবগতি রয়েছে।'

তাছাড়া, অর্ডিন্যান্সের নব্বই দিন আর কুরআনে বর্ণিত তিন ঋতুর সময়কাল এক নয়। কারন তিন ঋতু নব্বই দিনের আগে পরে যেকোন সময় সমাপ্ত হতে পারে।

৫ম বিরোধ ঃ অর্ডিন্যান্সের (৫) নং উপধারায় গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, নব্বই দিন এবং গর্ভমুক্তির মধ্যে যে মেয়াদটি দীর্ঘতর হবে তাই ইদ্দত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যা সুরা তালাকের ৪ নং আয়াতের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। উক্ত আয়াতে গর্ভমুক্তি পর্যন্ত ইদ্দতকাল নির্ধারিত হয়েছে। চাই সেটা হোক একদিন কিংবা একঘন্টা।

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

'আর গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।'

মোটকথা, মনুষ্য রচিত আইন তা যত সমৃদ্ধই মনে হোক, কুরআন সুন্নাহ'র সাথে আংশিক বিরোধ হলেও তা সর্বাবস্থায় প্রত্যাখ্যাত। (ইদ্দত সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত দেখুন।)

ইসলাম কি স্ত্রী প্রহারের অনুমোদন দেয়?

এ অধ্যায়টি গ্রন্থণার মুল আলোচনার বাইরে। ইচ্ছে করলে পরিহার করা যেতো। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের 'কুরআন সুন্নাহ অনুমোদিত তালাক পদ্ধতি' পরিচ্ছেদে সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের যে অনুবাদটি দেখিয়েছি তা নিয়ে দ্বিধা বিভ্রম থেকেই যেতো। আমাদের দাবি হলো, কুরআন কোনভাবেই স্ত্রী প্রহারকে উৎসাহিত করে না। পক্ষান্তরে কুরআনের প্রায় সব অনুবাদে উক্ত আয়াতের وَاضْرِبُوهُنَّ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, 'স্ত্রীদের হালকা শাসন করো', 'অল্প করিয়া প্রহার করো', 'মৃদু প্রহার করো', 'শিক্ষামূলক প্রহার করো'

ইত্যাদি। এই অনুবাদগুলো কতটুকু সঠিক ও সমাজবান্ধব তা এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।

বিশ্ববিখ্যাত শরীয়া স্কলার মুফতি মেন্‌ক (ইসমাঈল ইবনে মুসা মেন্‌ক- হারারে, জিম্বাবুয়ে) তাঁর এক লেকচারে এটিকে সরাসরি ভুল অনুবাদ বলে মন্তব্য করেছেন। ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস এর উপদেষ্ঠা মণ্ডলীর সদস্য ও শরিয়া ল- মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেস এর সম্মানিত ডিরেক্টর হাসান মাহমুদ তাঁর 'হাউ শরিয়া-ইজম হাইজ্যাকড ইসলাম' বইতে উল্লেখ করেন, ২০০৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বিবিসি'র একটি খবরে গোটা দুনিয়া শিউরে উঠেছিল যখন ইরানের শরিয়া কোর্টে মরিয়ম নামের এক স্ত্রী আবেদন করেছিল কোর্ট যাতে তার স্বামীকে আদেশ দেন, স্বামী যেন তাকে প্রতিদিন না মেরে সপ্তাহে একদিন করে মারে। স্বামী তখন কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলেছিল এটা তার ইসলামী অধিকার, কুরআনী অধিকার। পুরো এজলাস থমকে গিয়েছিল। এমন খবর যখন বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয় তখন ইসলামের শত্রুরা আর বসে থাকে না। এর জন্য দায়ী কে? আমরাই। আসলে সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতটি নিয়ে গোটা বিশ্বে যত আলোচনা সমালোচনা হয়েছে, অন্য কোন আয়াত নিয়ে হয়ত ততটা হয়নি। মরক্কোর বিখ্যাত ফেমিনিষ্ট লেখিকা ফাতিমা মার্নিসিও তাঁর বই 'রেবেলিয়নস অব উইমেন' এ বৌ পেটানোর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন।

চলুন, মুল আলোচনায় অগ্রসর হই। সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে ضرب শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ণয় করার আগে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে বাস্তবে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ তা এক নজর দেখে নেয়া দরকার।

পবিত্র কুরআনের বাণী,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আরেক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে।'[৪৪৬]

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُولَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

[৪৪৬] সুরা রুম ঃ ২১।

‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।’[৪৪৭]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

‘যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলন ঘটাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।’[৪৪৮]

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বাণী,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ

‘হাকীম ইবনু মু'আবিয়া আল কুশাইরী রহঃ হতে তার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা আমি বলি হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কারোর উপর কি স্ত্রীদের কোন অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, ‘তুমি যখন আহার করবে তাকেও (সমমানের) আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও (প্রয়োজন মত) পোশাক দিবে। তার মুখমন্ডলে মারবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে।’ ঘর থেকে বের করে দিবে না।’[৪৪৯]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ

‘সাঈদ ইবনে হাকেম তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা মু'আবিয়া আল কুরায়শী রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনি আমাদের স্ত্রীর হক সম্পর্কে কী নির্দেশ দেন? তিনি

[৪৪৭] সুরা তাওবা ঃ ৭১।
[৪৪৮] সুরা নিসা ঃ ৩৫।
[৪৪৯] আবু দাউদ- হাঃ ২১৪২, ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৮৫০, মিশকাত- হাঃ ৩২২৯।

বলেন, ‘তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে। আর তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা (সেই মানের) পরিধান করাবে এবং তোমরা তাদেরকে (স্ত্রী) মারধর করবে না ও গালমন্দ দিবে না’।’[৪৫০]

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا

‘হযরত আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারাই যারা নিজেদের স্ত্রীর নিকট উত্তম।’[৪৫১] হযরত আয়েশা রাঃ ও ইবনে আব্বাস রাঃ হতেও এ বিষয়ে হাদিস বর্ণিত আছে।

এছাড়াও আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহঃ স্বীয় ‘মিরকাত’ এ ‘শরহুস সুন্নাহ বাগভী’র বরাত দিয়ে হযরত আলী রাঃ এর নির্দেশ বর্ণনা করেছেন,

فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها

‘যদি স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে তাহলে তাকে সম্মান করবে আর যদি অপছন্দ করে তাহলেও তাকে কোনরূপ অত্যাচার করবে না।’[৪৫২]

উপরোল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদিস সমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মুল ভিত্তিই হচ্ছে মুলত سكون, مودة, رحمة তথা শান্তিতে বসবাস, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও কৃপা চর্চা।[৪৫৩] স্বামী স্ত্রী একে অপরের সম্পুরক এবং তারা পরস্পরকে ভাল কাজের আদেশ করবে আর মন্দ কাজে নিষেধ করবে। সেই সাথে ইসলামের মৌলিক হুকুম আহকাম পালনে নিবেদিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ এর নির্দেশ মতে জীবন যাপন করবে।[৪৫৪] খাওয়া পরা সবকিছুতেই স্বামীর উপর স্ত্রীর ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে।[৪৫৫] তারপরেও দাম্পত্যজীবনে কলহ বিবাদ অস্বাভাবিক কিছু নয়, হতেই পারে। এক্ষেত্রে একেবারে নিরুপায় হলে উভয়ে আলোচনা করে নিতে পারে। পরিস্থিতি জটিল হলে বিচার কুড়াতে পারে।[৪৫৬] কিন্তু মারামারি ধরাধরি করে

[৪৫০] আবু দাউদ- হাঃ ২১৪৩, নায়লুল আওতার- ৭/৭৯পৃঃ।
[৪৫১] তিরমিযী- হাঃ ১১৬২, বায়হাক্বী- হাঃ ৬১, ইবনে হিব্বান- হাঃ ৪১৭৬, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ৭৪০২, ১০১০৬, শুয়াবুল ঈমান- হাঃ ৭৬১২।
[৪৫২] মিরকাত- ১০/৩৮ (কিতাবুন নিকাহ অধ্যায়)।
[৪৫৩] সুরা রুম ঃ ২১ এর মুল তাৎপর্য।
[৪৫৪] সুরা তাওবা ঃ ৭১ এর মুল তাৎপর্য।
[৪৫৫] আবু দাউদ- হাঃ ২১৪২।
[৪৫৬] সুরা নিসা ঃ ৩৫ অনুসারে।

কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।[৪৫৭] মোটকথা, এখানে মুল প্রচেষ্টাই হচ্ছে ভালবাসাপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, অন্যথায় সম্মানজনক ভাবে পৃথক হয়ে যাওয়া।[৪৫৮] তাহলে মারামারির দরকার কী? স্ত্রীকে মারধর করে স্ত্রীর নিকট উত্তম হওয়ার উপায় কি? স্ত্রীর নিকট উত্তম হওয়া না গেলে তিরমিযী'র উদ্ধৃত হাদিস অনুযায়ী ঈমানে পরিপূর্ণ হওয়া যাবে না। আর ইসলাম কখনো ঈমানে অপরিপূর্ণ থাকাকে উৎসাহিত করতে পারে না। সুরা তাওবার ৭১ নং আয়াতে স্পষ্ট বলা আছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। কাজেই আমাদের দেখতে হবে, রাসুল সাঃ এর পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা কেমন ছিল আর তিনি কখনো তাঁর স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলেছিলেন কিনা, এবং এটাই হবে পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

আমাদের বিশ্বাস, নবীজী সাঃ এর কোন কাজ কুরআনের পরিপন্থী হতে পারে না। বিশুদ্ধ হাদিস মতে জানা যায়, নবীজী সাঃ স্বীয় স্ত্রী হাফসা রাঃ কে তালাক দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে ফিরিয়েও নিয়েছিলেন।[৪৫৯] এখন, আলোচ্য আয়াতে ضرب শব্দের অর্থ মারামারি হলে নবীজী সাঃ স্বীয় স্ত্রী হাফসা রাঃ কে তালাক প্রদানের পূর্বে অল্প করিয়া, হালকা, মৃদু, শিক্ষামুলক যাই হোক ছোটখাট মারধর অবশ্যই করতেন। অথচ এ ব্যাপারে মা আয়েশা রাঃ এর দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য দেখুন,

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا (الا ان يجاهد في سبيل الله)

'হযরত আয়িশা রাঃ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেন নি এবং (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও হদ ব্যতীত) নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেন নি।'[৪৬০]

এছাড়াও, সুরা তাহরীমের ঘটনায় দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সাঃ প্রচন্ড রেগে গিয়ে স্ত্রীদের থেকে দূরে সরে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু কোনও মারপিট করেন নি। ইফকের ঘটনায় আয়েশা রাঃ থেকে দূরে ছিলেন। খাদিজা রাঃ সম্মন্ধে আয়েশা রাঃ এর মন্তব্যে প্রচন্ড রাগে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তবুও মারপিট করেন নি। কোন ক্ষেত্রেই এমনকি তাঁর পুরো জীবনে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে কখনো প্রহার তো দুরের কথা, সামান্য কটু কথাও বলেন নি। ফাতেমা বিনতে ক্বায়স রাঃ কে

[৪৫৭] আবু দাউদ- হাঃ ২১৪৩ এর তাৎপর্য।
[৪৫৮] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩১ এর সারার্থ।
[৪৫৯] ইবনে মাজাহ- হাঃ ২০১৬।
[৪৬০] ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৯৮৪, মুসলিম- হাঃ ৬১৯৫, আবু দাউদ- হাঃ ৪৭৮৮, দারেমী- হাঃ ২২১৮, বায়হাক্বী- হাঃ ৮০৬৮, মুসনাদে আহমদ- হাঃ ২৫৭১৫, শুয়াবুল ঈমান- হাঃ ৭৭১২।

আবু জাহম নামের জনৈক ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দিলে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাকে বিয়ে না করার পরামর্শ দেন। কারন, আবু জাহম স্ত্রীদের প্রহার করতো। শরিয়াবিদ ড. সুলাইমান বলেন, নবীজী সাঃ বৌ পেটানোর বিরুদ্ধে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, কেউ বৌ পেটালে যেন সে তাঁর সামনেই না আসে, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাঃ তার মুখই দেখতে চাইতেন না। ফাতিমা মার্নিসি (১৯৪০-২০১৫) তাঁর বই 'রেবেলিয়নস অব উইমেন' এ লিখেন, শতাব্দী ধরে বৌ পেটানোয় অভ্যস্থ সেই সমাজ এ ঘোষনায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু বৌ পেটানো কেন, হদ ও অন্যায় দমনের জন্য জিহাদ ব্যতীত কোন ধরনের মারিমারিই রাসুলুল্লাহ সাঃ পছন্দ করতেন না। সহিহ মুসলিমে এসেছে, আবু মাসউদ বাদরী রাঃ নামক এক সাহাবী একদিন তার ক্রীতদাসকে চাবুকাঘাত করছিলেন। দুর থেকে রাসুলুল্লাহ সাঃ এটি দেখে দ্রুত ছুটে আসেন আর বলতে থাকেন খবরদার আবু মাসউদ! জেনে রেখো! দাসের উপর তুমি যতটা ক্ষমতাবান, আমার আল্লাহ তোমার উপর তারচেয়েও ক্ষমতাবান। এ কথা শুনে আবু মাসউদ স্তব্দ হয়ে গেলেন। সুতরাং বলা যায়, মারপিট, জোর-জবরদস্তি, আক্রমণাত্মক আচরণ, প্রতিহিংসা এবং রাগের মাধ্যমে সংসার টিকিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা কুরআনের দোহাই দিয়ে সমাজে চালু আছে তা উল্লেখিত আয়াতসমূহের ফলাফলের সাথে ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জীবন চরিতের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

কমনসেন্সও বলে, প্রহারের মাধ্যমে কখনোই কোন সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে টিকে থাকতে পারে না। বরঞ্চ, স্বামী এবং স্ত্রী সাময়িকভাবে আলাদা জায়গায় থাকলে অনেক সময় তাদের মতের দূরত্ব দূর হয়, পরস্পরের অন্তরে বিরহের সঞ্চার হয়, ফলে আবার একসাথে বসবাস করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তাই সুরা নিসার ৩৪, ৩৫, ১২৮, ও ২২৮ নং আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, ضرب শব্দটি এখানে মারামারির অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে, 'স্ত্রীদের কাছ থেকে পৃথক হওয়া অথবা আপাতঃ দূরত্ব বজায় রাখা' (Separating from the wives in the sense of living apart from them) অর্থে। সেজন্য বর্তমান যুগের বহু উদারপন্থী ইসলামিক স্কলারগণ সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে ব্যবহৃত ضرب শব্দের অর্থ করেছেন, 'পৃথক হওয়া Separate (from) them'[৪৬১] অথবা, 'আপাতঃ দূরত্ব বজায় রাখা Go away from them.'[৪৬২]

এই অর্থ দাঁড় করানোর পেছনে তাঁদের যুক্তি হলো, (১) যে এগারটি আয়াতে ضرب শব্দের সম্ভাব্য অর্থ আঘাত করা/প্রহার করা হতে পারে সেগুলোর মধ্যে এটিই একমাত্র আয়াত যেখানে 'কিভাবে' এবং 'কোথায়' আঘাত করতে হবে তা বলা নেই। একমাত্র সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতটি ব্যতিক্রম হতে পারে না। (২) এই এগারটি আয়াত বাদে

[৪৬১] Quran: A Reformist Translation.
[৪৬২] The Sublime Quran, by Laleh Bakhtiar.

বাকি অনূন্য ত্রিশটি আয়াতে ضرب শব্দের অর্থ আঘাত করা/প্রহার করা হওয়া সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এমনকি সেসব আয়াতেও যেখানে ضرب শব্দটি অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যাংশ গঠন করে না। (৩) কুরআনে ضرب শব্দের সর্বাধিক ব্যবহার হয়েছে 'দৃষ্টান্ত' অর্থে। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কোন কিছু উপলব্ধি করানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। এ সমস্ত আয়াতসমূহে দেখা যায়, ضرب শব্দটি অন্য একটি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যাংশ গঠন করেছে। তাছাড়া মাত্র দুটি আয়াতে ضرب শব্দটি ব্যতিক্রম এসেছে যেখানে শব্দটি অন্য কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যাংশ গঠন করে নি। এগুলোর প্রত্যেকটিতে ضرب শব্দের অর্থ 'আলাদা করা', 'দূরত্ব বুঝানো', 'পৃথক হওয়া'-ই যথার্থ হয়, কোনভাবেই আঘাত করা/প্রহার করা সঠিক হয় না। এসব কারনেই তাঁরা তাঁদের অনুবাদে স্ত্রী প্রহারের কথা অস্বীকার করেছেন।

মালয়েশিয়া'র আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেক্টর এবং আমেরিকার (ভার্জিনিয়া) ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব্ ইসলামিক থট-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান পবিত্র কুরআনে ضرب শব্দ থেকে উদ্ভূত শব্দাবলীর ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। ড. এডিপ ইউকসেল সহ আরও অনেকের অভিমত হল, ضرب শব্দের অর্থ ক্ষেত্রনির্বিচারে মারামারি হওয়া অযৌক্তিক। কাযী আবু বকর ইবনে আল আরাবী স্বীয় গ্রন্থে বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবি রিবাহ (২৭-১১৫ হিঃ) এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها

'আতা বলেন, স্বামী কখনোই যেন তার স্ত্রীকে আঘাত না করে, যদি সে স্ত্রীকে কোন আদেশ-নিষেধ করা হয় আর তা স্ত্রী অমান্য করে, তাহলেও স্বামীর উচিৎ হবে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা।'[৪৬৩]

আতা'র মন্তব্যকে সমর্থন করে ইবনে আল আরাবী বলেন, هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد 'এটি আতা'র একটি আইনগত উপলব্ধি, তার নিজস্ব শারিয়াহ জ্ঞান এবং তার যুক্তিগত সিদ্ধান্ত।' ইবনে আশুর আরও সমর্থন করে বলেন, 'আমি আতা'র উপলব্ধিকে ইবনে আল আরাবীর থেকেও আরও বেশি ব্যাপক মনে করি, যেহেতু তিনি দলিল মতে যেটা যেভাবে করা দরকার, সেটা সেভাবেই করতেন।'

[৪৬৩] আহকামুল কুরআন- ২/৩৪১, ফতোয়ায়ে শাবকাতুল ইসলামিয়্যাহ- ফ. নং ঃ ২২৫৫৯।

স্ত্রী প্রহার মানবজাতির চিরন্তন ইতিহাস। আমরা সবাই কম বেশি স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া-ঝাটি করি। এটি আমাদের অভ্যাসগত সমস্যা। তাই বলে একে ধর্মের নামে বৈধ করা মারাত্মক অন্যায়। একটি কু-অভ্যাস হাজার বছর পরেও পরিহার করা গেল না, আর তা কোনকালে এসে কুরআনের কোন শব্দের সাথে কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল, তার অর্থ এই নয় যে এটা কুরআনী বিধান। অথচ সামান্য চিন্তার প্রয়োগ ঘটালে দেখা যায়, কুরআনের কোথাও কোন শব্দে স্ত্রী প্রহারের অনুমোদন দেয়া হয়নি। যুগ যুগ ধরে কুরআনের দোহাই দিয়ে বৌ পেটানোর যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজে লালিত হয়ে আসছে, তা মুলত এই সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে ব্যবহৃত ضرب (chastise) শব্দটির অর্থগত বিভ্রাট মাত্র।

ভাষাবিদ্যায় শব্দার্থের দ্ব্যর্থতা নিরসন (word sense disambiguation) একটি খোলা সমস্যা। শব্দার্থের দ্ব্যর্থতা নিরসন হল যখন কোন শব্দের একের অধিক অর্থ (meanings) থাকে, সেখান থেকে সঠিক অর্থটি খুঁজে বের করা। অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সামান্য হেরফেরও হয়ে যেতে পারে অনেক বড় বিপত্তির কারণ। যেমন, ইন্ডিয়া থেকে ছেলে তার বাবার ফেসবুক ইনবক্সে লিখে পাঠাল- 'বাবা, তোমার ঔষধটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।' বাবা লিখলেন- 'কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?' ছেলে- 'মনে হয় পাবনা।' বাবা- 'জ্বি বাবা, তুমি নিশ্চিত?' ছেলে- 'জ্বি বাবা, আমি নিশ্চিত পাবনা। এখানে অনেক খুঁজেছি। কোথাও নেই।' অসুস্থ বাবার মনটা খুশিতে নেচে উঠল। ইন্ডিয়া পাওয়া যাচ্ছে না এমন শাস্ত্রীয় ঔষধ নিজ দেশে পাওয়া যাচ্ছে! ভাবলেন দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। পরদিন অসুস্থ শরীর নিয়ে বাবা রওয়ানা হলেন সোজা পাবনা। পাবনার প্রত্যেকটা দোকান শেষ, কোথাও নেই। তারা এ ঔষধের নামই শুনেনি। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ছেলেকে রিং দিলেন। বাবা- 'পাবনার প্রত্যেকটা দোকান তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, ঔষধটা কোথাও পেলাম না।' ছেলে- 'তুমি পাবনা গিয়েছ কেন?' বাবা- 'তুমিই তো গতকাল ইনবক্সে লিখলে 'পাবনা' ঔষধটা পাওয়া যাবে।' ছেলে- 'আমি তো লিখেছিলাম পাবনা, মানে will not get.' তারপর বাবা অবাক! একই রকম, দুস্থ কবির মিঞার নামে কে বা কারা থানায় 'মা ইলিশ' ধরার অভিযোগ করেছে। মামলার কথা জানার পর থেকে কবির মিঞা লা-পাত্তা। একদিন এক পুলিশ অফিসার মামলাটি তদন্ত করতে কবির মিঞার এলাকায় আসেন। এসেই এলাকার এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবির মিঞা কে? চেন তুমি?' লোকটি বলল, 'হ স্যার, সে তো জেলে।' পুলিশ মনে মনে ভাবল, অযথাই আসলাম। 'এই শোন, তোমরা কথা যদি সত্যি হয় তো বেঁচে গেছ, নয়তো তোমাকে নিয়ে যাব জেলে।' তারপর থানায় যেয়ে দেখল, কয়েদীর খাতায় কবির মিঞার কোন নামই নেই। তাহলে কি বেটা মিথ্যা বলল! আর দেরি নাই, লোকটাকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হল। 'এবার বল, মিথ্যা বললি কেন? পুলিশের সাথে ফাজলামু হচ্ছে?' 'না স্যার, এই আপনার পবিত্র আইনের

খাতা ছুঁয়ে বলছি আমি মিথ্যা বলিনি। কবির মিঞা একজন গরীব জেলে। সে মাছ ধরে খায়।' পুলিশও আধা বেহুঁশ! 'নাসা'র একদল বিজ্ঞানী আকাশে যাত্রা করার পর কেউ দেখল এইমাত্র আকাশ থেকে তারা সাগরের দিকে পড়ল। আকাশ থেকে কি 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা পড়ল নাকি আকাশের তারকা পড়ল ব্যক্তির পুরো বক্তব্যের আগ-পর নিশ্চিত না হয়ে বিজ্ঞানীরা আকাশ থেকে পড়ে গেল বলে গুজব ছড়ালে ব্যাপারটি কেমন হবে? এই হল শব্দের অর্থগত বিভ্রাট। যা খুব সতর্কতার সাথে মিলিয়ে নিতে হয়।

পৃথিবীতে আজ অবধি যত ভাষা সচল রয়েছে সব ভাষাতেই যোগশব্দের[৪৬৪] পাশাপাশি বহু শব্দ এমন আছে যেগুলোর নির্দিষ্ট বুৎপত্তিগত অর্থ থাকলেও এদের অর্থ ব্যবহারভেদে পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ শব্দগুলো সচরাচর নির্দিষ্ট কোন একক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বক্তার উদ্দেশ্য আর প্রয়োগক্ষেত্রের উপর নির্ভর করেই এরা অর্থ প্রকাশ করে থাকে। সাধারণ বাগর্থবিদ্যায় (Semantics) সেসব শব্দকে সমপ্রকৃতি শব্দ (Homographs) বলা হয়।[৪৬৫] শব্দগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট হল এরা বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms) নয়, কিন্তু সমার্থক বা প্রতিশব্দের (Synonyms) বিপরীত।[৪৬৬] বক্তার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল, শ্রুতিমধুর, অলংকারমণ্ডিত ও প্রকাশশৈলীর অভিনবত্বের জন্য শব্দের এরূপ বৈচিত্রময় ব্যবহার ভাষাবিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় 'সাত সমুদ্র তের নদী' দূরত্ব বুঝাতে, 'চোখ কান খুলা রাখা' সতর্ক থাকা বুঝাতে, অনুরূপ 'হাঁটি হাঁটি পা পা করে' অনেক সাধনায় অর্জিত বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে

[৪৬৪] যে সকল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন।

[৪৬৫] সমপ্রকৃতি শব্দ (Homographs) হল সেসব শব্দ যার ক্রিয়ামুল অভিন্ন কিন্তু অর্থ বিভিন্ন। যেমন, একই ক্রিয়ামুল বিশিষ্ট 'বল' শব্দটি দ্বারা পৃথকভাবে শক্তি, গোলক খেলনা বিশেষ বা কিছু বলার জন্য আদেশ করা ইত্যাদি অর্থ বুঝানো যায়। অনুরূপ 'কলা' শব্দের বিভিন্ন অর্থ জীবদেহের কোষসমষ্টি, চাঁদের ষোল ভাগের এক ভাগ, লেশ, কদলী ফল, শিল্প, কৌশল, কদল তরকারী ইত্যাদি। ইংরেজীতেও Cell শব্দটির ক্রিয়ামুল একই কিন্তু ব্যবহারভেদে এটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, জীবকোষ, জেলখানা বা কয়েদী রাখার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, ব্যাটারী বা এসিডে নিমজ্জিত ধাতব পাত, প্রশাসনিক কাজে নিয়ুক্ত বিশেষ দল, মৌচাকের ক্ষুদ্র ঘর, ক্যাবিন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। অনুরূপ Bow শব্দের অর্থ নত হইয়া অভিবাদন (নম, নমস্কার, প্রণাম, প্রণিপাত), ধনুক, জাহাজের অগ্রভাগ, শ্রদ্ধা, ইন্দ্রধনু, বেহালার ছড়, এক প্রকার গিঁট, নেকটাই বিশেষ ইত্যাদি। হাসান মাহমুদ তাঁর বইতে শুধুমাত্র 'খাওয়া' শব্দটির এরূপ দেড় শতাধিক ব্যবহার উল্লেখ করেছেন।

[৪৬৬] সমার্থক বা প্রতিশব্দ হল সেসব শব্দ যার ক্রিয়ামুল বিভিন্ন কিন্তু অর্থ অভিন্ন। যেমন, অবসর, ছুটি, ফুরসত, সময়, সুযোগ, অবকাশ। এখানে সবক'টি শব্দের ক্রিয়ামুল তথা শব্দের গাঠনিক মৌলিক উপাদান বিভিন্ন কিন্তু অর্থ অভিন্ন। অনুরূপ অগ্নি, অনল, বহ্নি, দহন, পাবক সবকিছুর অর্থ আগুন। পৃথিবী, ধরা, ধরণী, বিশ্ব, জগৎ, ভুবন, দুনিয়া, ভূপৃষ্ঠ ইত্যাদিও অভিন্ন অর্থের বিভিন্ন ক্রিয়ামুল বিশিষ্ট শব্দ। এগুলো ক্ষেত্রের উপযোগিতা বিচারে প্রয়োগ হয়। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দোগে পরিচালিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে, স্কটিশ ভাষায় 'বরফ' শব্দটির ৪২১টি প্রতিশব্দ রয়েছে। ইংরেজীতেও নাকি শুধুমাত্র 'drunk' শব্দটির ৩৫৩টি পর্যন্ত সমার্থক বা প্রতিশব্দ পাওয়া যায়।

প্রতিটি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করে গুণে গুণে সাতটি সমুদ্র ও তেরটি নদী বা চোখ ও কান টেনে ধরে মেলে ধরা অথবা শিশুর হাঁটাহাঁটির অনুশীলন জ্ঞান করলে ভুল হবে। আবার কিছু শব্দ আছে যা ব্যবহারভেদ যাই হোক অর্থ প্রকাশের সময় তার নিজস্ব বুৎপত্তিগত অর্থটিও একেবারে হারিয়ে ফেলে। যেমন, 'সন্দেশ' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ 'সংবাদ' হলেও এর ব্যবহারিক অর্থ 'মিষ্টান্ন বিশেষ'। অনুরূপ 'হস্তী' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'যার হাত আছে' কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ 'হাতি'। বাংলা ব্যাকরণে এরা রূঢ় বা রূঢ়িশব্দ হিসেবে পরিচিত। অনেক সময় বক্তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রভেদে নির্দিষ্ট বুৎপত্তিগত অর্থবোধক শব্দও একেবারে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, বারণ করা সত্ত্বেও সন্তান দুষ্টুমী করতে করতে হঠাৎ চোট পেলে মা রেগেমেগে বলে উঠেন, 'খুব ভাল হয়েছে'। এখানে 'ভাল' শব্দটির অর্থ মোটেও ভাল নয়। শব্দটি মুলত 'খারাপ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরকম আরবীতেও বহু শব্দ আছে যা বক্তার উদ্দেশ্য ও ব্যবহারভেদের উপর নির্ভর করে একেক ক্ষেত্রে একেক অর্থ প্রকাশ করে। আরবী ব্যাকরণে এরা 'লফজে মুশতারাক' বা 'আলফাজে মুশতারিকা' নামে পরিচিত। যেমন, عين শব্দের অর্থ চক্ষু, দৃষ্টি, কুয়া, ঝরণা, ছিদ্র, গুপ্তচর, প্রহরী, পর্যবেক্ষক, সুর্য, মুল অংশ, কানুন, নীতি ইত্যাদি। এরূপ صلاة শব্দটির অর্থও ব্যবহারভেদে কখনো নামায, কখনো দোয়া, কখনো অনুগ্রহ, কখনো গুণকীর্তন আবার কখনো ক্ষমা প্রার্থনা করা বুঝায়। পবিত্র কুরআনে এরূপ বহু শব্দের উপস্থিতি রয়েছে যেগুলো ক্ষেত্রভেদে তাদের প্রকৃতিগত ও প্রাত্যয়িক অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত কয়েকটি 'আলফাজে মুশতারিকা'র নমুনা হল ঃ

(১) اخذ (অভিধানে যার অর্থ লওয়া, ধরণ, পাকড়াও করা, প্রাপ্তি, লাভ করা, দখল করা, শাস্তি দেওয়া, হরণ করা, অনুসরণ করা ইত্যাদি) শব্দের পবিত্র কুরআনে ব্যবহারঃ ধরা/পাকড়াও করা (৬৯:৩০, ৬৯:৪৫, ৫৪:৪২, ২৬:১৫৬, ১১:১০২, ৫১:৪০, ৪৪:৪৭, ৩৪:৫১)। উদ্ভাবন করা/তৈরি করা/সৃষ্টি করা (২৬:১২৯, ১৮:৬১, ১৬:৬৭, ১৬:৬৮, ৭:৭৪, ২:১২৫, ১৮:২১, ৯:১০৭, ৭:১৭২)। গ্রহন করা/আঁকড়ে ধরা/আদায় করা (২১:১৭, ৪:২১, ১৯:৮৮, ৩৬:৭৪, ১৯:৮১, ৪:১১৮, ১৯:৯২, ২৫:২৮, ৭৩:৯, ২৬:২৯)। ভেবে নেয়া/অনুমাণ করা/গণ্য করা (৩৮:৬৩, ২৩:১১০, ১৮:১০৬, ৫:৫৮, ৫:৫৭, ২১:৩৬, ২:৬৭, ৪৫:৩৫, ১৮:৫৬, ৯:৯৮,৯৯)। শাস্তি দেওয়া (৭৯:২৫, ২:২২৫, ১৩:৩২, ৪০:২২, ৭:১৩০, ৩:১১, ৭:৯৬, ৮:৫২, ১৮:৫৮, ৭:১৬৫)। সত্বাধিকারী হওয়া (৪৮:১৯, ৪৮:২০)। আঘাত করা (৩৬:৪৯)। প্রতিশ্রুত হওয়া/চুক্তিবদ্ধ হওয়া/লাভ করা (১৯:৭৮, ১৯:৮৭, ২:৮০)। অবলম্বন করা (২৫:২৭, ২৫:৫৭, ১৮:৬৩, ৪:১৫০, ৫৯:৭)। সংস্থাপন করা/ব্যবহার করা (৬৩:২, ১৬:৯৪, ১৬:৯২)। দারস্থ হওয়া/শরণাপন্ন হওয়া (৩৯:৪৩)। উদ্বুদ্ধ করা/তরাণ্বিত করা/নিয়ে যাওয়া

(২:২০৬)। বিধ্বস্ত করা/ঝালাপালা করা (২৯:১৪, ১৫:৮৩,৭৩, ৭:৯১, ৭:১৫৫)। সেরে নেয়া/সামলে নেয়া/গুটিয়ে নেয়া (৯:৫০)। তুলে নেওয়া/সঙ্গে নেওয়া (৪:৭১, ৪:১০২, ৩৮:৪৪, ২০:৩৯, ৭:১৫৪)। অভ্যাস/স্বভাব (৭:১৯৯)। মনোণীত করা/নির্বাচিত করা (৩:১৪০, ৪৩:৩২, ১২:৭৮)। অনুমতি দেওয়া (৪৮:১৫)। বন্দী করা (৯:৫, ৪:৯১)। কেড়ে নেওয়া/ছিনিয়ে নেওয়া (৬:৪৬)। আচ্ছন্ন করা/স্পর্শ করা (২:২৫৫)।

(২) صرف (অভিধানে- ব্যয় করা, রূপান্তর করা, পরিস্কার করা, খালি করা, প্রতিরোধ করা, বিরত করা, ফেরানো, বরখাস্ত করা, পরিবর্তন করা, স্বাধীনতা দেওয়া, নানাভাবে বুঝানো ইত্যাদি) শব্দের পবিত্র কুরআনে ব্যবহারঃ হেরে যাওয়া (৪০:৬৯)। বিতরণ করা (২৫:৫০)। বারবার বিবৃত করা/নানানভাবে বর্ণনা করা/বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা (৪৬:২৭, ১৭:৪১, ৬:১০৫, ২০:১১৩, ১৭:৮৯, ১৮:৫৪, ৭:৫৮, ৬:৪৬, ৬:৬৫)। ফিরে যাওয়া/সরে যাওয়া/কেটে পড়া (১০:৩২, ৯:১২৭)। প্রত্যাহার করা/সরিয়ে নেওয়া/অপসারিত করা (৬:১৬, ৩:১৫২)। পরিত্রাণ পাওয়া (১৮:৫৩)। প্রতিহত করা/হটিয়ে দেওয়া (১২:৩৪, ২৫:৬৫, ১২:২৪, ২৫:১৯, ১২:৩৩, ১১:৮)। ফেরানো (৭:৪৭)। পরিবর্তন করা (৪৫:৫, ২৪:৪৩, ২:১৬৪)। আকৃষ্ট করা/বিমোহিত করা (৪৬:২৯)। দিকভ্রষ্ট হওয়া (৩৯:৬)। বিমুখ করে দেয়া (৭:১৪৬, ৯:১২৭)।

(৩) اثر (অভিধানে- নিদর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, উত্তেজিত করা, উত্থাপন করা, ধুলি ছড়ানো, জমি চাষ করা, চিহ্ন, সাক্ষ্য, প্রমাণ, কীর্তি, প্রভাব, প্রেরণা ইত্যাদি) শব্দের পবিত্র কুরআনে ব্যবহারঃ প্রাধান্য দেওয়া/অগ্রাধিকার দেওয়া/বেছে নেওয়া (৮৭:১৬, ৭৯:৩৮, ১২:৯১, ২০:৭২, ৫৯:৯)। পদাঙ্ক বা পদচিহ্ন (৩৭:৭০, ১৮:৬৪, ৪৩:২২, ৪৩:২৩, ২০:৯৬)। লোক পরম্পরায় চলে আসা/উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া (৭৪:২৪, ৪৬:৪)। পশ্চাদাবলম্বন করা/অনুসরণ করা/অনুগমন করা (১৮:৬, ২০:৮৪, ৫:৪৬, ৫৭:২৭)। কীর্তিকলাপ (৩৬:১২, ৪০:৮২, ৪০:২১)। চমক/কৃতিত্ব (৩০:৫০)। ছাপ বা চিহ্ন (৪৮:২৯)।

একইভাবে ضرب (অভিধানে- প্রহার করা, আঘাত করা, বর্ণনা করা, ভ্রমণ করা, গুণকরন, মধু, হালকা বৃষ্টি, প্রকার, শ্রেণী, সদৃশ, অনুরূপ, বাজানো, কামড় দেওয়া, পরিত্যাগ করা, উপেক্ষা করা, পৃথক করা, উদাসীন হওয়া ইত্যাদি) শব্দটিও পবিত্র কুরআনে মোট ৫৩ টি আয়াতে ৫৭ বার উদ্ধৃত হয়েছে বিভিন্ন অর্থে। যেমনঃ চাপা দেয়া/ঢেকে দেয়া (১৮:১১, ২৪:৩১)। প্রহার করা/আঘাত করা/হানা দেওয়া (৩৭:৯৩, ৩৮:৪৪, ৪৭:২৭, ৮:১২, ৮:৫০, ২৪:৩১, ২:৬০, ৪৭:৪, ৭:১৬০)। নিক্ষেপ করা (২৬:৬৩)। সরিয়ে নেয়া/প্রত্যাহার করা/উপেক্ষা করা (৪৩:৫)। দৃষ্টান্ত প্রদান করা/উপস্থাপন করা/বিবৃত করা (২৫:৩৯, ২৯:৪৩, ৩৬:১৩, ২৫:৯, ১৭:৪৮, ৩৯:২৭, ১৪:২৫, ৪৩:৫৭, ১৪:৪৫, ১৮:৩২, ৫৯:২১, ৪৩:১৭, ৪৭:৩, ১৪:২৪, ১৮:৪৫, ১৩:১৭, ৬৬:১১, ১৬:১১২, ৩৯:২৯, ১৬:৭৬, ১৬:৭৫, ৩০:২৮, ২:২৬, ৬৬:১০, ২২:৭৩, ২৪:৩৫)। স্থির করা/সংস্থাপন করা (৪৩:৫৮,

১৬:৭৪, ৩৬:৭৮, ৫৭:১৩)। পৃথক করা (৮:১২, ৪:৩৪)। তুলনা বা অনুমাণ করা (২:৭৩)। উদ্ভাবন করা (২০:৭৭)। প্রস্তাবনা (৩০:৫৮)। পাকড়াও করা (৩:১১২, ২:৬১)। ভ্রমণ করা/যাত্রা করা/চলাফেরা করা (৪:১০১, ৪:৯৪, ২:২৭৩, ৩:১৫৬, ৫:১০৬, ৭৩:২০) ইত্যাদি।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, কুরআনের এ সমস্ত অর্থগুলো কিন্তু সাধারণ কোন অভিধান বা ব্যাকরণিক কোন ব্যবহারনীতির আদলে হয়নি। বস্তুতঃ কুরআনের ভাষা নৈপুন্যতা এতবেশি উঁচুমানের যে, অভিধান বা ব্যাকরণগুলোই বরং কুরআন অনুসারে ব্যবহারনীতি নির্ধারণ করে থাকে। যেমন, পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় 'উম্মী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর অভিধানে 'উম্মী' শব্দের সবচেয়ে মশহুর অর্থটি হলো 'নিরক্ষর (Ignorant)'। এখন প্রত্যেক জায়গায় যদি অভিধান অনুসারে 'উম্মী' শব্দের অর্থ আবশ্যিকভাবে 'নিরক্ষর' করা হয় তাহলে ভুল হবে। কেননা, কোন কোন আয়াতে গোটা আরব অধিবাসীদেরকেও 'উম্মী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ আরবের সব লোক নিরক্ষর ছিল না। আবার কোন কোন আয়াতে 'উম্মী' শব্দ দ্বারা সেসব অ-কিতাবীদেরকেও (Gentiles) বুঝানো হয়েছে, যারা কোন আসমানী কিতাবের আদলে চলত না। তাদের মধ্যেও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কবি সাহিত্যিক ছিল। আবার কোন কোন আয়াতে এই শব্দটি একটি ইহুদী পরিভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইহুদীরা অ-ইহুদীদের অসভ্য, অভদ্র, হীন ও নীচ ভাবার্থে 'উম্মী' বলে বিদ্রুপ করত। সেজন্য পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ আয়াতসমূহের অনুবাদ করার সময় আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করেছেন, অভিধান নয়। আরেকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে। আমরা জানি অভিধানে 'মাযহাব' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো মতবাদ (Doctrine), সিদ্ধান্ত (Theory), পদ্ধতি (Method) ইত্যাদি। যেমন চার মাযহাব বলতে চারটি মতবাদ বা পদ্ধতিকে বুঝানো হয়। এবার সহিহ আবু দাউদের 'পবিত্রতা' অধ্যায়ের প্রথম হাদীসটির আরবী ইবারত উল্লেখ করা যাক,

عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد

'হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী করীম সাঃ যখন পায়খানায় যেতেন তখন দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যেতেন।'

এখন যদি এই হাদীসে উল্লেখিত 'মাযহাব' শব্দের স্থলে আভিধানিক অর্থটা প্রয়োগ করি, তাহলে হাদীসের কি হাল হবে সহজেই অনুমেয়। অনুরূপ, ضرب শব্দটিও পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শুধুমাত্র ভাব ও প্রেক্ষাপট বিচারে। প্রচলিত অভিধান বিচারে নয়। কাজেই সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতেও ضرب শব্দের সেই অর্থটাই হওয়া যৌক্তিক যা কুরআনে বর্ণিত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সম্বলিত সবগুলো আয়াতের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জীবনাচরণের সাথে ওঁতপোত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সর্বকালে, সর্ব পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।

এছাড়াও, সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে উদ্ধৃত وَاضْرِبُوهُنَّ বাক্যাংশের অনুবাদ 'স্ত্রীদের প্রহার কর' হওয়া বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে সঙ্গত নয়। যেমন ঃ

১. কুরআন বলছে ইসলামে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার মুল ভিত্তিই হল سكون, مودة, رحمة তথা শান্তিতে বসবাস, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও কৃপা চর্চা।[৪৬৭] স্ত্রী প্রহার নিঃসন্দেহে এসবের অন্তরায় স্বভাব।
২. বিশুদ্ধ হাদিস মতে, স্ত্রী প্রহার রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তিনি স্ত্রীদের মারধর ও কটু ব্যবহার না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬৮] তিনি কখনও তাঁর স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলেন নি।[৪৬৯] সুতরাং স্ত্রী প্রহার ইসলাম অনুমোদিত আচরণ নয়।
৩. বিবেকের দাবি, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাঃ এর প্রতি বাধ্যতার উপর কোন জোর-জবরদস্তি নেই,[৪৭০] সেখানে স্বামীর বাধ্যতার জন্য মারপিট হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কারন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত হওয়া স্বামীর অনুগত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
৪. তালাকের মত কঠিন একটি পর্যায় অতিক্রম করেও যখন স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখনও মহান আল্লাহ তাকে কোন রকম কষ্ট না দিয়ে সম্মানের সাথে ঘরেই রেখে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং পারস্পরিক সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করছেন।[৪৭১] সেখানে মহান আল্লাহ কিভাবে তাকে প্রহার করতে বলতে পারেন?
৫. স্বামীও মানুষ, তারও ভুল হতে পারে। সেও হতে পারে গাধার চেয়েও হাবা, সাপের চেয়েও বিষাক্ত এবং স্ত্রী হতে পারে সতী-সাধ্বী, নির্দোষ। তাই কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই স্বামীর হাতে একচ্ছত্র মারামারির অধিকার দিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে অন্যায় ও চরম আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত।
৬. সন্তানদের সামনে বাবা কর্তৃক মাকে পেটানোর দৃশ্য অত্যন্ত বিভৎস ও ভয়াবহের হয়। তাতে সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে সন্তানরা মেধাবী হয়ে ওঠে না। কাজেই এটি শুধু নারী নির্যাতনই নয়, গুরুতর শিশু নির্যাতনও। ইসলামে এমন হিংস্র আইনের বৈধতা থাকতে পারে না।

[৪৬৭] সুরা রুম ঃ ২১।
[৪৬৮] আবু দাউদ- হাঃ ২১৪৩।
[৪৬৯] ইবনে মাজাহ- হাঃ ১৯৮৪।
[৪৭০] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৫৬।
[৪৭১] সুরা বাক্বারাহ ঃ ২৩১, সুরা তালাক ঃ ২।

৭. আলোচ্য আয়াতটির পরবর্তী আয়াতে (৪:৩৫) বলা হচ্ছে, পরিস্থিতি বেসামাল হলে সমঝোতার পরবর্তী ধাপ সালিশের দারস্থ হওয়া। গায়ে হাত তুলে মারধর করে সালিশ আয়োজন করা তামাশা ছাড়া আর কি? এসব সালিশে বারবার মারপিটের কথা উঠে আসে আর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বেড়েই চলে। কি পরিমাণ, কি দ্বারা, কোথায় কোথায়, কিভাবে, কতবার, কতক্ষণ ধরে মেরেছে তা নির্ধারণ করতে করতে সালিশের মুল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। ফলে আপোষ-রফা তো দূরের কথা, পাছে ভাঙনটাই নিশ্চিত হয়। যা সুরা নিসার ১২৮ নং আয়াতের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।
৮. ব্র্যাকেটে প্রহারের পূর্বে অল্প করিয়া, হালকা, মৃদু, শিক্ষামুলক জাতীয় যত কথাই যোগ করা হোক, প্রহার মুলত প্রহারই। এসব নিরর্থক কথাবার্তা যোগ করার অর্থ স্বামীকে উস্কে দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ অল্প করিয়া হলেও মারধর কর। যেন পরিস্থিতি জটিল থেকে আরও জটিলতর হয়। ইসলাম কাউকে পাশবিক হতে বলে না।
৯. প্রথমে সদুপদেশ, তারপর সংসর্গ ত্যাগ, তারপর বিছানা পৃথক করার পরও যে শুদ্ধ হয় না, তাকে হালকা প্রহারে শুদ্ধ করার প্রশ্নই আসে না। আর এ অবস্থায় প্রহার করতে গেলে কেউ হালকা বা মৃদু প্রহারও করে না। আর কি পরিমাণে প্রহার করলে হালকা, মৃদু বা শিক্ষামূলক প্রহার বলা হবে তাও নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সালিশ হবে কি করে? এছাড়াও প্রত্যেকটি দাম্পত্যকলহ তালাক পর্যন্ত গড়ানোর মুলে থাকে মারামারি। অথচ, বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে পৃথিবীর যেকোন সমস্যা সমাধান হয়েছে আলোচনার টেবিলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতেও এই কথাটাই বলা হচ্ছে।
১০. প্রহার যত হালকা বা শিক্ষামুলকই হোক তা মুলত অপমান, পীড়ন বা কায়িক যন্ত্রণার প্রতীক। তাই কোন সাধারণ মানুষকে কিছুতেই অন্যের গায়ে হাত তোলার অধিকার দেয়া যেতে পারে না। দিলে তার অপব্যবহারটাই বেশি হবে এবং সেটাই হয়। তাছাড়া প্রহারের ফলে প্রহৃত ব্যক্তি কখনও অমায়িক হয়ে উঠে না, বরং আরও প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠে। প্রতিহিংসার সাথে আপোষ-মীমাংসার আসমান জমিন ব্যবধান। যা সুরা নিসার ৩৫নং আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ, কুরআন পূণঃমিলন আশা করে।

কাজেই, স্ত্রী প্রহার যে একটি অমানবিক অ-পৌরষিক অন্যায়, তাতে আর আপত্তি থাকার কথা নয়। সু-পুরুষ কখনো বৌ পিটিয়ে নিজের পৌরষত্ব প্রকাশ করবে না। ধর্মের কথা বাদ দিন, কোন বিবেকে আপনি আপনার স্ত্রীর শরীরে আঘাত করবেন? স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার পূর্বে অথবা পরে নিজেকে আয়নার সামনে কিংবা বিবেকের জবাবদিহীতায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করুন তো, যে কাজ আপনি করলেন ওটা কি মানুষে করে। আশপাশের হিংস্র জন্তু জানোয়ার গুলোর দিকে তাকান। দেখুন, তারা

এত হিংস্র হওয়া সত্ত্বেও একান্ত সাথীকে আঘাত করে না। অথচ আপনার কাজটি আপনাকে জন্তু জানোয়ারের চেয়েও অধম বানিয়ে দিল। একজন মানুষ হিসেবে যতটুকু অধিকার আপনি রাখেন তার চেয়ে কোন অংশে কম অধিকার স্ত্রীদের নেই। যদি তারা মানুষের মত অধিকার না পায় তবে জেনে রাখুন, তাদের অধিকার অপদখলে রাখার জন্য মনুষ্যত্বের কাছে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কাজেই আমাদের উচিৎ হবে, টুকিটাকি বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করার মানসিকতা পরিহার করা এবং হওয়ার অবস্থা এড়িয়ে চলা। সব মানুষ বুদ্ধিতে সমান হয় না। তাই সবাই সবকিছু সঠিক সময়ে নাও বুঝে ওঠতে পারে। ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিন। বারবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, দোষ কার? প্রতিবারই যদি উত্তর আসে দোষ স্ত্রীর, তবে তার সাথে কথা বলুন। একান্তে ডেকে নমনীয়ভাবে বুঝানোর চেষ্টা করুন। তাকে মানুষ ভাবুন এবং বুঝাতে থাকুন। নিশ্চয় সে সর্বদা অবুঝ থাকবে না এবং এক সময় আপনিও সফলতা পাবেন। আপনার এই ত্যাগে যদি কোন সম্পর্ক টিকে যায় এবং সংসারে শান্তি বিরাজ করে তবে সে স্বার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্বও একান্তভাবেই আপনার। আপনার এই গুণের প্রশংসা কেউ করুক বা না করুক, আপনি আপনার কাছে তৃপ্ত থাকবেন। মনে রাখবেন, আপনি শুধু পুরুষ নন, আপনি দায়িত্বশীলও।

আপত্তি ও জবাব ঃ

আপত্তি ১ ঃ ضرب শব্দটির একটি অর্থ যেহেতু 'আঘাত করা/প্রহার করা' হওয়া সম্ভব, তাহলে আলোচ্য আয়াতে স্ত্রীদেরকে আঘাত বা প্রহার করা অর্থে হওয়া ভুল কিসে?

জবাব ঃ দেখুন, যতগুলো আয়াতে মহান আল্লাহ ضرب শব্দ দিয়ে আঘাত করা বুঝিয়েছেন, তার প্রত্যেকটি আয়াতে তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছেন কি দিয়ে বা কোথায় আঘাত করতে হবে। যেমন, সুরা বাক্বারাহ ঃ ৬০, সুরা আ'রাফ ঃ ১৬০ ও সুরা শুআরা ঃ ৬৩ আয়াতসমূহে اضْرِب بِّعَصَاكَ 'আঘাত করো লাঠি দিয়ে', সুরা বাক্বারাহ ঃ ৭৩ আয়াতে اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا 'আঘাত করো তার একটি অংশ দ্বারা', সুরা আনফাল ঃ ১২ আয়াতে فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ 'আঘাত করো ঘাড়ের উপরে', সুরা ত্ব-হা ঃ ৭৭ আয়াতে فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ 'সমুদ্রে আঘাত করে তাদের জন্য রাস্তা আবিস্কার করো', সুরা নুর ঃ ৩১ আয়াতে وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ 'তারা যেন তাদের পা দিয়ে আঘাত না করে', সুরা ছফ্‌ফাত ঃ ৯৩ আয়াতে ضَرْبًا بِالْيَمِينِ 'ডানহাতে আঘাত করে', সুরা মুহাম্মদ ঃ ৪ আয়াতে فَضَرْبَ الرِّقَابِ 'ঘাড়ে আঘাত করা' সুরা ছদ ঃ ৪৪ আয়াতে ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ 'তৃণশলা দিয়ে প্রহার করো' ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পরিস্কার

বলে দিচ্ছেন 'কি দ্বারা' বা 'কোথায়' আঘাত করতে হবে। যেহেতু সুরা নিসা ঃ ৩৪ আয়াতে মহান আল্লাহ 'কি দ্বারা' বা 'কোথায়' তা উল্লেখ করেন নি, সুতরাং এই আয়াতের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, ضرب শব্দটি কোনভাবেই আঘাত করা বা প্রহার করার অর্থে আসেনি। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন কোন বিভ্রান্তি রেখে দিবেন না যাতে মানুষ নিজের ইচ্ছা মতো অর্থ করে সকাল সন্ধ্যা বৌ পেটাতে পারে। এরপরেও যদি গায়ের জোরে বলা হয়, এই আয়াতে মারামারির কথাই বলা হয়েছে, তাহলে বলবো এটিও একটি আয়াতে মুতাশাব্বাহা,[৪৭২] যা মহান আল্লাহ দ্ব্যর্থপূর্ণ অবস্থায় রেখে দিয়েছেন।

আপত্তি ২ ঃ যখন ضرب শব্দের সাথে অন্য কোন শব্দ যুক্ত হয়ে একটি বাক্যাংশ রূপে ব্যবহার হয়, তখনি শুধুমাত্র ضرب শব্দের অর্থ প্রহার না হয়ে অন্য অর্থ হবে। যেমন ضرب শব্দের সাথে مَثَلًا যুক্ত হলে 'উদাহরণ দেওয়া, প্রবাদ বলা', عن যুক্ত হলে 'পরিত্যাগ করা, উপেক্ষা করা, এড়িয়ে চলা', فِي যুক্ত হলে 'ভ্রমণ করা, ফুঁক দেওয়া' ইত্যাদি বুঝাবে। আর যদি অন্য শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে ضرب শব্দটি এককভাবে ক্রিয়াবাচক অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে ضرب শব্দের অর্থ হবে 'প্রহার করা' এবং প্রহারের ক্ষেত্র হবে উক্ত বাক্যের ক্রিয়াপদের উদ্দেশ্য তথা 'মাফউল বিহি'।

জবাব ঃ পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি লক্ষ্য করুন,

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ

'এভাবেই আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন।'[৪৭৩]

এখানে ضرب শব্দটি এককভাবে ক্রিয়াবাচক অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং অন্য শব্দের সাথেও যুক্ত হয়নি। এমতাবস্থায়, প্রশ্নানুসারে যদি এখানে ضرب শব্দের অর্থ 'মারপিট' হয় আর তা উপরোক্ত আয়াতে প্রতিস্থাপন করি, তাহলে আয়াতের কি হাল হবে দেখুন, 'এভাবেই আল্লাহ সত্য ও অসত্যের মারপিট করেন।' যা অসম্ভব, উদ্ভট, অর্থহীন, অযৌক্তিক ও হাস্যকর কথা। সুতরাং, এই নিয়ম গ্রহনযোগ্য নয়। কাজেই সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে ضرب শব্দের এমন একটি অর্থ নির্বাচিত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত হবে যা এ বিষয়ে (পারিবারিক ব্যবস্থাপনা) বর্ণিত পূর্বাপর আয়াতের মুল উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ-সামঞ্জস্যতা বজায় রাখে। আর কুরআনে এ বিষয়ে উদ্ধৃত সবগুলো আয়াতের মুল উদ্দেশ্যই যখন স্বামী স্ত্রীর পারষ্পরিক মনোমালিন্য দূর করে ভালবাসাপূর্ণ পারিবারিক

---

[৪৭২] উল্লেখ্য, আয়াতে মুতাশাব্বাহা অনুসরণযোগ্য নয়।
[৪৭৩] সুরা রা'দ ঃ ১৭।

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, তখন আলোচ্য আয়াতে ضرب শব্দের অর্থ কি হওয়া উচিৎ? 'মারামারি' যা সম্পর্ককে আরো জটিল ও তিক্ত করে তুলে, নাকি 'আপাতঃ দূরত্ব' যা ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিবেচনা করার সুযোগ দেয়?

আপত্তি ৩ ঃ স্ত্রীর দেখভাল, নিরাপত্তা, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি যাবতীয় দায়-দায়িত্ব যেহেতু স্বামীর হাতে, সেহেতু স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামীর হাতে হালকা শাসনের অধিকার থাকা তেমন অন্যায়ের কিছু নয়।

জবাব ঃ কিন্তু আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে অনেক মহিয়সী রমণীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা ধর্ম, কর্ম, গুণে তাদের স্বামীদের থেকে অনেক উপরে ছিলেন। সেসব স্বামীরা যদি তাদের অপেক্ষাকৃত কম বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান এবং যোগ্যতায় মনে করতেন যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের অমান্য করছে এবং তাদেরকে প্রহার করতেন তাহলে সেটা কি কখনও শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে যেত? একজন সিজোফ্রেনিক, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিস-অর্ডার বা বাইপোলার ডিস-অর্ডারে ভোগা স্বামী, যে কিনা সবসময় সব ব্যাপারে নিজেকেই সঠিক মনে করে, তার ক্ষেত্রেও এই অধিকার প্রযোজ্য হতে পারে কি? বর্তমান যুগেও অনেক সংসার আছে যেখানে এসব দায়-দায়িত্ব নারীরা বহন করে থাকে। স্ত্রী উপার্জন করে, আর স্বামী বসে বসে খায়। এখন একই অধিকার স্ত্রীর হাতেও ন্যস্ত করবেন কি? আমরা বিশ্বাস করি, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান পেশ করে। কুরআনের বাণী বিশেষ কোন গোত্র, সমাজ, পরিবার, মানুষের জন্য নয়, বরং যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন সমাজ, যেকোন সংস্কৃতি এবং যেকোন যুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তাই সুরা নিসার আলোচ্য আয়াতের প্রচলিত অনুবাদটি যদি যে কোন সময়ে, যে কোন দেশে, যে কোন সংস্কৃতিতে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে আমরা ভুল উপলব্ধি করেছি, মহান আল্লাহ ভুল করেন নি।

আপত্তি ৪ ঃ সুরা 'ছদ' এর ৪৪ নং আয়াতে স্ত্রী প্রহারের স্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ হযরত আইয়ুব আঃ কে নির্দেশ দিয়েছেন যে,'তোমার হাতে একমুষ্টি তৃণ নাও আর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত করো।'

জবাব ঃ আপত্তিকারীরা আর একটুও চিন্তা করে না যে, এই ঘটনার পট কি, এটি কার জন্য। ব্যধিগ্রস্থ হযরত আইয়ুব আঃ একবার কোন এক কারনে তাঁর স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ করে ফেলেছিলেন। যখন আরোগ্য লাভ করলেন, তখন কৃত শপথ পুরা করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন, তা মোটেও আল্লাহর মনঃপুত ছিল না। তাই মহান আল্লাহ বিষয়টি এভাবে সমাধান করেছেন যে, আইয়ুব আঃ একমুষ্টি ঘাসের তোড়া নিয়ে (যেখানে একশত তৃণ থাকবে) একবার প্রহার করবেন, যাতে স্ত্রীর প্রতি বিশেষ কোন কায়িক পীড়নও হবে

না, আবার আল্লাহর নামে নেয়া শপথও ভঙ্গ হবে না।[৪৭৪] কি বুঝলেন? আইয়ুব আঃ যে স্বীয় স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা কি ঠিক ছিল? তাহলে আল্লাহ বেত্রের পরিবর্তে তৃণশলাকা নিতে বললেন কেন?

আপত্তি ৫ ঃ হাদীসে আছে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, স্ত্রী প্রহারের ব্যাপারে স্বামীদের কোন কৈফিয়ত নেই।

জবাব ঃ আছে কি নাই তারচেয়েও বড় কথা হলো এসব বাণী কোন মানবতার দূত রাসুলের হতে পারে কিনা, ভাবুন। যুগেযুগে অনেক নরাধম কাপুরুষের দ্বারা নবী রাসূলের নামে, খুলাফাদের নামে এ জাতীয় বহু বানোয়াট কথা গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। আবার এগুলো কৃত্রিম প্রমাণিতও হয়েছে।

আপত্তি ৬ ঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ মিসওয়াকের ন্যায় বস্তু দ্বারা স্ত্রীর মুখে এবং শরীরের কোথাও দাগ না লাগে মত প্রহারের শিক্ষা দিয়েছেন।

জবাব ঃ হ্যাঁ মানলাম, রাসুলুল্লাহ সাঃ মিসওয়াকের ন্যায় বস্তু দ্বারা প্রহার করতে বলেছেন, তাহলে তো ঠিকই ছিল। কারন মিসওয়াক তো আর দেড়/দুই হাত লম্বা চিরা লাকড়ী হয় না। বড়জোর পকেটে রাখার মত টুথব্রাশের সমান হয়। টুথব্রাশ দিয়ে খোঁচা দেয়া যায়, স্ত্রীর সাথে হাসি মশকরা করা যায়, মারা যায় না। হালকা খোঁচা দিন, ক্ষুব্ধ স্ত্রীর হাসি পেতে পারে। ঝামেলারও অবসান হবে। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র অভিপ্রায়ও হয়ত এটাই ছিলো। আর অনেক আঘাত আছে যা শরীরের কোথাও দাগ ফেলবে না, কিন্তু দাগ লাগার চেয়েও নির্মম, নৃশংস। আমাদের কক্সবাজারের টেকনাফে একলোক তার স্ত্রীকে হাত পা বেঁধে গোপনাঙ্গে তিন প্যাকেট লংকা গুঁড়া ঢেলে দিয়েছিল। স্ত্রীর চিৎকার চেঁচামেচিতে আড়া-পাড়া সব এক হয়ে গিয়েছিল তখন। থানা পুলিশে ভর ধরেনি। লোকটি কিন্তু স্ত্রীর মুখে বা শরীরের কোথাও একদম দাগ লাগায় নি, আছেন কেউ এ কাজ শরীয়ত সম্মত বলে ফতোয়া দিবেন?

সবাই ভাল থাকুন। আশপাশের সবাইকে ভাল রাখুন। পারিবারিক যে কোন হতাশা মোকাবেলায় পবিত্র কুরআনের এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখুন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[৪৭৫]

---

[৪৭৪] তাফসীরে ইবনে কাসীর (বাংলা) ২৮১-২৮২ পৃঃ।

[৪৭৫] সুরা নিসা ঃ ১৯।